# ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

পশ্চিমবঙ্গ ভূদানযজ্ঞ সমিতি
ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা

পুস্তকখানি (প্রথম সংস্করণ) সম্পর্কে পূজ্য বিনোবাজীর পত্র

তাঁ १९, १०, ५३

श्रीचारुबाबू,

"भूदान-यज्ञ कि ओ केन" यह आपकी किताब मिली। कुछ तो मैं देख गया। सब देखनेके लिये समय नहीं मिलेगा। लेकिन आपने हमारे आंदोलन के बुनियादी विचारों का बहुत ही अच्छे ढंगसे विवरण किया है इतना मैं समझ सका हूँ। मैं मानता हूँ आपकी यह किताब बंगालमें लोक-प्रिय होगी। मूल्य भी ज्यादह नहीं रक्खा है।

শ্রীচারুবাবু,

আপনার বই "ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন" আমি পাইয়াছি। কিছু কিছু তো আমি পড়িয়াছি। বইখানি সমস্ত পড়িবার মত সময় আমি পাইব না। তবে যতটা পড়িয়াছি তাহাতে আমি এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনি আমাদের আন্দোলনের বুনিয়াদী সমস্যাসমূহকে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনার এই পুস্তক বাংলা দেশে জনপ্রিয় হইবে। ইহার মূল্যও বেশী করা হয় নাই।

বিনোবা

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণে এই পুস্তক তিন হাজার কপি মুদ্রিত করা হয়। নয় মাসের মধ্যে গত জুলাই মাসের প্রথমভাগে উহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাই প্রথমে পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণের কথা হয়। কিন্তু ইহা মনে হয় যে, ভূদানযজ্ঞের ন্যায় নিত্য-বর্ধনশীল বিষয় সম্পর্কে লিখিত পুস্তক প্রায় এক বৎসর পরে কেবলমাত্র পুনর্মুদ্রণ করা হইলে উহা বাসি জিনিস বলিয়া পরিগণিত হইবে। সেজন্য পুস্তকখানির সংস্করণ ও পরিবর্ধন করা হইল।

ভূদানযজ্ঞ যুগধর্ম। উহাতে বিপ্লবের বীজ নিহিত। তাই উহা ক্ষুদ্র বীজের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া আজ বিরাট বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে। দিন দিন উহার নূতন নূতন শাখা-প্রশাখা নির্গত হইতেছে এবং উহারা আশাতীত দ্রুতভাবে পরিবর্ধিত হইতেছে। বিনোবাজীও চির-বর্ধনশীল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অপরিমেয়। তাঁহার বর্ধনশীলতা লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিনোবাজী বর্ধিত হইতেছেন—একথা বলা হয় তো সঠিক নয়। বিনোবাজীর বিকাশ হয তো পূর্ব হইতে অপরিমেয় হইয়াই ছিল। এখন দিন দিন তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এমন দিন যায় না যে-দিন তিনি একটি নূতন কথা না বলেন। দিন দিন তিনি এই বিষয়ের উপর নূতন নূতন আলোক-সম্পাত করিতেছেন। কতই-না গভীরতায় ভরা ঐসব অনুপম বাণী! তাহাতে আন্দোলন দিন দিন নূতন শাখা-প্রশাখা লইয়া বিস্তৃত হইতেছে। তিনি যুগ-পুরুষ! অপরিগ্রহ ও অস্তেয়—আত্মার এই দুই মহান গুণের অবতার-পুরুষ তিনি! তাঁহার মাধ্যমে এই যুগে সমাজে এই দুই মহান গুণের বিকাশ সাধিত হইবে। এই সমস্তকে সবিস্তারে ও সঠিকভাবে উপস্থাপিত করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নহে। তথাপি যতদূর সম্ভব নূতন বিষয়গুলি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়াছি মাত্র।

২১টি নূতন বিষয়ের আলোচনা নূতন সংস্করণে করা হইয়াছে। যথা—(১) কমিউনিষ্টগণের আপত্তির খণ্ডন, (২) সাম্যযোগ, (৩) সাম্যবাদ ও সাম্যযোগ, (৪) আজ সখ্য-ভক্তির যুগ, (৫) শ্রমদান যজ্ঞ, (৬) জীবনদান (৭) পরম ধর্ম, (৮) ভূমি বিতরণ, (৯) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদন (১০) পুঁজিবাদ অবসানের উপায়, (১১) সর্বোদয় সাধনের ভিত্তি, (১২) সর্বোদয় সূত্র, (১৩) শাসনমুক্ত সমাজ, (১৪) শরীর শ্রমের গুরুত্ব, (১৫) গ্রামরাজ ও রামরাজ, (১৬) যুগপৎ উভয় পদ্ধতি অনুসরণ, (১৭) বুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, (১৮) জ্ঞান ও বিজ্ঞান, (১৯) দান, যজ্ঞ ও তপঃ, (২০) সূতাঞ্জলি, (২১) সমন্বয়। প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। পূর্বের প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু পুস্তকের একটি নূতন বিষয়ে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পরিশিষ্টের পরিসংখ্যান ভাগে অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। ইশাক-রিপোর্টের মহকুমাওয়ারী ভূমি-সংক্রান্ত বিবরণের পরিবর্তে জেলাওয়ারী ফসল-সংক্রান্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু জীবিকা হিসাবে শ্রেণী বিভাগ ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের শ্রেণী বিভাগের জেলাওয়ারী বিবরণ এবং বনের জেলাওয়ারী হিসাব (পরিচয়সূচক ভূমিকাসহ) দেওয়া হইয়াছে। সম্পত্তিদান সম্পর্কীয় পরিশিষ্টে পূর্বের বিষয়টি বাদ দিয়া সম্পত্তিদান সম্পর্কে আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পূর্বের বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশ, পুস্তকের মধ্যে 'সম্পত্তিদানযজ্ঞ' বিষয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কয়েকটি পুরাতন বিষয়ের মধ্যেও নূতন লেখা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এরূপে পুস্তকের কলেবর মোট ২১২ পৃষ্ঠার স্থলে উহা বৃদ্ধি হইয়া মোট ২৬০ পৃষ্ঠা হইয়াছে। তথাপি কাগজ প্রস্তুতকারক ফার্ম Orient Paper Mill's Ltd., লোক-সেবক প্রেস ও ইউনিভার্সেল বুক বাইন্ডার্স-এর সহৃদয় সহায়তায় পুস্তকের মূল্য অবর্ধিত রাখিতে পারা সম্ভব হইয়াছে।

প্রথম মুদ্রণে পুস্তকের কোন কোন স্থানে বানান ও ভাষায় যে-সব দোষ-ত্রুটি ছিল তাহা শ্রীযুক্ত পরমেশ বসু অতি মনোযোগের সহিত পুস্তকখানি বার বার পড়িয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমার সোদর-প্রতিম সহকর্মী শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মেইকাপ

ভূদানযজ্ঞ দপ্তরে তাহার উপর ন্যস্ত গুরু দায়িত্ব পালন করিয়াও অতিরিক্ত সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমার খারাপ লেখা পাণ্ডুলিপিগুলি উদ্ধার করিয়া ও সমস্ত প্রুফ নিজে দেখিয়া পুস্তকখানি প্রকাশে যে সহায়তা দান করিয়াছে তাহাতে আমি অভিভূত হইয়াছি।

এই সংস্করণে পুস্তকখানি ভূদানযজ্ঞের বিপ্লবাত্মক বিচার-ধারা প্রচারে অধিকতর সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করি। তাই পুস্তকখানি পরম শ্রদ্ধাসহকারে বাংলা ভাষাভাষী কোটি কোটি ভাই-ভগ্নীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইল।

বিনোবা জন্ম-তিথি
১১ই সেপ্টেম্বর, '৫৪

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এখনও বাংলা ভাষায় ভূদানযজ্ঞ-সাহিত্য বেশীকিছু প্রকাশিত হয় নাই। অতএব এই পুস্তক প্রকাশ করা বোধহয় অনাবশ্যক বিবেচিত হইবে না। বাংলার জনসাধারণ যাঁহারা ভূদানযজ্ঞের তত্ত্ব ও বিচার-ধারা এবং ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের তথ্যাদি জানিবার ও বুঝিবার জন্য আগ্রহশীল তাঁহাদের হস্তে এই পুস্তকখানি এক ক্ষুদ্র কর্মীর বিনীত নিবেদনস্বরূপ অর্পিত হইল।

এই পুস্তকখানি বাংলার কর্মীদের ও সম্ভাবিত কর্মীদের উপকারে আসিবে বলিয়া মনে করি। তাই পূজ্য বিনোবাজী কর্মীদের উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন তাহার কিছু কিছু এই পুস্তকের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

সম্পত্তিদান যজ্ঞ সম্পর্কেও এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে। উপরন্তু সম্পত্তিদান যজ্ঞ সম্পর্কে পূজ্য বিনোবাজীর প্রবচন ও লেখার কিছু কিছু পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তাহাতে সম্পত্তিদান যজ্ঞের মহত্ত্ব ও তত্ত্ব গভীরভাবে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

এই পুস্তকখানি লেখার মধ্য দিয়া আমি নিজে ভূদানযজ্ঞের তত্ত্ব ও বিচার-ধারা অধিকতর গভীরভাবে বুঝিবার ও অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পূজ্য বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে এযাবৎ এক হাজারেরও অধিক প্রবচন দিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি কিছু কিছু লিখিয়াছেনও। প্রত্যেক প্রবচন ও লেখায় তিনি তাঁহার হৃদয়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে কিছু না কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন ও উহাতে নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। অতএব এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে তাঁহার সবকিছু সন্নিবেশিত করা সম্ভব নহে এবং তাহা করাও এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। তবে ভূদানযজ্ঞের তত্ত্ব ও উহার অন্তর্নিহিত বিচার-ধারা তথা সর্বোদয় বিচার-ধারা বিভিন্ন দিক হইতে বুঝিবার পক্ষে যাহা প্রধানত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি তৎসমুদয় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সহজবোধ্য করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছি। প্রত্যেক বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া যতদূর সম্ভব বিনোবাজীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি।

পূজ্য বিনোবাজীর ভাষণের অংশাদি 'হরিজন', 'সর্বোদয়', 'ভূদানযজ্ঞ-বার্তা', 'ভূদানযজ্ঞ-বিহার' প্রভৃতি পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। পশ্চিম বাংলার ভূমি-সংক্রান্ত তথ্যাদি ভূমিরাজস্ব কমিশন-রিপোর্ট, ইশাক-রিপোর্ট, প্রফেসর মহালনবিশ প্রভৃতির "Survey of the after effect of the Bengal Famine of 1943" ও শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের 'Concentration in the Land structure'—শীর্ষক প্রবন্ধ (যাহা ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের "মডার্ন রেভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ভূমির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কীয় জেলাওয়ারী বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি অধিকরণ হইতে পাইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

গান্ধী-জয়ন্তী
১৯৫৩

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

# প্রস্তাবনা

"মানব সমাজ বহু হাজার বৎসর পুরাতন। কিন্তু পৃথিবী এত বড় যে, পুরাকালে পৃথিবীর একদিকের মানুষের সহিত অন্যদিকের মানুষের কোন পরিচয় বা সম্পর্ক ছিল না। বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ মানসিক, ধার্মিক. আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল দিকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইল বটে কিন্তু বন্ধুত্বের বা মিলনের সম্পর্ক প্রথমে হইল না। বহু ক্ষেত্রে সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া প্রথম এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই কখন প্রথম সম্পর্ক মধুর আবার কখন তাহা তিক্ত হইয়াছিল। তবে মোটের উপর পারস্পরিক সম্পর্কের ফল ভালই হইয়াছে।

"পুরাকালে উত্তর ভারতে আর্য জাতি বাস করিতেন এবং দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতি বাস করিতেন। যদিও একই দেশ, তথাপি এই বিশাল দেশের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরাট দণ্ডকারণ্য ব্যবধান থাকায় হাজার হাজার বৎসর যাবৎ ইঁহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না। আর্যগণের পাহাড়ী সংস্কৃতি এবং দ্রাবিড়দের সামুদ্রিক সংস্কৃতি ছিল। উত্তরের মনুষ্য জ্ঞান-প্রধান ছিলেন এবং দক্ষিণের মনুষ্য ভক্তি-প্রধান ছিলেন। ক্রমশঃ দেশের এই উভয় অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইল। উভয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সাধিত হইল। উত্তর ভারতে বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাব হইল এবং তাঁহাদের বাণী—আত্মজ্ঞানের বিচারধারা দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত পৌঁছিল। তৎপূর্বেও বৈদিকগণ তাঁহাদের নিজস্ব ধারায় দক্ষিণ ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে শংকরাচার্য, রামানুজ, মাধবাচার্য, প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। উত্তর ভারত হইতে যে আত্মজ্ঞানের বিচারধারা দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিল, দক্ষিণ ভারত তাহাতে নিজের বৈশিষ্ট্য দান করিল অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা তাহাকে সমৃদ্ধ করিল। শংকরাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি

তাহা উত্তর ভারতে লইয়া গেলেন। দক্ষিণ ভারতে আরও বহু জ্ঞানবান, ভক্তিমান সন্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও সমগ্র ভারতে ভক্তিমার্গ প্রচার করিয়াছিলেন। পরিণামস্বরূপ বৈচারিক দৃষ্টিতে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত একই রাষ্ট্রে পরিণত হইল। যদিও ভারতের প্রতি প্রদেশে বহুসংখ্যক রাজ্য ছিল তথাপি বিচারের রাজ্য কাশ্মীর হইতে কন্যা-কুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

"অতঃপর মুসলমানগণ বাহির হইতে আসিলেন। তাঁহারা এক নূতন সংস্কৃতি সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ইসলাম সকলকে সমান বলিয়া মানিতেন। উপনিষদ প্রভৃতিতে সাম্যের কথা ছিল বটে কিন্তু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় বা সামাজিক আচরণে ইহার কিছুমাত্র ছিল না; বরং ইহার বিপরীতই ছিল। অসাম্য-মূলক জাতিভেদ-প্রধান এই সমাজ-ব্যবস্থা। তাই মুসলমানদের সংস্কৃতির সহিত এখানকার সংস্কৃতির সংঘর্ষ বাধিল। মুসলমানেরা তাঁহাদের সংস্কৃতির বিকাশের জন্য হিংসার পথ ও প্রেমের পথ—এই উভয় পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই দুইটি পথ দুইটি ধারার মত একসাথে চলিয়াছিল। গজনী, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি হিংসার পথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর অন্যদিকে আকবর, কবীর প্রভৃতি প্রেমের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তরবারির বলে যে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন অথবা এই দেশের লোক যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন—একথা কেহ বলিতে পারে না। তবে যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে মুসলমান ফকিরগণ এদেশে আসিয়া ইসলামের সাম্যের বাণী গ্রামে গ্রামে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এই জাতিভেদের দেশে তাঁহাদের প্রচারের দ্বারা লোকে খুবই প্রভাবিত হই ছিল। এইভাবে এই দুই সংস্কৃতি পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসিল। ইহার পর এই দেশে বহু ভক্তের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া-ছিলেন এবং একই পরমেশ্বরের উপাসনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। ইহাতে যে ইসলামের বৃহৎ অবদান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর্য-সংস্কৃতি ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ হইয়াছিল তাহাতে এইভাবে ইসলামের সংস্কৃতির রসায়ন যুক্ত হইল।

"ভারতে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে বিজ্ঞানের অভাব ছিল। ভারতে এক সময়ে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল বটে কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে তাহার অভাব হইল। ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া তথায় অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইল ও ইউরোপীয়গণ তখন এখানে আসিয়া পেঁৗছিলেন। ভারত ইংরাজগণের নিকট পরাধীনতাপাশে আবদ্ধ হইল। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকিল। সংঘর্ষের মাধ্যমে সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল। এই মিশ্রণের ফলে এক নূতন সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। তাহা হইতেছে সামূহিক অহিংসা। পূর্বে অহিংসার প্রয়োগ যাহা হইত তাহা ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে হইত। সামুদায়িক ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ হইতে পারিত না। কারণ বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য আজ মানব-সমাজ একে অন্যের সহিত যেরূপ সম্পর্কযুক্ত হইতে পারিতেছে পূর্বে তাহা সম্ভব ছিল না। আজ যেখানে যে সংঘর্ষ আসুক না কেন অথবা যে সম্পর্ক স্থাপিত হউক না কেন, উহা সামাজিক হইয়া পড়িতেছে। তাই বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে কোন আন্দোলন কোন এক দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না। উহা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হইয়া পড়ে। আজকাল এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের এবং এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে—সংঘর্ষও হইতেছে।"*

ইংরাজ ভারতকে কেবলমাত্র পরাধীন করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। পরন্তু উহাকে একেবারে নিঃশস্ত্র করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ভারতে জাগৃতি আসিল এবং স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কিন্তু প্রচলিত উপায়ে অর্থাৎ হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিবার কোন অবকাশ আর থাকিল না। হিংসা প্রয়োগ করিবার যেটুকু প্রচেষ্টা করা হইল তাহাও নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। হৃদয়ে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার জ্বালা; বাহিরে ব্যর্থতা ও নিরাশার ঘোর অন্ধকার। ভারতের অন্তরাত্মা এক কার্যকরী পন্থার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরিস্থিতির প্রয়োজনের দাবিতে ভারতের অধ্যাত্ম ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সংযোগের ফলে সামুদায়িক অহিংসার উদ্ভব হইল। যুগের দাবিতে, যখন এইভাবে আত্মার কোন গুণের বিকাশের প্রয়োজন হয় তখন এক যুগ-পুরুষের মাধ্যমে

ঐ গুণের বিকাশ ও প্রচার সাধিত হইয়া থাকে। সামূহিক অহিংসার বিকাশ ও প্রচারকল্পে আবির্ভূত সেই যুগ-পুরুষ হইতেছেন—মহাত্মা গান্ধী:

সামূহিক অহিংসার প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম। অহিংসা জীবনের এক আধ্যাত্মিক বিচার। আত্মার একত্ব অর্থাৎ সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান এই বিশ্বাস হইতেছে অহিংসা-বিচারের উৎস। উহা জীবনের মূলদেশে প্রবেশ করে। জীবনের মূলদেশে প্রবেশলাভ হইলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উহার ক্রিয়া না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই আজ ভারতে আর্থিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রে সামূহিক অহিংসার সম্প্রসারণ ও বিকাশের সাধনা চলিতেছে। ভারতের পরিস্থিতিতে তাহাই আজ প্রয়োজন। সামুদায়িক অহিংসার চরম পরিণতি সর্বোদয় প্রতিষ্ঠায়। উহাই চরম ও পরম ধ্যেয়।

"এখন ভারত তথা প্রতীচ্যের পালা আসিয়াছে। এখন ভারত এক নূতন সংস্কৃতি, নূতন বিচারধারা অর্থাৎ সামূহিক অহিংসা পশ্চিমের নিকট পৌঁছিয়া দিবে। মনু বলিয়াছেন—"স্বং স্বং চরিত্রং, শিক্ষেরণ, পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ" 'পৃথিবীর সকল লোক চরিত্রের শিক্ষালাভ করিবে—ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট হইতে।' এই যে মনুর ভবিষ্যদ্বাণী উহা মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে।

"আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংযোগে যে পরিণাম সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোক ভারতের মাধ্যমে সারা বিশ্বে বিকীর্ণ হইবে—ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রায়।"* ইহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে। ভারতের পক্ষ হইতে শান্তির জন্য আবেদনের বাণী কোরিয়ায় পৌঁছিল আর সেখানে রণ-বিরতি হইয়া গেল। ভারত ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পূর্ণভাবে সফল করিতে পারিবে কি? সামূহিক অহিংসার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে ত্যাগ এবং ঐকান্তিক ও অক্লান্ত তপশ্চর্যার প্রয়োজন, ভারত যদি তাহা করিতে পারে তবে এই যুগে ভারত সারা জগতকে আলোক দান করিতে পারিবে।

* বিনোবা।

# সূচীপত্র

## ভূদানযজ্ঞ কি?

"যজ্ঞ"—এই কথার সহিত আমরা সকলে পরিচিত। "যজ্ঞ" কি—তাহা আমরা সকলেই কমবেশী জানি। "যজ্ঞ" একপ্রকার পূজাপদ্ধতি। "যজতি যজতে বিষ্ণুং সুধীঃ পূজয়তীত্যর্থঃ"। 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের কথা আমরা জানি। 'রাজসূয়' যজ্ঞের কথাও আমরা জানি। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি যজ্ঞের উল্লেখ আছে। উপরন্তু গারুড়, শ্রৌত-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, মহাব্রত, সর্বোতমুখ, পৌণ্ডরীক, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, আঙ্গিরস ইত্যাদি বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। কিন্তু ভূদানযজ্ঞের উল্লেখ কোথাও নাই। ইহা নূতন শব্দ ও নূতন যজ্ঞ। নূতন শব্দ বলিয়া আমাদের মনে যেন আশঙ্কা না আসে। কারণ যুগান্তকারী শব্দসৃষ্টির সহিত বাঙ্গালী বিশেষভাবে পরিচিত। 'দরিদ্রনারায়ণ' ও 'বন্দেমাতরম্'—এই দুই শব্দের স্রষ্টা বাংলার দুই মহান্ মনীষী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দ সৃজন করেন এবং ঐ শব্দ ধর্ম ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে। 'বন্দেমাতরম্' এর স্রষ্টা ও দ্রষ্টা ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতের জাতীয়তার উন্মেষ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই শব্দ-মন্ত্রের স্থান যে কোথায় তাহা সকলে অবগত আছেন। 'ভূদানযজ্ঞ' এই শব্দও ভারতের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্রান্তিকারক হইবে সন্দেহ নাই। আলোচনা যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই ভূদানযজ্ঞের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইবে। তবে সোজা ও সরল কথায় উহার অর্থ এই—যে ব্যক্তি ভূমিহীন দরিদ্র—যে ভূমি চাষ করিতে জানে ও ভূমি চাষ করিতে চাহে কিন্তু অন্যের ভূমিতে চাষ করা বা শ্রমিকবৃত্তি ছাড়া যাহার অন্য কোন জীবিকা নাই, তাহার জন্য ভূমিদান।

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীব তথা মনুষ্যের জীবনধারণ ও পোষণের জন্য যাহাকিছু মৌলিক প্রয়োজন, তাহা প্রয়োজনানুযায়ী সকলের পক্ষে সমভাবে প্রাপ্য করিয়া দান করিয়াছেন; তাহা হইতেছে পঞ্চভূত—"ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুৎব্যোম্"—ক্ষিতি (ভূমি), অপ্ (জল), তেজ (আলো), মরুৎ (বাতাস),

ব্যোম্ (শূন্যদেশ)। বাতাস সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ভোগ করিতে পারে। বাতাসে সকলের সমান অধিকার। আলোতেও সকলের সমান অধিকার এবং সকলে তাহা নিজ নিজ প্রয়োজনমত ভোগ করিতে পারে। জলেও সকলের সমান অধিকার। আকাশের জল যখন বর্ষিত হয়, তখন তাহা উচ্চ-নীচ বা ধনী-দরিদ্র ভেদ জ্ঞান করে না। নদীর প্রবহমান জলে সকলের সমান অধিকার। ভগবানের সৃষ্টির কৌশল এমন যে, মানুষ তথা তাঁহার সৃষ্ট অন্য জীবের জন্য যে জিনিষের যত বেশী প্রয়োজন তাহাকে তিনি ততই সহজপ্রাপ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বাতাস না হইলে মানুষ অল্পক্ষণও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তাই বাতাসকে তিনি সর্বাপেক্ষা সহজপ্রাপ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন ঈশ্বরের দান বাতাস, আলো ও জলে সকলের সমান অধিকার তেমনি ঈশ্বরের দান ভূমিতেও সকলের সমান অধিকার। ভগবানের দানে একজনের অধিকার থাকিবে আর অন্য জনের অধিকার থাকিবে না—ভগবানের এমন বিধান হইতে পারে না। এই সম্পর্কে বিনোবাজী তাঁহার অনুপম ভাষায় বলিয়াছেন—"সূর্য ঘরে ঘরে গিয়া পেঁছায়। উহার রশ্মি রাজা যতটুকু পায় মেথরও ততটুকু পাইয়া থাকে। ভগবান কখনও নিজের জিনিসকে অসমানভাবে বিতরণ করেন না। যদি ভগবান হাওয়া, জল, আলো ও শূন্যদেশের বিতরণে ভেদভাব না করিয়া থাকেন, তবে ইহা কিরূপে হওয়া সম্ভব যে, তিনি জমি সকলকে সমানভাবে না দিয়া মাত্র কতিপয় লোকের হাতে থাকিতে দিবেন?" কিন্তু যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজের অর্থনৈতিক অপব্যবস্থার ফলে সেই ভূমি হইয়া গিয়াছে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। একজনের আছে আর একজনের নাই। একজনের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত, আর একজনের কাছে প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। তাই দেশে এত হাহাকার! দেশের ভীষণ দারিদ্র্যের-দেশের মধ্যে বিকট ধনবৈষম্যের মূলে এই অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত ভূমিব্যবস্থা! যাঁহার হৃদয় আছে তিনি অন্তরে অনুভব করিতে পারেন যে, ভারতের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া অহরহ দরিদ্র ভূমিহীনের আকুল ক্রন্দনরোল উত্থিত হইতেছে। মায়ের কোল ফিরিয়া পাওয়ার জন্য মাতৃহারা শিশুর যেমন আকুল আগ্রহ, ভূমি পাওয়ার জন্য ভূমিহীন দরিদ্রের তেমনি

আগ্রহাকুল প্রতীক্ষা। যেমন নিঃসন্তান রমণী অন্যের সন্তানকে লালন-পালন করিলেও নিজ গর্ভজাত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিবার যে স্বাভাবিক ক্ষুধা তাহা তৃপ্ত হয় না, তেমনি অন্যের ভূমি চাষাবাদ করিলেও ভূমিহীন দরিদ্রের ভূমি-ক্ষুধা তৃপ্ত হয় না।

গ্রাম সংগঠনের কাজ সফল হইতেছে না কেন? গঠনমূলক কর্মীদের অভিজ্ঞতা কি? ভূমিহীনকে চরকা দেওয়া হইয়াছে—তাঁত দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে অন্যান্য গৃহশিল্প দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহা সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই—তাহাতে তাহার অন্তর তৃপ্ত হয় না। কারণ সে সর্বপ্রথমে চাহে ভূমি—ভূমিকে সে আপনার করিয়া পাইতে চাহে। ভারত তথা এশিয়া মহাদেশের যেখানে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহার মূলগত কারণ—এই ভূমি সমস্যা। তাই ভূমি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর ভারতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ।

কেন এই নিদারুণ ভূমিক্ষুধা? উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যেই উহার কারণ নিহিত রহিয়াছে। সকলের সমানভাবে পাওয়ার অধিকার দিয়া ভগবান যে 'পঞ্চভূত' দান করিয়াছেন ভূমি তাহাদের অন্যতম। মানুষের জীবনধারণের জন্য পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন অপরিহার্য। মানুষের চলাফেরার জন্য ব্যোমের (space) প্রয়োজন। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু, পানের জন্য জল ও তাপ সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য আলোর প্রয়োজন। এই চারিটি তো মানুষ প্রয়োজন মত সমান অধিকারে পাইয়া থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র ইহাতেই মানুষ বাঁচিতে পারে না। জীবনধারণের জন্য ইহা ছাড়া তাহার খাদ্য, পরিধেয় ও আবাস গৃহের প্রয়োজন। খাদ্য-সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্রাদির উপাদান ও আবাসের যাবতীয় সরঞ্জাম উৎপাদনের একমাত্র উৎস ও সাধন ভূমি বা ভূগর্ভ। সুতরাং ভূজাত বা ভূমিগর্ভজাত উৎপাদনের উপর মানুষের খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসের যাবতীয় ব্যবস্থা নির্ভর করে। ভূমি বা ভূগর্ভ ব্যতীত আর কিছু হইতে ঐ সকলের উৎপাদন সম্ভব নহে। মানুষ হাতে বা যন্ত্রে অনেক কিছু দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু খাদ্যশস্য, শাকশব্জী ও ফলমূলাদি একমাত্র ভূমিতেই উৎপন্ন হয়। আমাদের পরিধেয়

বস্ত্রাদির জন্য তূলা এবং চরকা ও তাঁতের কাঠ ভূমি হইতে উৎপন্ন; বস্ত্রকলের লৌহও ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন। বাস গৃহাদি মৃত্তিকা, ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত যাহাই হউক তাহার যে কোন উপাদান ভূমি বা ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন। এইভাবে একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমাদের জীবন-ধারণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যাহা কিছু দ্রব্য-সামগ্রী সকলেরই মৌলিক উৎপত্তি-স্থল ভূমি বা ভূগর্ভ। বায়ু, আলো ও জলের সহিত ভূমির পার্থক্য এই যে উহারা সরাসরিভাবে ভোগ্য অর্থাৎ বায়ু, আলো ও জল ভোগ করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়া উহাদের উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসস্থল পাইতে হইলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উহা পরি-শ্রম করিয়া উৎপাদন করিতে হয়। ভগবান মানুষকে খাইবার জন্য যেমন এক মুখ দিয়াছেন, তেমনি উৎপাদন করিবার জন্য দুই হাত দিয়াছেন। ভূমি মানুষের জীবিকা অর্জনের মৌলিক ক্ষেত্র এবং খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসস্থল উৎপাদনের মৌলিক সাধন। তাই বাতাস, জল ও আলোর ন্যায় ভূমিতে মানুষের সমান অধিকার অব্যাহত না রাখিলে মানুষের জীবন অন্যের হস্তে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং মানুষ—বিশেষতঃ যে মানুষ ভূমিতে দুই হাত খাটাইয়া উৎপাদন ও জীবিকার্জন করিতে চায়—শ্বাসরোধের ন্যায় অবস্থা অন্তরতম প্রদেশ হইতে অনুভব করে। আজ যদি এমন হইত যে বায়ুর উপর মানুষ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে এবং বায়ু মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, অধিকাংশ বায়ু কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হইয়াছে, বায়ুতে জমিদারী ও জোতদারী ধরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বায়ুর বিঘার মূল্য ২০০৲ টাকা ও বায়ুর বিঘার খাজনা ১০৲ টাকা হইয়াছে তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত? যাহার অধিকারে বায়ু নাই সে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বায়ুর জমিদার ও বায়ুর জোতদারের কাছে ছুটাছুটি করিত। সে মনে করিত যে বায়ুর জমিদার ও জোতদারের নিকট তাহার জীবন-মরণ বাঁধা আছে। যেমন রূপকথার রাক্ষসীর হাতে মানুষের জীবন-কাঠি ও মরণ-কাঠি থাকে; সেরূপ যে ব্যক্তি ভূমি চাষ জানে ও ভূমি চাষ করিতে চায় এবং ভূমি চাষ ছাড়া আজ যাহার স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে, অথচ যাহার নিজের ভূমি নাই—সে ব্যক্তি অনুভব করে যে তাহার জীবন ও

মরণ জমিদার ও জোতদারের হাতে বাঁধা—তাহার জীবন-কাঠি ও মরণ-কাঠি জমিদার ও জোতদারের হাতে। কারণ তাহার জীবনধারণের জন্য বায়ু, জল ও তাপ ব্যতীত আরও যে তিনটি জিনিষ অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন সেই খাদ্য, বস্ত্র ও আবাস-গৃহ উৎপাদনের সাধন যে ভূমি তাহা তাহার হাতে নাই। তাহার জন্য তাহাকে নির্ভর করিতে হয় অন্যের খেয়াল-খুসির উপর। তাই সে রুদ্ধশ্বাস মানুষের ন্যায় অনুভব করিতে থাকে। তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের এই অনুভূতি। তাহার অন্তরের ভাষা এই। কিন্তু সে মূক। যদি শীঘ্র ও শান্তির পথে ভারতে ভূমির সুসম বণ্টন না হয় তবে ভারতের প্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে এবং ভারতকে এক অভাবনীয় দুর্দৈবের সম্মুখীন হইতে হইবে। মানুষের অন্তরে স্বাভাবিক ও নিদারুণ ভূমি-ক্ষুধাও এইজন্যই।

এই ভূমিক্ষুধা মিটিবে কিরূপে? ভূদানযজ্ঞ শান্তি ও প্রেমের পথে এই ভূমিক্ষুধা তৃপ্ত করিবার ভারতব্যাপী প্রচেষ্টা। সকলের হৃদয়ে ভগবান বিরাজমান। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন—মানুষের হৃদয়স্থিত সেই ভগবানের কাছে প্রেমপূর্ণ আকুল আবেদন। "ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। সে অধিকার হইতে যে বঞ্চিত, সে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত—সে আজ সর্বহারা। সে ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে। তাহার জীবিকা অর্জনের অন্য কোন উপায় নাই। তাহার সে হৃত অধিকার তাহাকে প্রত্যর্পণ কর। তাহার প্রাপ্য ভূমি তাহাকে ফিরাইয়া দাও। ভূমির মালিক ভগবান। ভূমি সকলের মাতা। সকলেই ভূমির সন্তান। কিন্তু তুমি নিজেকে ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য করিতেছ। মাতাকে দাসী করিয়াছ। আজ সেই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার দিন আসিয়াছে। ভূমির মালিকত্ব বিসর্জন দেওয়ার দীক্ষা গ্রহণ কর। সন্তানকে ভূমিমাতার বুক হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। মায়ের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ও বঞ্চিত সন্তানের উষ্ণ অশ্রুজল দেশের আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কেহই শান্তি পাইতেছে না। মাকে বঞ্চিত সন্তানের কাছে ফিরাইয়া দাও। শান্তি ফিরিয়া আসিবে। ধনীর কল্যাণ হইবে, দরিদ্রের কল্যাণ হইবে এবং দেশেরও কল্যাণ হইবে। মানুষের অন্তরস্থিত সুপ্ত ভগবান! তুমি আজ

জাগত হও, তুমি প্রসন্ন হও। জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, যে অন্যায় ভূমিহীন দরিদ্রের প্রতি যুগ যুগ ধরিয়া করা হইয়াছে, আজ তাহার প্রতিকারে হউক। বঞ্চিতের ভগবান আজ জাগ্রত।"

**ভূদানযজ্ঞের সফলতায় আশংকা**

এই আবেদনে কি মানুষ সাড়া দিবে? যে জগতে মানুষ পাঁচ কাঠা ভূমিও অন্যকে এমনি দেয় না, পাঁচ কাঠা ভূমি লইয়াও লোকে যেখানে মারা-মারি কাটাকাটি করে—হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে সেখানে মানুষ কি এইরূপ আবেদনে স্বেচ্ছায় সাড়া দিবে? ভারতের কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩০ কোটী একর। ইহার একষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ৫ কোটী একর ভূমি যদি আজ যাহাদের হাতে ভূমি আছে, তাহাদের হাত হইতে ভূমিহীন দরিদ্রের হাতে আসিয়া যায় তবেই ভূমিসমস্যার সমাধান হইতে পারে। এত-বড় বিরাট সমস্যার সমাধান কিভাবে হওয়া সম্ভব?

গত ১৯৫২ সালের মে মাসে ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী হটুগঞ্জ গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ ভূদানযজ্ঞ সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের প্রবর্তন করা হয়। উহার অব্যবহিত পরে ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচার ও ভূদান সংগ্রহ করিবার জন্য ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় লেখক পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন। একদিন বৈকালে এক গ্রামে ভূদানযজ্ঞ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার সময় জনসভায় উপস্থিত সেই অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লেখককে বলিলেন—"দেখুন, এ' আন্দোলন পাগ-লামি ছাড়া আর কিছু নয়। জমি পেতে হলে হয় আইন করে নিতে হবে—নয় তো বলপ্রয়োগ করে নিতে হবে। জমি চাইলে লোকে স্বেচ্ছায় জমি দেবে—এ' আশা করা পাগলামি ছাড়া আর কি হতে পারে? বিনোবাজী এক পাগল, তাঁর পিছনে আপনারা কিছু পাগল জুটেছেন। আমাদের শাস্ত্র—আমাদের মহাভারত এই শিক্ষা দান করেছে—বিনা লড়াই-এ কেউ কাউকে ভূমি ছেড়ে দেয় না—শান্তির পথে কেউ ভূমি প্রত্যর্পণ করে না।" লেখক উহার উত্তরে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমি কিন্তু মহাভারত হতে এর বিপরীত শিক্ষালাভ করেছি। পাণ্ডবদের ন্যায্য প্রাপ্য ভূমি কৌরবেরা ফেরৎ

দিলেন না। শান্তির পথে সূচ্যগ্র ভূমিও দিলেন না। লড়াই বাধ্‌ল। তদানীন্তন ভারতবর্ষের যেখানে যে রাজা ছিলেন, তাঁরা পাণ্ডব পক্ষে না হয় কৌরব পক্ষে যোগদান করলেন। লড়াই হল, রাজারাজড়া সবই নিহত হলেন। কৌরবেরা ত সবই নিহত হলেন, পাণ্ডবদের অবস্থাও প্রায় তাই। কুলে বাতি দেবার মতো কয়েকজন মাত্র জীবিত রইলেন। এতদূর মর্মান্তিক পরিণতি ঘটল। মহাভারত এ সম্পর্কে যদি কোনো শিক্ষা দিয়ে থাকে, তা হচ্ছে যে, যার প্রাপ্য ভূমি তাকে প্রত্যর্পণ করতে হয়, নচেৎ সর্বনাশ অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।"

কিন্তু তথাপি মন হইতে সংশয় দূরীভূত হয় না। এইরূপ বলা হয় যে, ইতিহাসে ইহার নজীর নাই। যাহা ইতিপূর্বে কখনও সংঘটিত হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে। এই আপত্তি বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ইতিহাসে কোন্ বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়? যাহা কখনও ঘটে নাই তাহা সংঘটিত হইলে তবেই তাহা ইতিহাসে স্থানলাভ করে। যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিয়া থাকে, তাহা তো ইতিহাসই নয়। ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হইবার পূর্বে ইতিহাসে কি তাহার কোন নজীর ছিল? নিঃশস্ত্র সংগ্রাম করিয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে কি কখনও ইতিহাসে ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল? অতএব এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। তথাপি মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হয় না। আশা করা যায় যে, ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের উৎপত্তি, বিকাশ ও অদ্যাবধি পরিণতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই সংশয় দূরীভূত হইবে।

**কে এই বিনোবা?**

ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের স্রষ্টা ও প্রবর্তক আচার্য বিনোবা ভাবে। কে এই আচার্য বিনোবা ভাবে? তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রধানতম শিষ্য এবং গান্ধীমন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহক। তিনি আজীবন সেবাব্রতী সন্ন্যাসী। বয়স ৫৮ বৎসর। পাঠ্যাবস্থা শেষ হইবার পূর্বে ২২ বৎসর বয়সে ১৯১৬ সালে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সবরমতি আশ্রমে যোগদান করেন। আশ্রমের সর্বপ্রথমকার আশ্রমবাসীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বন্ধুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন—কেন তিনি ঐ আশ্রমে যোগদান করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন —"আমি ভগবানের অন্বেষণে এখানে আসিয়াছি।" "তাহা হইলে তীর্থে যাও নাই কেন? মন্দিরে যাও নাই কেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"মন্দিরে হিন্দুর ভগবান, মসজিদে মুসলমানের ভগবান, গির্জায় খৃষ্টানের ভগবান। ধনীর মন্দিরে ধনীর ভগবান। আমি মানুষের ভগবানকে পাওয়ার জন্য এখানে আসিয়াছি।" কোন মানসিক উত্তেজনা বা আকস্মিক ভাবপ্রবণতার বশে হঠাৎ তিনি গৃহত্যাগ করেন নাই। গৃহত্যাগ করিবার কথা পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভাবিয়া তবে তিনি ১৯১৬ সালে গৃহত্যাগ করেন। আশ্রমে যোগদান করিবার জন্য ঘর ছাড়িবার পূর্বে তিনি তাঁহার সার্টিফিকেটগুলি লইয়া বাড়ীতে উনানের পার্শ্বে বসিলেন এবং একটি একটি করিয়া সার্টিফিকেট-গুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন—"কি করছ?" তিনি উত্তর দিলেন—"সার্টিফিকেটগুলি পুড়াইয়া ফেলিতেছি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?" বিনোবাজী বলিলেন—"ইহাতে আমার কি প্রয়োজন?" মা বলিলেন—"প্রয়োজন না থাকুক, রাখিয়া দিলে ক্ষতি কি?" বিনোবাজী উত্তর দিলেন—'রাখিয়া দিলে ক্ষতি কি?'—এই কথার মধ্যে এই মনোভাব নিহিত রহিয়াছে যে, কোন না কোন সময়ে ইহার প্রয়োজন হইতে পারে; তাহা যদি না হয়, তবে রাখিয়া দিবার প্রয়োজন কি? যে পথ আমার নহে, সেই পথের কথা বাঁচাইয়া রাখা কেন? তাহাতে বৃথা উদ্বেগ সৃষ্টি করা হয়। ইহা অপেক্ষা অন্য পথ বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল। তাহাতে নিজ পথে চলিবার উৎসাহ মিলিবে।" বিনোবাজীর কাজ করিবার রীতি এইরূপ। উপরন্তু কিরূপ দৃঢ় সংকল্প লইয়া তিনি গৃহত্যাগী হন ইহা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তিনি বেদে বিশেষতঃ ঋগ্বেদে পণ্ডিত। তিনি গণিতজ্ঞ। তিনি বহু ভাষায় ব্যুৎপন্ন। ইংরাজী, ফরাসী, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, কানারীজ, হিন্দি, উর্দু, আরবী, পারসী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা তিনি বিশেষ জানেন। বর্তমানে তিনি বাংলা শিখিতেছেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে ধর্মভাবের আধিক্য প্রকাশ পায়। সবরমতি আশ্রমে থাকাকালীন বৎসরে একটি করিয়া মহাব্রত তিনি নিজের

জীবনে গ্রহণ করেন। গীতা তাঁহার জীবনে এক বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রতি কার্যে গীতা তাঁহার পদপ্রদর্শক। গীতার শ্লোকের অনুরূপ ছন্দে তিনি মারাঠী শ্লোকে গীতার এক অপূর্ব সমশ্লোকী অনুবাদ রচনা করেন। উহার নাম দিয়াছেন "গীতাই"। "গীতাই" মহারাষ্ট্রে এত জনপ্রিয় হইয়াছে যে, এযাবৎ উহার লক্ষাধিক কপি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু মারাঠী ভাষায় "গীতাপ্রবচন" নামে তাঁহার এক গীতা ভাষ্য আছে। উহা হিন্দিতে অনূদিত হইয়া এযাবৎ পাঁচটী সংস্করণে ৭০ হাজারের অধিক বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। ইহা এক অপূর্ব ভাষ্য। গীতার অনাসক্তি ও কর্মযোগের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে ইহাতে গভীরতম আধ্যাত্মিক অথচ সহজবোধ্য হৃদয়গ্রাহী ভাবাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। কর্মযোগে দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর পক্ষে ইহার অধ্যয়ন অপরিহার্য। তাই ইহা কর্মীদের পক্ষে অবশ্য ও নিত্য পঠনীয় বলিয়া গণ্য করা হয়।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি প্রখর। খুব বড় বিষয়কে খুব কম কথায় প্রকাশ করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। জেলে থাকিবার সময় এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। জেল কেমন তাহা তিনি বিনোবাজীর নিকট জানিতে চাহেন। বিনোবাজী তাঁহাকে বলেন—"আপনি সার্কাস দেখিয়াছেন?" তিনি বলেন—"হ্যাঁ।" বিনোবাজী বলেন, "তবে ঠিক আছে। জেলখানা সার্কাসের ঠিক বিপরীত। সার্কাসে মানুষ পশুকে শাসন করে আর জেলখানায় মানুষের উপর পশু শাসন-কর্তৃত্ব চালায়।" তাড়াতাড়ি যে কোন ভাষা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসীম। বিভিন্ন ভাষার রচনার তুলনামূলক পদ্ধতি তিনি বাল্যকাল হইতে আয়ত্ত করেন। তিনি আহমেদাবাদে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যান। সেখানে ম্যাট্রিকে ফরাসী ভাষা পাঠ্য ছিল। তখন পর্যন্ত বিনোবাজী ফরাসী ভাষার পাঠ্য পুস্তকগুলি খুলিবারও অবকাশ পান নাই। কিন্তু বিভিন্ন ভাষার রচনার তুলনামূলক পদ্ধতি তাঁহার জানা থাকায় তিনি দুই দিনের মধ্যে ফরাসী ভাষার পাঠ্য বইগুলি দেখিয়া লন ও ফরাসী ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তাঁহার প্রকৃতি শিক্ষার্থীসুলভ। তিনি অধ্যয়নশীল। ইহা সত্ত্বেও এই সুপণ্ডিত ব্যক্তি আশ্রমে থাকাকালীন অধিকাংশ সময় সূতা কাটিয়া অতিবাহিত করিতেন। মহাত্মা গান্ধী জনসাধারণের কাছে একক সত্যাগ্রহী

হিসাবে তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া ১৯৪০ সালে লিখিয়াছিলেন—"পায়খানা সাফাই-এর কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রান্নাবান্না প্রভৃতি আশ্রমের প্রত্যেক কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। চরকা ও তকলীতে সূতাকাটায় তিনি শুধু বিশারদ নহেন, সারা ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় আর কেহ এত সম্পূর্ণতা লাভ করেন নাই। সূতাকাটার প্রতি তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস যে, তিনি উহাকে সমস্ত কার্যক্রমের কেন্দ্র-মনি করিতে চান। সূতাকাটাকে মৌলিক হস্তশিল্প গণ্য করিয়া বিনোবা ঐ বিষয়ে এক মৌলিক পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, চরকা অহিংসার অত্যন্ত উপযোগী বাহ্য প্রতীক্। অস্পৃশ্যতা ভাবের কণামাত্রও তাঁহার মনের কোথাও নাই। সাম্প্রদায়িক একতায় তাঁহার বিশ্বাস আমার অপেক্ষা কম নয়। মুসলমান ভাইদের সহিত সম্পর্ক দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিশেষভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন এবং এক বৎসর কাল ধরিয়া কোরান অধ্যয়ন করিয়াছেন।"

মহাত্মা গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমহাদেব দেশাই ঐ সময়ে বিনোবাজীর প্রশংসায় লিখিয়াছিলেন—"লোকে আজ নহে—কয়েক বৎসর পরে বিনোবার প্রভাব বুঝিতে পারিবে। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। প্রখর বিদ্বান। গঠনকার্যে পুরোভাগে রহিয়াছেন এবং দিবারাত্র তিনি ঐ কাজেই লিপ্ত আছেন। কোন এক বিষয় স্থির হইয়া গেলে—কোন এক তত্ত্ব নিজে উপলব্ধি করিলে, সেই মুহূর্ত হইতেই তিনি উহা নিজ জীবনে আচরণ করিতে থাকেন। ইহা তাঁহার সর্বোত্তম সদ্গুণ। তাঁহার দ্বিতীয় গুণ—নিরন্তর বিকাশশীলতা। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'—এই অর্থে বিনোবা সত্যিকারের যোগী। বিচার, বাক্য ও আচারের সমন্বয় বিনোবাজীর জীবনে যেমন দেখা যায় এমন খুব কম লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তাঁহার জীবন মধুর সঙ্গীতময়। 'সঞ্চার কর সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ' কবিবর ঠাকুরের (গুরুদেবের) এই প্রার্থনা বিনোবা বোধ হয় পূর্ব জন্ম হইতেই আয়ত্ত করিয়া আসিয়াছেন।"

মহাত্মা গান্ধী ১৯১৫ সালে সবরমতিতে আশ্রম স্থাপন করেন। ওয়ার্ধার স্বনামধন্য শ্রীযমুনালাল বাজাজজী সেখানে সময় সময় যাইতেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ও সূক্ষ্মভাবে মহাত্মাজীর কার্যাবলী ও

জীবনধারা অবলোকন করিতেন। মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিক জীবনধারায় প্রভাবিত হইয়া তিনি মহাত্মাজীকে ওয়ার্ধায় আসিয়া আশ্রম স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। মহাত্মাজী তাহাতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু যমুনালালজী ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি লক্ষ্য করেন—বিনোবাজী একটি রত্ন। তিনি বিনোবাজীকে চাহিয়া বসিলেন এবং তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর সম্মতি লাভ করিয়া বিনোবাজীকে দিয়া ওয়ার্ধায় সবরমতি আশ্রমের একটি শাখা স্থাপন করিলেন। তখন হইতে বিনোবাজী সবরমতি ত্যাগ করিয়া ওয়ার্ধায় বাস করিতে থাকেন এবং ওয়ার্ধার সমস্ত গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা বিনোবাজীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে। যমুনালালজী ও তাঁহার পরিবারের সকলের সহিত বিনোবাজীর অত্যন্ত আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। যমুনালালজীর পুত্র কমলনয়ন ও তাঁহার কন্যা মদালসার শিক্ষা ও জীবন গঠনের কাজ বিনোবাজী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। যমুনালালজী তাঁহাকে আধ্যাত্মিক গুরুস্বরূপ গ্রহণ করেন। বিনোবাজীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে যমুনালালজীর জীবন ত্যাগমুখী হইতে লাগিল। যমুনালালজী ছিলেন—ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। মহাত্মাজী চাহিতেন—ধনী যেন তাঁহার ধনসম্পত্তি দরিদ্রের ট্রাষ্টীস্বরূপে গ্রহণ করেন এবং দরিদ্রের হিতার্থে উহা বিনিয়োগ করেন। যমুনালালজীর জীবনে এই আদর্শ বহুলাংশে অনুসৃত ও পালিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ বিনোবাজীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে যমুনালালজীর জীবনে এরূপ আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এক বেদ-মন্ত্রের সায়নাচার্যকৃত ভাষ্য সম্পর্কে যমুনালালজীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"যে ধনিক তাহার আশেপাশের লোকদের দিকে না তাকাইয়া অর্থ সঞ্চয় করে, সে ধন সংগ্রহ করিবার পরিবর্তে নিজের বধই সংগ্রহ করিয়া থাকে।" বিনোবাজীর এই উপদেশাবলী যমুনালালজীর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

শুধু গালি দিয়া নয় প্রশংসা করিয়াও মানুষটিকে ঠিক চিনিয়া লওয়া যায়। প্রশংসার প্রতিক্রিয়ার মানুষের প্রকৃতির গভীরতম অন্তঃস্থলেও আলোকসম্পাত হয়। বিনোবাজীর ওয়ার্ধায় থাকার সময়ের কথা। তিনি তাঁহার পত্রগুলি পাওয়া মাত্র একবার পড়িয়া লইয়া তখনকার মত রাখিয়া

দিতেন এবং বহু পত্র জমা হইলে এক সঙ্গে সবগুলির উত্তর লিখিয়া তবে পত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। একবার বিনোবাজী একখানি পত্র পাইয়া উহা পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলেন। তখন যমুনালালজীর পুত্র কমলনয়ন বিনোবাজীর কাছে ছিলেন। ইহা তাঁহার কাছে খুব আশ্চর্য লাগিল। এ পত্রখানি উত্তর লিখিবার জন্য না রাখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইল কেন? কমলনয়ন পত্রের ছিন্নখণ্ডগুলি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন। উহা মহাত্মা গান্ধীর লিখিত পত্র এবং উহাতে এই কয়টি কথা লেখা ছিল—"তুম্ সে বঢ়্কর উচ্চ আত্মা মেরী জানকারী মে নহী হ্যায়" অর্থাৎ "তোমার চাইতে উচ্চাত্মা আর কেহ আমার জানা নাই।" বাপুজীর এতবড় প্রমাণপত্র আর তাহার এই অবস্থা! কমলনয়ন বিনোবাজীকে বলিলেন—"এতবড় জিনিস! ইহা এরূপ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন কেন?" বিনোবাজী সহজভাবে উত্তর দিলেন—"ইহা আমার কোন কাজে আসিবে না; তাই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।" কমলনয়ন বলিলেন—"ইহা রাখিয়া দিবার জিনিস। ভবিষ্যতে বহু কাজে লাগিবে।" বিনোবাজী পুনরায় সহজভাবে উত্তর দিলেন—"যে জিনিস আমার নিজের কাজে লাগিবে না, তাহা ভবিষ্যতের জন্য কেন সংগ্রহ করিয়া রাখিব? বাপু নিজের মহত্ত্বে আমাকে ঐরূপ ভাবিয়াছেন। আমার দোষগুলিতো তিনি দেখেন নাই?" এই সহজ কথা কয়টিতেই সমগ্র বিনোবাকে চিনিয়া লওয়া যায়। বিনোবা কিরূপ অন্তর্মুখ এবং তাঁহার প্রকৃতি কত গভীর আধ্যাত্মিকতায় ভরা—ইহা তাহার এক নিদর্শন।

বিনোবাজীর অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর এবং তিনি কত উচ্চ স্তরের অপরিগ্রহী তাহা নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে। প্রথমে তিনি পুস্তকের উপর নিজের নাম লিখিতেন। পরে তাঁহার মনে এক চিন্তার উদয় হইল : পুস্তকের উপর নাম লিখিব কেন? পুস্তক তো সম্পত্তি। পড়া হইয়া যাইবার পর উহা জমা করিয়া রাখা পরিগ্রহ। কোন সম্পত্তি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকা উচিত নয়। নিজের কাজ হইয়া যাইবার পর যদি অন্য কেহ উহা ব্যবহার করিতে চাহেন তবে মনে করা উচিত যে, তিনি আমার উপকার করিতেছেন। তখন হইতে বিনোবাজী আর পুস্তকের উপর নিজের নাম লিখেন না এবং পুস্তক পড়া হইয়া গেলে তাহা অন্যকে

দিয়া দেন এবং মনে করেন যে, সে ব্যক্তি তাঁহার উপকার করিতেছেন। এমন কি ১৯১৮ সালে যখন তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন এবং নিজের বোঝা নিজের মাথায় লইয়া ঘুরিতেন তখনও নূতন পুস্তক লইবার আবশ্যক হইলে তিনি তাঁহার বোঝার পুরাতন পুস্তকগুলি অন্যকে দিয়া বোঝা হাল্কা করিয়া লইতেন।

অর্থ ও শ্রম—এই দুই শক্তি জগতে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। উৎপাদক শ্রমকে ছাড়িয়া লোকে অর্থের উপর অধিকাধিকভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় জগতে যত অনর্থ ঘটিতেছে। অতীত সমাজে এমন এক সময় ও অবস্থা কল্পনা করা যায় যখন সকলেই দ্রোহরহিত উৎপাদক শ্রমে রত থাকিত এবং নিজ নিজ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিজ শ্রমে উৎপাদন করিয়া লইত। তখনও সেই অবস্থায় সমাজে কেহ একেবারে নিঃস্ব থাকিত না। আবার কেহ অধিক ধনবানও হইতে পারিত না। সকলে সমান সংগতিসম্পন্ন না হউক বৈষম্য অধিক থাকিত না ও থাকিতে পারিত না। কিন্তু বহুলোক উৎপাদক শ্রম ত্যাগ করাতেই এত ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সংকট অবস্থায় পতিত ব্যক্তির অসহায় অবস্থার সুযোগে মানুষ অন্যকে নিজের প্রয়োজনে নিযুক্ত রাখিবার সুবিধা পাইল এবং নিজে উৎপাদক শ্রম ত্যাগ করিয়া আরাম ভোগ করিতে প্রলুব্ধ হইল। তাই তাহার হাতে ভূমি ও উৎপাদনের অন্যান্য সাধন যথা উৎপাদনের যন্ত্রাদি পুঞ্জীভূত ও কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। এরূপে ক্রমশঃ বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়া উহা ব্যাপকতর ও গভীরতর হইতে থাকিল। অর্থের সাহায্যে মানুষ অন্যের শ্রমকে খরিদ ও নিয়োগ করিতে সুবিধা পাইল। অর্থ দিয়া অন্যের শ্রমার্জিত দ্রব্যাদি খরিদ করিবারও সুবিধা হইল। তাই অর্থ ধন বৈষম্যের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার রূপে ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। তাই শ্রমের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লোকে অর্থ সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকে। জগতে কতিপয়ের হাতে ও অনুৎপাদকের হাতে যে ভূমি ও উৎপাদনের অন্যান্য সাধন কেন্দ্রীভূত হইতেছে উহার মূলগত কারণও তাহাই। তাই বর্তমান যুগে শ্রম তথা শ্রমিকের মর্যাদা নষ্ট হইয়াছে এবং অর্থের উপর মিথ্যা মহত্ত্ব আরোপ করা হইতেছে। উৎপাদক শ্রমকে

তাহার মহান্ সম্মানের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা যাইবে না এবং সমভাবে সকলের মঙ্গলসাধন করাও সম্ভব হইবে না। বিনোবাজী বলেন—"বর্তমানের বিকারগ্রস্ত সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক জিনিসের মূল্য পয়সায় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে জিনিসের প্রকৃত মূল্য নজরে আসে না। এরূপ বলা হয় যে, এখানে জমি খুব দুর্মূল্য কিন্তু কার্যতঃ উদারতার দিক হইতে জমি সেই একরূপই হইয়া আছে। গত পরশু বক্সারের গেজেটিয়ারে পড়িলাম যে, দেড় শত বৎসর পূর্বে সেখানে এক সের গম এক পয়সায় বিক্রয় হইত, আজ সেই স্থলে এক সের গম দশ আনায় বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু তখন এক সের গমে যতটা পেট ভরিত এবং যতটা পুষ্টি হইত, আজও তাহাই হইতেছে। কিন্তু আজ পয়সার মায়াজালে পড়িয়া মরুভূমিকে জলাশয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।" তিনি আরও বলেন "লোকের হৃদয় শুদ্ধ আছে। যদি কিছু বিগড়াইয়া থাকে তবে তাহা হইতেছে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। উৎপাদনের সহিত পয়সার এবং শ্রমের সহিত পয়সার কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকিতেছে না। পয়সা সদা-সর্বদা নিজের কথা পরিবর্তন করিতেছে। কখনও উহা এক টাকা বলে, কখনও দুই টাকা আবার কখনও চার টাকা বলে। পয়সা বদমাইস ও দুশ্চরিত্র। তাহাকে আমাদের কারবারী করিয়াছি। বদমাইসের কাছে আমরা আমাদের চাবি রাখিয়াছি।" তাই বিনোবাজী কয়েকদিন উপবাসী থাকিয়া ভগবানের নামে সংকল্প গ্রহণ করেন যে, তিনি আর অর্থ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার আশ্রম—ওয়ার্দ্ধা হইতে ৫ মাইল দূরে পাওনার নামক স্থানে। তাঁহার আশ্রমের নাম পরমধাম। অর্থবর্জনের সংকল্প লইয়া বিনোবাজী ও তাঁহার সহকর্মীগণ আশ্রমে কায়িকশ্রমের দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সবকিছু উৎপাদন করিতে রত থাকেন। তিনি আশ্রমে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। যদি কেহ সাহায্য দিতে চাহিতেন, তবে তিনি মাত্র নিজের কায়িকশ্রমের দ্বারা সাহায্য দিতে পারিতেন। এই আদর্শ অনুসরণ সর্বোদয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—**"কাঞ্চনমুক্তি"**। সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে **'কাঞ্চনমুক্তি'** সাধন অপরিহার্য।

গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের জন্য লোক বা অর্থ দিয়া সাহায্য না করার জন্য প্রচারকল্পে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। স্থির হয় যে, মহাত্মা গান্ধী বাছিয়া বাছিয়া পর পর যাহাকে সত্যাগ্রহ করিতে নির্দেশ দিবেন—মাত্র তিনিই তাঁহার ক্রম অনুসারে সত্যাগ্রহ করিতে পারিবেন। সারা ভারত চমকিত হইয়া শুনিল যে, আচার্য বিনোবাভাবে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রথম সত্যাগ্রহী মনোনীত হইয়াছেন। ঐ আন্দোলন পরে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে "ইংরেজ ভারত ছাড়" আন্দোলনে পরিণত হয় ও উহার ফলে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হয়। এইরূপে বিনোবাজী প্রথম সত্যাগ্রহীস্বরূপে ভারতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম সুরু করেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর মহাত্মা গান্ধীর অবর্তমানে আবার তিনিই ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সৃজন করিয়াছেন এবং সেই আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান সত্যাগ্রহীস্বরূপে ভারতের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দ্বারে দ্বারে পদব্রজে ঘুরিতে ঘুরিতে নিদারুণ তপশ্চর্যায় মগ্ন আছেন।

## সর্বোদয়দর্শন ও সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা

অহিংসার পথে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনাও মহাত্মা গান্ধী সেই সময়েই করিয়াছিলেন। এবং উহার প্রস্তুতির জন্য তিনি ১৮ দফা সংগঠন কার্যের ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে উহার সহিত অবিভাজ্য ও অভিন্নভাবে উক্ত সংগঠন কর্মপ্রচেষ্টা দেশের বিভিন্ন স্থানে অল্পাধিকভাবে চলিতেছিল। উক্ত গঠনকর্ম তালিকা এইরূপ ঃ—(১) হিন্দু-মুসলমান বা সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা, (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন, (৩) মাদকতা বর্জন, (৪) খাদি, (৫) অন্যান্য গ্রাম্যশিল্প, (৬) গ্রামের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, (৭) নূতন বুনিয়াদী শিক্ষা, (৮) পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা, (৯) স্ত্রী-জাতির উন্নয়ন, (১০) স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কীয় শিক্ষা, (১১) রাষ্ট্রভাষা প্রচার, (১২) মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার অনুশীলন, (১৩) অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা-কল্পে প্রচেষ্টা, (১৪) কংগ্রেস সংগঠন (স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য জাতীয় রাজ-

নৈতিক সংস্থা সংগঠন), (১৫) কৃষক সংগঠন, (১৬) শ্রমিক সংগঠন, (১৭) ছাত্র সংগঠন ও (১৮) কুষ্ঠরোগী সেবা ও কুষ্ঠরোগ প্রতিকার। অবস্থা ভেদে ও প্রয়োজনানুসারে এই তালিকা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রাস্কিনের ইংরাজী গ্রন্থ "অন্ টু দিস্ লাস্ট"-এর যে অনুবাদ মহাত্মা গান্ধী করিয়াছিলেন তিনি উহার নাম দিয়াছিলেন "সর্বোদয়"। উক্ত অনুবাদের ভূমিকায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—"আধুনিক সংস্কৃতি এবং উহার উপর আধারিত যে সমাজব্যবস্থা তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোকের যথাসাধ্য অধিক পরিমাণ সুখ বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রধান সিদ্ধান্ত হইতে সহজেই এই উপসিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, যথাসম্ভব অধিক লোকের যথাসম্ভব অধিক সুখের ব্যবস্থা যদি করিতে হয় তবে কিছু লোক যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের দুঃখ-কষ্ট ঘটিলে কোন ক্ষতি নাই। দশজন লোকের মধ্যে নয়জন লোকের সুখের ব্যবস্থার সময় অবশিষ্ট এক ব্যক্তির জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু ইহাই নহে, বরং উহার অনিষ্ট করা বা নাশ করা বিধেয়। এরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থায় বিরোধ, ঝগড়া এবং অবশেষে ধ্বংস যে অপরিহার্য হয় ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কারণ এই সমাজব্যবস্থায় যে বলবান হয় সে এরূপ মনে করে যে, দুর্বলের নাশ হউক এবং তাহার নাশ-সাধনের জন্য সে চেষ্টাও করিতে থাকে। কিন্তু দুর্বল ইহা চাহে না যে, বলবানের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার নাশ হউক। দুর্বল হউক, তাহাতে কি? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে, যে চাহিবে তাহার মৃত্যু হউক অথবা সে না থাকুক। প্রত্যেকেই ইহা চাহে যে, সে থাকুক। কেন না এই 'থাকা' বা 'অস্তিত্বের' মধ্যে মানুষ একপ্রকারের আনন্দ বা সুখ অনুভব করে। অতএব সংঘর্ষ ও সর্বনাশের প্রতিকারকল্পে সমাজে সকলেই শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিবে—এমন সমাজ যদি রচনা করিতে হয় তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, "যথাসম্ভব অধিক লোকের অধিকতম সুখবিধান" এই নীতির পরিবর্তে "সকলেরই সর্বপ্রকারের কল্যাসাধনের" সিদ্ধান্তের আধার সমাজজীবনকে দেওয়া আবশ্যক। 'সকলেরই হিতসাধন' জীবনের তত্ত্বজ্ঞান হওয়া চাই।" এই তত্ত্বজ্ঞান অহিংস সমাজরচনার মূলে রহিয়াছে। তাই মহাত্মা

গান্ধীর পরিকল্পিত অহিংস সমাজব্যবস্থার নাম দেওয়া হইয়াছে "সর্বোদয়"। ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিগণ সমাজব্যবস্থার এই আদর্শই প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং উহাকে এক সুন্দর কথায় প্রকাশ করিয়াছেন—"সর্বে সুখিনঃ সন্তু" (সকলেই সুখী হউক)।

রাস্কিনের উপরোক্ত "অন্ টু দিস্ লাষ্ট" নামক গ্রন্থের ভিত্তি হইতেছে বাইবেলে বর্ণিত (St. Mathews Ch. 20) "Unto This Last" নামক নীতিমূলক গল্পটি (parable)। উহা এইরূপ :—এক ব্যক্তি কতিপয় শ্রমিককে তাঁহার আঙুর ক্ষেতে এক পেনি করিয়া মজুরী দিবার চুক্তিতে কাজ করিবার জন্য পাঠাইলেন। সে সময়ে সেখানে শ্রমিকের দৈনিক মজুরীর হার ছিল এক পেনি। ঐ ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের সময় শ্রমিকদের আড্ডায় গিয়া দেখেন যে, কিছু লোক সেখানে বেকার বসিয়া আছে। তিনি তাহাদিগকেও তাঁহার ক্ষেতে কাজ করিতে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে তাহারা পুরা মজুরী পাইবে। বৈকালে আবার যখন তিনি সেখানে গেলেন তখন আরও কয়েকজন বেকার শ্রমিককে তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকেও তিনি তাঁহার ক্ষেতে কাজ করিতে পাঠাইলেন। সন্ধ্যার সময় যখন আবার তিনি সেখানে গেলেন তখন আরও কয়েকজন বেকারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ বেকার শ্রমিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এখানে বেকার বসিয়া রহিয়াছ কেন?" শ্রমিকেরা উত্তর দিল—"আমাদিগকে কেহ কাজে লয় নাই।" তিনি বলিলেন—"তোমরাও আমার আঙুর ক্ষেতে কাজ করিতে চল। তোমরা পুরা মজুরী পাইবে।" যখন রাত্রি হইল তখন ক্ষেতের মালিক তাঁহার সহকারীকে বলিলেন, "সকল শ্রমিককে ডাকিয়া প্রত্যেককে পুরা মজুরী দাও এবং সব চাইতে শেষে যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকে প্রথমে দিয়া সুরু কর।" সব চাইতে শেষে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা যখন এক পেনি করিয়া পাইল তখন প্রথমে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা মনে করিল যে তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক মজুরী দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন তাহাদিগকেও এক পেনি করিয়া দেওয়া হইল তখন তাহাদের মধ্যে অভিযোগের সুরে কাণাকাণি আরম্ভ হইল। অবশেষে তাহারা মালিককে বলিল—"যাহারা সর্বশেষে আসিয়াছে তাহারা মাত্র এক ঘণ্টা করিয়া কাজ করিয়াছে

আর আমরা সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া পুড়িয়া কাজ করিয়াছি। অথচ আমাদিগকে তাহাদের সমান মজুরী দেওয়া হইল।"

ক্ষেতের মালিক উত্তর দিলেন—"আমি তোমাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করি নাই। তোমাদের সহিত এক পেনি করিয়া চুক্তি ছিল। তোমরা চুক্তিমত এক পেনি করিয়া পাইয়াছ। এখন তোমরা ঘরে যাইতে পার। তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি ঠিক তাহাই সকলের শেষে যে আসিয়াছে তাহাকেও আমি দিব।" ("Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, And go thy way. I will give unto this last even as unto thee")

ইহার মূলগত নীতি হইতেছে 'প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণীয় এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়' From each according to his capacity and to each according to his need) ইহাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের নীতি। তাই এই নীতির ভিত্তিতে রচিত রাস্কিনের অমূল্য "অন্ টু দিস্ লাস্ট" গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হৃদয়ে সর্বোদয়ের প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার জীবনযাত্রার প্রণালীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বিনোবাজীর প্রেরণায় সারা ভারতের গঠনমূলক কর্মীরা সেবাগ্রামে মিলিত হন এবং যাহাতে সর্বোদয়ের কাজ সফলভাবে অগ্রসর হয় সেই উদ্দেশ্যে "সর্বোদয়-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর এক এক প্রদেশে সর্বোদয়সমাজের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী শিবরামপল্লী গ্রামে তৃতীয় বার্ষিক "সর্বোদয় সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়।

**তেলেংগনার পরিস্থিতি ও বিনোবাজীর তেলেংগনা যাত্রা**

ঐ সময়ে হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত তেলেংগনায় ভূমি-সমস্যা লইয়া হিংস্র হাংগামা চলিতেছিল। কমিউনিষ্টদের হাতে বহু ভূম্যধিকারী নিহত

হইয়াছিল। ভূম্যধিকারীদের নিকট হইতে বহু জমি কাড়িয়া লইয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্যদিকে তাহাদিগকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আবার সেই জমি তাহাদের হস্তচ্যুত করা হইতেছিল। সরকার সশস্ত্র উপায়ে হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। উভয় পক্ষেই হানাহানি কাটাকাটি চলিতেছিল। সেখানে ভীতি, আতঙ্ক, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের পালা চলিতেছিল। উভয় পক্ষের দ্বারাই জনসাধারণ পীড়িত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইতেছিল। দিবসে সশস্ত্র পুলিশের জুলুম—কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্টদের সহায়তাকারী সন্দেহে পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা। রাত্রে জমিদার-জোতদারের সমর্থক বা পুলিশের সহায়ক সন্দেহে কমিউনিষ্টদের অত্যাচার। দুই দিকের অত্যাচারে লোকে পাগলপ্রায় হইয়া গিয়াছিল।

বিনোবাজীর শরীর অসুস্থ ছিল। সেজন্য শিবরামপল্লী সর্বোদয় সম্মেলনে যাওয়ার অভিপ্রায় তাঁহার তেমন ছিল না। তৎপূর্ব বৎসর উড়িষ্যার অঙ্গুল নামক স্থানে সর্বোদয় সম্মেলন হইয়াছিল। সেখানেও তাঁহার যাওয়া হয় নাই। শ্রীশঙ্কররাও দেওজী তাঁহাকে বলিলেন—"যদি আপনি শিবরামপল্লী সম্মেলনে না যান তবে সকলের সেখানে গিয়া সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।" শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বিনোবাজী শিবরামপল্লী যাইতে সম্মত হইলেন এবং পদব্রজে যাইবেন স্থির করিলেন। ১৫ই মার্চ রওনা হইয়া এক মাস হাঁটিয়া তিনি সেখানে পেঁীছিলেন। শিবরামপল্লীর সর্বোদয় সম্মেলনে সমবেত সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসী কর্মীদের মনে তেলেঙ্গনার ঘটনাবলী গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী কর্মীদের নিকট তেলেঙ্গনা এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ পরিগণিত হইল। শান্তি ও প্রেমের পথে দেশের ভূমি সমস্যা তথা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে মুখে অহিংসার কথা বলা নিষ্ফল।

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর হইতে বিনোবাজী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রয়োগের পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক শান্তি সৈনিকের ভূমিকায় তিনি তেলেঙ্গনায় ভ্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি সর্বোদয় সমাজের সেবক। সর্বোদয়ের নাম আমার কাছে ভগবানের সমান। সর্বোদয় বলিতে সবাইকে বুঝায়; অতএব কমিউ-

নিষ্টরাও আমার চিন্তার বহির্ভূত নহে।" তাই প্রথমেই তিনি হায়দ্রাবাদ জেলে আটক কমিউনিষ্ট বন্দীদের সহিত জেলে গিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং দুই-তিন ঘণ্টাকাল তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন—"কমিউনিষ্ট ভাইদের বিচারধারা কি তাহা জানিবার ও বুঝিবার জন্য আমি জেলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।" অতঃপর ১৬ই এপ্রিল তেলেংগনা ভ্রমণের জন্য তিনি আবার পদব্রজে রওনা হইলেন। তাঁহার তেলেংগনা ভ্রমণের সংকল্পের পশ্চাতে যে পটভূমিকা তাঁহার মনে ছিল এবং কেন তিনি পদব্রজে ভ্রমণের সংকল্প করেন সে সম্পর্কে তেলেংগনা ভ্রমণকালীন ১৯৫১ সালের ২৬শে মে তারিখে বারংগল (হায়দ্রাবাদ) নামক স্থানে তিনি তাঁহার প্রবচনে বলেন—"গান্ধীজীর তিরোভাবের পর আমি চিন্তা করিতেছিলাম—এখন আমার কি করা আবশ্যক। আমি উদ্বাস্তুদের সেবাকার্যে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু এখানের (তেলেংগনার) কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে আমি বরাবর চিন্তা করিতেছিলাম। এখানকার হত্যা ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে আমি সব সংবাদ পাইতেছিলাম। তাহা সত্ত্বেও আমার অন্তরে কোনরূপ নিরুৎসাহের ভাব আসে নাই। কেননা মানবজীবনের বিকাশের ধারা সম্পর্কে কিছু বোধ আমার আছে। তাই আমি বলিতেছি—যে যে সময়ে মানবজীবন নূতন সংস্কৃতি লাভ করে, সেই সেই সময়ে কিছু কিছু সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকে—রক্তের ধারাও বহিয়া যায়। এইজন্য নিরুৎসাহ না হইয়া শান্তমনে চিন্তা করিতে হইবে এবং শান্তিপূর্ণ পথের সন্ধান করিতে হইবে।

"এখানে শান্তি স্থাপনের জন্য সরকার পুলিশ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পুলিশ বিচারক নহে। পুলিশ শস্ত্রধারী এবং অস্ত্রবলই তাহার একমাত্র উপায়। তাই জংগলে ব্যাঘ্রের উপদ্রব প্রতিকারের জন্য পুলিশকে পাঠান উচিত এবং পুলিশ ব্যাঘ্র শিকার করিয়া আমাদিগকে ব্যাঘ্রের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু কমিউনিষ্টদের উপদ্রব ব্যাঘ্রের উপদ্রব নহে—উহা মানুষের উপদ্রব। উহাদের কার্যপন্থা যতই ভ্রান্ত হউক না—উহাদের জীবনে কিছু না কিছু বিচারধারা আছে। সেক্ষেত্রে মাত্র পুলিশ পাঠাইয়া প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে। সরকারের একথা অজানা নাই। তাহা সত্ত্বেও

নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিয়া সরকার পুলিশ পাঠাইয়াছেন। সেজন্য আমি সরকারকে দোষ দিতেছি না।

"আমি এইভাবে বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে ভাবিতেছিলাম। তাহাতে আমার মনে এই কল্পনার উদয় হইল যে, আমি এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিব। কিন্তু ভ্রমণ যদি করিতে হয় তবে কিভাবে ভ্রমণ করিব? মোটর প্রভৃতি যান বিচার-শোধক নহে, উহা সময়সাধক—দূরত্ব ঘুচাইতে পারে মাত্র। যেখানে চিন্তাধারার শোধন করিতে হইবে সেখানে শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। পুরাকালে তো উষ্ট্র, ঘোটক ইত্যাদি ছিল। লোকে উহার ব্যবহারও করিত এবং এক রাত্রির মধ্যে দুইশত মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিত। শঙ্করাচার্য, মহাবীর, বুদ্ধ, কবীর, নামদেব প্রভৃতি ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং পদব্রজেই তাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা চাহিতেন তবে অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেও পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা দ্রুতগামী যানের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কারণ বিচারধারা সংশোধন করা তাঁহাদের কাম্য ছিল এবং চিন্তাধারা শোধনের জন্য উত্তম উপায়—পদব্রজে ভ্রমণ করা। বর্তমান কালে পদব্রজে ভ্রমণ আদৌ পছন্দ হয় না; কিন্তু যদি শান্তিপূর্বক চিন্তা করা যায় তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে পদব্রজে ভ্রমণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।"

**ভূদানযজ্ঞের উদ্‌গম**

দুইদিন পরে ১৮ই এপ্রিল তারিখে বিনোবাজী নলগুণ্ডা জেলার অন্তর্গত পচমপল্লী গ্রামে উপনীত হইলেন। গ্রামের লোক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। গ্রামে বর্ণহিন্দুর বাস এবং হরিজনদেরও বাস। তিনি গ্রাম-পরিক্রমা করিলেন। হরিজন পল্লীতেও গেলেন। তাহারা নিতান্ত দরিদ্র। তাহাদের নিজেদের কিছুমাত্র জমি ছিল না। পুরা কাজ পাইত না—পেট ভরিয়া খাইতেও পাইত না। সেখানকার ভূমিব্যবস্থার কথা শুনিলে চক্ষে জল আসে। হরিজন যাহারা জোতদারের জমি চাষ করে তাহারা নগদ কিছু পায় না; দু-চারখানি করিয়া কম্বল পায় এবং উৎপন্ন শস্যের কুড়ি ভাগের এক ভাগ পায়। হরিজনেরা বোধ হয় মনে করিল—

মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য একজন সাধু-সন্ত লোক আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট অভাবের কথা জানাইলে কিছু ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহারা বিনোবাজীর নিকট জমি চাহিল। কত জমি তাহাদের আবশ্যক তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। তাহারা বলিল—৪০ একর নীচু জমি ও ৪০ একর উঁচু জমি মোট ৮০ একর জমি পাইলে তাহাদের চলিয়া যাইবে।

কিভাবে কোথা হইতে জমি পাওয়া যাইতে পারে তাহার ধারণা বিনোবাজীর কিছুমাত্র ছিল না। সরকারের নিকট হইতে কিছু জমি পাওয়া যায় কিনা তাহার কথ তিনি ভাবিলেন। সেইজন্য তাহাদের নিকট হইতে একটি দরখাস্ত চাহিয়া লইলেন। সভায় সমবেত গ্রামবাসীদের নিকট তিনি বলিলেন—গ্রামে এমন কি কেহ নাই যিনি দরিদ্র হরিজনদের জন্য কিছু জমি দিতে পারেন? সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডি নামক একব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পাঁচ ভাইয়ের পক্ষ হইতে তিনি দরিদ্র হরিজনদের জন্য ১০০ একর জমি—৫০ একর নীচু জমি এবং ৫০ একর উঁচু জমি দান করিলেন। বিনোবাজী জমি পাইলেন। তাহা দরিদ্র হরিজনদিগকে দিলেন। তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল।

কিন্তু বিনোবাজী ভাবিলেন—এ কি হইল! যেখানে মানুষ ৩ গণ্ডা জমির জন্য ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে, সেখানে চাহিতেই ১০০ একর জমি কিরূপে মিলিল! কত জমি চাই তাহাও তিনি বলেন নাই। তাঁহার আবশ্যক ছিল ৮০ একর জমির; কিন্তু পাওয়া গেল ১০০ একর। তবে কি ভগবান আজ শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডির মাধ্যমে ভারতের ভূমি সমস্যার সমাধানের পথের ইঙ্গিত দান করিলেন? তবে কি মহাত্মা গান্ধীর আত্মা শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভূমি সমস্যা সমাধানের শান্তিময় পথের সন্ধান তাঁহাকে দিলেন? এরূপে যাচ্ঞা করিয়া ভূমি সংগ্রহ করতঃ ভূমি সমস্যা সমাধানের কল্পনা তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি ইহার নাম দিলেন 'ভূদানযজ্ঞ'। তিনি ভূদানযজ্ঞের বাণী বহন করিয়া সেই হিংসাবিধ্বস্ত রক্তস্নাত তেলেঙ্গনার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে শঙ্কার উদয় হইল। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার এক প্রার্থনোত্তর ভাষণে বলিয়াছেন—"যেদিন আমি প্রথম দানপ্রাপ্ত হই, সেদিন

রাত্রে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম এইরূপে ভূমি চাহিয়া চাহিয়া কি আমি সমস্ত দরিদ্র ভূমিহীনের সমস্যার সমাধান করিতে পারিব? তখন আমি কোন সাহস পাইতেছিলাম না। কারণ ইতিহাসে এরূপ কাজের কোন নজীর ছিল না। কিন্তু তখনই ভিতর হইতে আমি শক্তি পাইলাম। ভিতর হইতে বাণী আসিল—'ভীত হইও না; ভূমি চাহিতে থাক।' তখন আমার এরূপ মনে হইল যে, যখন তিনি আমাকে ভূমি চাহিবার প্রেরণা দিতেছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই অন্যকে ভূমি দান দিবারও প্রেরণা দিবেন; কারণ তিনি কখন অসম্পূর্ণ কাজ করিতে পারেন না।" অতীব বিনয়ে—অত্যন্ত ভক্তি-সহকারে তিনি ভূমিদান চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইলেন। জুন মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত দুই মাস তিনি তেলেঙ্গনায় এরূপে দুয়ারে দুয়ারে ভ্রমণ করিলেন। এই দুই মাসের মধ্যে লোকে দরিদ্রনারায়ণের জন্য তাঁহাকে ১২ হাজার একর জমি দান করিল। বর্ষা আসিয়া পড়িল। তিনি চাতুর্মাস্য পালনের জন্য এবং 'কাঞ্চনমুক্তি' সাধনের কাজে অংশগ্রহণের জন্য তাঁহার পরমধাম আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

অনেকের চক্ষু খুলিল। ভারতের অর্থনৈতিক স্বরাজের ভিত্তি পত্তনের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়াছে। ভারতের ভূমি সমস্যার শান্তিময় সমাধানের পথ মিলিয়াছে। কিন্তু আবার অনেকের মনে এই সন্দেহ থাকিল যে তেলেঙ্গনায় জোতদার জমিদারগণ কমিউনিষ্টদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছে বলিয়া কিছু কিছু জমি দিয়াছে। সাধারণ অবস্থায় এভাবে জমি পাওয়া সম্ভব নয়। বিনোবাজী ভাবিলেন, জমি তো শুধু জমিদার-জোতদারেরা দান করেন নাই? বহু জমি তো সামান্য কৃষকের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছে। তবে এ সন্দেহ আসে কেন? উপরন্তু আশঙ্কাকারীদের কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রেমের পথে কাজ পাইতে হইলে প্রথমে হিংসার প্রয়োগ করিয়া লইতে হইবে। ইহা তো অহিংসার পন্থা নয়। তিনি মনে করিলেন, যেখানে তেলেঙ্গনার পটভূমিকা নাই অর্থাৎ যেখানে কোনরূপ হিংসাত্মক আন্দোলন হয় নাই এমন স্থানে ভূদানযজ্ঞের পরীক্ষা করা আবশ্যক।

**ভূদানযজ্ঞের ক্রমবিকাশ**

ভগবান সে সুযোগ তাঁহাকে দিলেন। অহিংস সমাজ রচনা সম্পর্কে তাঁহার বিচার জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিনোবাজীকে দিল্লীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিনোবাজী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু পদব্রজে যাওয়া স্থির করিলেন। তাঁহার জন্মতিথি দিবসের পরদিন ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) তিনি মধ্যপ্রদেশ দিয়া উত্তর ভারতের পথে দিল্লী রওনা হইলেন এবং ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচার করিতে করিতে ও ভূমিদান চাহিতে চাহিতে চলিলেন। দুই মাসে ৫৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি দিল্লী পৌঁছিলেন। এই দুই মাসে তিনি ১৮ হাজার একর জমি পাইলেন। যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে কোনরূপ হিংসাত্মক আন্দোলন কোনদিন হয় নাই। সে অঞ্চলে কোন অশান্তিও ছিল না। সে অঞ্চলে তখন কোন হিংসাবাদী দলও কর্মতৎপর ছিল না। তেলেঙ্গনায় দুই মাসে পাইয়াছিলেন ১২ হাজার একর; আর এই শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে দুই মাসে পাইলেন ১৮ হাজার একর। আশঙ্কাকারীদের সংশয় দূর হইল।

বিনোবাজীর দিল্লীর কাজ শেষ হইল। উত্তর প্রদেশের সর্বোদয়প্রেমী কর্মিগণ তাঁহাকে উত্তর প্রদেশের ব্যাপক ক্ষেত্রে ভূদান-যজ্ঞের পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিনোবাজী তাঁহার আশ্রমে আর প্রত্যাবর্তন না করিয়া উত্তর প্রদেশে সেরূপ পদব্রজেই রওনা হইলেন এবং সেখানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ছিল সাধারণ নির্বাচন; এবং সেখানকার অধিকাংশ কর্মী সাধারণ নির্বাচনে ৩ মাস কাল ব্যস্ত থাকেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে প্রভূত সাড়া ও সহযোগিতা পাইতে থাকেন এবং ছয় মাসে এক লক্ষ একর ভূমিদান প্রাপ্ত হন। পরবর্তী (১৯৫২ সালের) সর্বোদয় সম্মেলন তাঁহার উপস্থিত হওয়ার সুবিধার জন্য তাঁহার পরিক্রমা-পথে বেনারসের নিকটবর্তী সেবাপুরী আশ্রমে ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত ছয় মাসে তিনি এক লক্ষ একর ভূমি পাইয়াছিলেন। সেবাপুরী সম্মেলনে এই সংকল্প গ্রহণ করা হয় যে, ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন সারা ভারতে প্রবর্তন করা হইবে এবং প্রথম

কিস্তিস্বরূপ দুই বৎসরে সারা ভারতে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করা হইবে। ভারতের গ্রাম সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া ভূমি-হীন কৃষক পরিবারকে পাঁচ একর করিয়া জমি দিয়া উহাকে 'সর্বোদয় পরিবার' নামে আখ্যাত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ২৫ লক্ষ একর ভূমির আবশ্যক হয়। এই হিসাবের ভিত্তিতে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহের সংকল্প করা হয়। বিনোবাজীর অনুমোদনক্রমে সর্বসেবা-সংঘ প্রতি প্রদেশে প্রাদেশিক ভূদানযজ্ঞ সমিতি গঠন করিয়া দিলেন। সারা ভারতে ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন প্রবর্তন করা হইল।

বিনোবাজী তেলেংগনা ভ্রমণের সময় দৈনিক গড়ে দুইশত একর, দিল্লী যাইবার পথে তিনশত একর, উত্তর প্রদেশে সেবাপুরী সম্মেলন পর্যন্ত ছয় মাসে দৈনিক গড়ে পাঁচশত একর এবং সেবাপুরী সম্মেলনের পর দৈনিক গড়ে এক হাজার একর করিয়া ভূমিদান পাইয়াছিলেন। সর্ব শ্রেণী ও সর্ব স্তরের লোকে তাঁহাকে ভূমিদান দিয়াছেন। হিন্দুরা দিয়াছেন, মুসলমানেরা দিয়াছেন এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরাও দিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরাও অতীব শ্রদ্ধাভক্তির সহিত দিয়াছেন। জমিদার ও বড় বড় জোতদার দিয়াছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকও দিয়াছেন। এমন এমন দরিদ্র কৃষক শ্রদ্ধার সহিত ভূদান-যজ্ঞে তাঁহাদের ক্ষুদ্র আহুতি দান করিয়াছেন, যাহা বিনোবাজীর কাছে মধুর স্মৃতি হইয়া রহিয়াছে। উহার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"এই যজ্ঞে কতিপয় 'শবরী' আপন আপন 'কুল' দান করিয়াছেন এবং কতিপয় সুদামা নিজেদের 'তন্ডুল' দান করিয়াছেন। ইহা আমার নিকট চিরস্মরণীয় ভক্ত-গাঁথা হইয়া রহিয়াছে।" কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক-মজদুর-প্রজা দল (বর্তমানে সম্মিলিত হইয়া প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টি) ও ভারতীয় জন-সংঘ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলসমূহ ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন সমর্থন করেন।

বর্ষায় তিনি বেনারসের কাশী বিদ্যাপীঠে অবস্থান করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫২) পুনরায় তিনি পরিক্রমা আরম্ভ করেন ও দুইদিন উত্তর প্রদেশে ভ্রমণ করতঃ উক্ত প্রদেশের পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতে বিহারে প্রবেশ করেন। তখন পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে তিন লক্ষাধিক একর ভূমি সংগৃহীত হইয়াছিল। বিহারেও আশানুরূপভাবে ভূমি পাওয়া

যাইতে লাগিল। দুই বৎসরের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে) সারা ভারতে যে ২৫ লক্ষ একর ভূমিদান প্রাপ্তির সংকল্প করা হয়, তাহার মধ্যে বিহারের ভাগে ৪ লক্ষ একর। কথা ছিল—বিনোবাজী বিহারে প্রায় ৬ মাস পরিভ্রমণ করিয়া ১৯৫৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করিবেন এবং এই প্রদেশে ৭০ দিন ভ্রমণ করিয়া বাঁকুড়া জেলার প্রান্তে বাংলার ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ১৬ই মে (১৯৫৩) বিহারের মানভূম জেলায় প্রবেশ করিয়া বিহারে আরও একমাস কাল ভ্রমণ করতঃ বিহারের পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিবেন এবং অতঃপর উড়িষ্যায় ভ্রমণ আরম্ভ করিবেন। কিন্তু বিহারে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি তাঁহার ভ্রমণ পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, বিহারের ভূমি সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিহার ত্যাগ করিবেন না। অর্থাৎ বিহারের কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ ৩২ লক্ষ একর ভূমিদান না পাওয়া পর্যন্ত তিনি বিহার হইতে অন্যত্র যাইবেন না। বিনোবাজীর এই সংকল্পের পিছনে কি যুক্তি আছে তাহা বুঝা আবশ্যক। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"ভূমি সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে উহা (চিন্তাধারার বিপ্লব) আসিবে। এইজন্য আমি সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিতেছি এবং আরও কিছু লোকও ভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু আমি অনুভব করিয়াছি যে, এক প্রদেশে ব্যাপকভাবে উহার প্রয়োগ করিয়া কিরূপে সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এইজন্য বিহার হইতে আমি ৩২ লক্ষ একর জমি চাহিয়াছি।" উপরন্তু উক্ত যুক্তি অনুসরণ করিয়া প্রদেশের মধ্যে কোন একটি জেলাতে কেন্দ্রীভূত ও আত্যন্তিকভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। ভগবান বুদ্ধের বিচরণভূমি বলিয়া গয়া জেলাকে ঐরূপ আত্যন্তিক ও কেন্দ্রীভূত কাজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। উপরন্তু বিহারে যত প্রকারের ভূমি আছে সেই সমস্ত প্রকারের ভূমি গয়া জেলায় আছে। সমতল ভূমি, উঁচু-নীচু ঢেউ খেলান ভূমি, বনাকীর্ণ, পার্বত্য, বালুপ্রধান ও কংকরময় ভূমি সবই গয়া জেলায় আছে। খুব মূল্যবান ভূমি আছে আবার নিতান্ত কম মূল্যেরও ভূমি সেখানে আছে। তাই ভূমির দিক্ হইতে গয়া

জেলা বিহারের প্রতিনিধিস্থানীয়। গয়া জেলাকে কেন্দ্রীকৃত কাজের জন্য নির্বাচন করিবারও ইহা প্রধান কারণ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত কর্মিগণ সেখানে সমবেত হইয়া কাজ করিতে থাকেন।

গত ডিসেম্বর (১৯৫২) মাসের মধ্যভাগে বিনোবাজী অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন তিনি মানভূম জেলায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। অসুখের কারণে মানভূম জেলার চাণ্ডিল গ্রামে তাঁহার প্রায় তিন মাস কাল বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হয়। তাই এই বৎসরের সর্বোদয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান চাণ্ডিলেই করিতে হয়। চাণ্ডিল সম্মেলনে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় যে, সেবাপুরী সম্মেলনের সঙ্কল্পানুসারে দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সারা ভারতে ২৫ লক্ষ একর ভূমিদান সংগ্রহ করা তো হইবেই; উপরন্তু ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে উহার মোট কর্ষণ-যোগ্য ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ ৫ কোটী একর ভূমি ভূদানযজ্ঞে দানস্বরূপ সংগ্রহ করা হইবে। সেই উদ্দেশ্যে আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য—অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য অনন্যকর্মা হইয়া একাগ্রভাবে ভূদানযজ্ঞের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য কর্মীদের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ৫ কোটী একর পরিমাণ ভূমিদান সংগ্রহ করিয়া ভারতের ভূমি সমস্যা সমাধান সার্থক করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প বিশেষ অর্থপূর্ণ। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে ভারত পরাধীনতার নাগপাশে বন্ধ হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ১৯৫৭ সালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের স্বরাজের পূর্ণতা প্রাপ্তি। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"আমি মনে করি অর্থ-নৈতিক ক্রান্তি অনিবার্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল, ১৮৫৭ সালে বিপ্লব এবং এক্ষণে ১৯৫৭ সালে আর্থিক ও সামাজিক ক্রান্তি না হইয়া যায় না।"

এ যাবৎ (১৫ই জুন, ১৯৫৪) সারা ভারতে ২,৯৯,৫২৪ জন দাতার নিকট হইতে ৩৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪৫০ একর ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে। বিহারে যে ৩২ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিবার কথা তাহার মধ্যে ২০ লক্ষ ৬২ হাজার একর। রাজস্থান—যেখানে বিনোবাজী এখনও যান নাই,

সেখানে এই দুই বৎসরে দুই লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিবার কথা ছিল, কিন্তু দুই বৎসরে সেখানে ৩ লক্ষ ২০ হাজার একর ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে। উড়িষ্যায়ও ১ লক্ষ একরের মধ্যে ৯২,৩০৫ একর ভূমি এ যাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু সমগ্র গ্রাম ভূদান-যজ্ঞে দানে পাওয়া গিয়াছে অর্থাৎ গ্রামে যাঁহাদের ভূমি ছিল তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের সমস্ত ভূমি ভূদান-যজ্ঞে দান করিয়াছে। উত্তর প্রদেশের মঙ্গরোট নামক গ্রাম, বিহারের কতিপয় গ্রাম এবং উড়িষ্যায় ২৫খানি গ্রাম এইভাবে দানে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কটক জেলার মানপুর গ্রাম অন্যতম। মঙ্গরোট গ্রামটিকে সর্বোদয় আদর্শে গঠন করিয়া তুলিবার জন্য সুসংগঠিতভাবে কার্য করা হইতেছে এবং ঐ কার্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। মানপুর গ্রামটিকেও সর্বোদয় আদর্শে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। গ্রামের লোকসংখ্যা ৬২০, পরিবারের সংখ্যা ১১৪। ৩০টি পরিবারের কোন জমি নাই। ৫০ একর জমি সমবায় কৃষির জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। উহার আয় হইতে গ্রামের দেয় রাজস্ব দেওয়া হইবে এবং একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। গ্রামের কয়েকটি পরিবার তাহাদের সমস্ত জমি সমবায় পদ্ধতিতে চাষের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। গত দুই বৎসর যাবৎ গ্রামের সকল বিরোধ গ্রাম-পঞ্চায়েতের দ্বারা মীমাংসা করা হইয়াছে।

সেবাপুরী সর্বোদয় সম্মেলনে দুই বৎসরের মধ্যে ভূদানযজ্ঞে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল। দুই বৎসর পরে গত এপ্রিল মাসে (১৮—২০শে এপ্রিল, ১৯৫৪) বুদ্ধগয়ায় সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় পর্যন্ত সারা ভারতে ২,৩৭,০২২ জন দাতার নিকট হইতে ২৮,২৫,১০১ একর ভূমি সংগৃহীত হয়। এমতে সেবাপুরী সম্মেলনের সঙ্কল্প পূর্ণ হয়, যদিও প্রত্যেক প্রদেশের জন্য যে কোটা নির্দিষ্ট ছিল তাহা কতিপয় প্রদেশে পূর্ণ হয় নাই। তথাপি দুই বৎসরের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দাতার নিকট হইতে এত ভূমি পাওয়া এক অভাবনীয় ব্যাপার। এরূপে ভূদানযজ্ঞের প্রথম পর্যায় সফলভাবে অতীত হইয়াছে। এখন পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ৫ কোটি একর ভূমি প্রাপ্ত হইবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশ এই দৃষ্টি

লইয়া ইতিপূর্বেই কর্মতৎপর হইয়াছিল। বুদ্ধগয়া সম্মেলনের পর হইতে সারা দেশে এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া অধিকতর তৎপরতার সহিত কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু যে জমি ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়াছে তাহা সুব্যবস্থিতভাবে এবং তাড়াতাড়ি বিতরণ করিয়া দিয়া গ্রামরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিবার কাজও তৎপরতার সহিত করা হইতেছে। এ যাবৎ (১৫ই জুন, ১৯৫৪) বিতরিত ভূমির পরিমাণ—৬১,১৬৭ একর। ১৭১৯৬টি পরিবারকে ঐ জমি দেওয়া হইয়াছে।

## ইহা যে বাপুরই সেই দৃশ্য

বিদেশী শাসনের অবসান হওয়ায় আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহা মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা। উহা সম্পূর্ণ স্বরাজ নহে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি সুযোগ মাত্র। ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তবে দেশ সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ১৮ দফা রচনাত্মক কার্যক্রমের মধ্যে এই স্বরাজের চিত্র আঁকিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা উক্ত ১৮ দফা গঠনমূলক কার্যের অন্যতম। কিন্তু অবস্থার পরিণতি এইরূপ হইয়াছে যে, ভূমি সমস্যার সমাধান তথা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা আজিকার যুগধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধীর সেই অসমাপ্ত কার্য ভগবান বিনোবাজীর হস্তে সঁপিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে বিভূতির প্রকাশ আমরা দেখিয়াছিলাম, বিনোবাজীর মধ্যে অনুরূপ বিভূতির বিকাশ দেখা যাইতেছে এবং মনে হইতেছে যে, গান্ধীজীর আত্মা বিনোবাজীর মাধ্যমে কাজ করিতেছে। সম্প্রতি কৃপালনীজী বিহারে বিনোবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তিনিও ঐরূপ অনুভব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বাপুর সঙ্গে চম্পারণে থাকিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, এখানে বিনোবাজীর কাছে আসিয়া সেই দৃশ্যই দেখিতেছি। বাপু যে ভাবে কাজ করিতেন, বিনোবাজীও সেইভাবে কাজ করিতেছেন। আমার কাজ তো ঐরূপ নহে; কারণ আমার প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। কিন্তু যে মনোভাব লইয়া যে পদ্ধতিতে ও যে ঢাঁচে বাপু কাজ

করিতেন বিনোবাজীও সেইরূপ করিতেছেন। গান্ধীজী যে ভাবে গ্রামবাসী ভাইদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন বিনোবাজীও সেইভাবে তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। এইরূপ মনে হইতেছে ও আশাও হইতেছে যে, বাপুর সেই আত্মা পুনরায় আমাদের মধ্যে আসিয়া কাজ করিতেছে। এতদিন পর্যন্ত এই মনে হইতেছিল যে, তিনি যাহা কিছু শিখাইয়াছিলেন, তিনি চলিয়া যাওয়ার পর লোকে সে সবই ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এইসব কাজ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, মহাত্মার আত্মা বিনোবার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছে এবং গান্ধীজীরই কাজ চালু রহিয়াছে—উহা বন্ধ হয় নাই। শুধু বিদেশী শাসনের অবসান ঘটান তাঁহার কাজ ছিল না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ তাঁহারা বিদেশী শাসনের অবসানকে ক্রান্তি বলিয়া ভাবিতেন। কিন্তু তাঁহার কাছে উহা ক্রান্তির এক পদক্ষেপ মাত্র ছিল। তিনি স্বাধীনতার সাহায্যে দারিদ্র্য সমস্যা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন।"

**ভূমির গ্রামীনকরণ**

দরিদ্র ভূমিহীনকে ভূমি দান করা ভূদান যজ্ঞের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। উহার চরম লক্ষ্য—সারা গ্রামকে এক পরিবার স্বরূপে পরিণত করা। বিনোবাজী এই সম্পর্কে বলেন—"আমি ছোট পরিবার চাই না। আমি বড় পরিবার সৃষ্টি করিতে যাইতেছি। আমি সারা গ্রমকে এক পরিবাররূপে গড়িয়া তুলিতে চাই।" গ্রামের উপার্জনকারী সকলে এক হইয়া যাইবে; এক পরিবারভুক্ত লোকদের মত উহাদের সমস্ত উপার্জন নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবে এবং গ্রামের সমস্ত জমি একই পরিবারের বলিয়া গণ্য করিবে। সকলেই পরিশ্রম করিবে এবং উৎপন্ন ফসল সকলেই মিলিয়া মিশিয়া ভাগ করিয়া লইবে। সারা গ্রামের বালক-বালিকাদের শিক্ষা একসাথে হইবে। পরস্পরের প্রতি সকলের প্রেমভাব থাকিবে। সকলেই সুখী হইবে। গ্রামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদ থাকিবে না এবং সকলেই মিলিয়া মিশিয়া গ্রামের প্রতি তাহাদের কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করিবে। সমস্যার সমাধান ইহাতেই হইবে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন—"এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

আমার আন্দোলন অগ্রসর হইতেছে এবং সফলতাপ্রাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলিতে থাকিবে।" এ যাবৎ বহুসংখ্যক সমগ্র গ্রাম যে পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিরাট সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে।

১৯৫৩ সালের মধ্যভাগে রাঁচিতে বিহার প্রদেশের ভূদান কর্ম্মীদের শিবিরে প্রদত্ত তাঁহার প্রবচনে বিনোবাজী ভূমি ব্যবস্থার অন্তিম চিত্র কিরূপ হইবে তাহা বলিয়াছেন। "আমাদের অন্তিম অবস্থা এইরূপ হইবে। ভারতবর্ষে যত জমি আছে সবই একত্রিত করিয়া আবাদ করা হইবে এরূপ নহে। ব্যক্তির হাতে জমি থাকিবে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত জমির মালিক হইবে। প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি আবাদ করিবার জন্য দেওয়া হইবে এবং উদ্বৃত্ত জমি সামূহিক থাকিবে। খাজনা সামূহিক জমির ফসল হইতে দেওয়া হইবে। শিক্ষা, চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রভৃতির ব্যয় সামূহিক জমি হইতে মিটান হইবে। এইরূপে গ্রামের সার্বজনিক কার্যাদি সবই সামূহিক জমি হইতে হইবে এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু জমি দেওয়া হইবে। প্রতি আট-দশ বৎসর অন্তর অন্তর নূতন করিয়া জমির পুনর্বণ্টন হইবে। যদি কাহারও সংসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় তবে তাহাকে বেশী জমি দেওয়া হইবে এবং যদি কাহারও ঘরে সংখ্যা কম হয় তবে তাহাকে কম জমি দেওয়া হইবে। ঐ সময়ের জন্য ঐ ব্যক্তি মালিক থাকিবে অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে তাহার নিকট হইতে কোন জমি ছাড়াইয়া লওয়া যাইবে না। প্রত্যেকে যে কাজ করিবে তাহা এই মনে করিয়া করিবে যে উহার দায়িত্ব তাহারই ও ঐ জমি তাহারই। ঐরূপভাবে সামূহিক জমিও তাহাদের—এরূপ মনে করিয়া লোকে ঐ জমিতে কাজ করিবে। সমগ্র জমি আমাদের। আমাদের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইলে আমরা ঐ জমি হইতে আরও জমি পাইব; আবার আবশ্যক হইলে আমাদের কাছ হইতে জমি লওয়াও যাইবে—এরূপ মনোভাব থাকিবে। যদিও পিতাপুত্রের মধ্যে সম্বন্ধ অটুট তবু কোন বাপ এইরূপ বলে না যে আমি আমার পুত্রের মালিক। বাপ বলে যে, মালিক তো ভগবান এবং আমরা দুইজনই তাঁহার সেবক। অর্থাৎ তাহার সন্তানের প্রতি মমত্ব আছে বটে কিন্তু সে তাহার মালিক নহে। ঐরূপ জমির প্রতি

মমত্ব থাকিবে বটে কিন্তু তাহার উপর মালিকত্ব থাকিবে না। জমি বিক্রি করা যাইবে না। কেহ কি নিজের ছেলেকে বিক্রি করে? ছেলেকে কাহারও সাহায্যার্থে দেওয়া যাইতে পারে। জমির মূল্য পয়সায় হয় না। উহা অমূল্য বস্তু।"

### প্রেম ও আত্মত্যাগবৃত্তির বিকাশ

আপাতদৃষ্টিতে জগৎ স্বার্থপর বলিয়া মনে হয়। যেদিকে তাকান যায়—স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ও হিংসার লীলা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে স্বার্থের সংঘর্ষ ও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসার বিকট প্রকাশ। এই অবস্থায় এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্যার তুলনায় নিতান্ত কম হইলেও এত বিরাট পরিমাণ ভূমি ভূদানযজ্ঞে প্রাপ্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল?

মানুষের মধ্যে যেমন লোভ, হিংসা ও ঈর্ষা দেখা যায় তেমনি সাথে সাথে তাহার মধ্যে আত্মত্যাগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যায়। নিজের জীবনে ধীরে ধীরে হিংসা, ঈর্ষা ও লোভের ক্ষয়সাধন করিয়া অহিংসা ও প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রযত্ন মানুষ করিয়া আসিয়াছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এইখানেই। পশু প্রারম্ভে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। কিন্তু হিংসার শক্তির ক্ষয় ও প্রেমের শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া মানুষ নিজের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। এইখানেই মানব সভ্যতার প্রকৃত বিকাশ সাধিত হইয়াছে। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মানুষের যে নমুনা এখনও দৃষ্টিগোচর হয়— আন্দামানের গহন বনে জরওয়াজ নামক জাতির মানুষের যে হিংস্র মূর্তি দেখা যায় তাহা হইতে উপরোক্ত উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোন কোন মানুষ প্রেম ও আত্মত্যাগ বৃত্তিতে এতদূর পর্যন্ত উন্নীত হইয়াছেন, যাঁহা-দিগকে 'নরনারায়ণ' 'ঈশ্বরের অবতার' পর্যন্ত আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশেষ ক্ষেত্র।

সাধারণ ক্ষেত্রে প্রেম ও অহিংসা প্রতিষ্ঠায় মানব-সভ্যতার বিকাশ এখন পর্যন্ত পরিবারের স্তরে সীমাবদ্ধ আছে। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে

ত্যাগ ও প্রেমের বিকাশ সদাই দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহা নিজের পরিবার-পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লোকে নিজের পরিবার-স্বজনের জন্য কতই না ত্যাগ করে—কতই না দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত। ঘরে ঘরে প্রেম ও ত্যাগের অনুপম মনোবৃত্তি ছড়াইয়া রহিয়াছে। মাতা-পিতা পুত্র-কন্যার জন্য, সন্তান মাতাপিতার জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য ও স্বামী স্ত্রীর জন্য যে আত্মত্যাগ ও যে দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া থাকে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যদি মানুষ সারা গ্রামকে নিজের পরিবার বলিয়া গণ্য করিতে পারে—যদি মানুষ দরিদ্রকে নিজের পরিবারের একজন ও দরিদ্র ভূমিহীনকে নিজের পরিবারের অন্যতম অংশীদার বলিয়া গণ্য করিতে পারে তবেই ভূদান-যজ্ঞ অবিলম্বে পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যত সংস্থা সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তন্মধ্যে পরিবার-সংস্থা মহত্তম। এখানে মানুষ অন্যের জন্য ত্যাগ ও দুঃখকষ্ট বরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অন্যের মধ্যে নিজেকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অন্যকে নিজের বিকাশ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু মানব সভ্যতার প্রগতি ঐখানে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। কারণ মানুষ পরিবারের মধ্যে আত্মত্যাগ ও আত্মবিকাশের যে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাকে পরিবারের মধ্যেই—নিজ পুত্র-পরিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে—তাহাকে গ্রাম বা সমাজের মধ্যে সম্প্রসারিত করে নাই। তাই ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য মানবসভ্যতাকে —প্রথমতঃ ভারতীয় সভ্যতাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। ভূদান যজ্ঞের উদ্দেশ্য—পরিবারের পরিধির ধারণাকে সম্প্রসারিত করা, প্রেম ও ত্যাগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা; গ্রামকে—সারা সমাজকে নিজের পরিবার বলিয়া গণ্য করা ও দরিদ্রকে—দরিদ্রভূমিহীনকে নিজের ষষ্ঠ পুত্র বলিয়া গণ্য করা। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আমি কেবল এইমাত্র চাহিতেছি যে, আজ আপনারা আপনাদের সন্তানের প্রতি যে স্নেহ পোষণ করেন সেইরূপ স্নেহমমতা আপনারা যেন অন্যের সন্তান-সন্ততির প্রতিও পোষণ করেন।" মানুষের আত্মার শক্তি, মানুষের প্রেম ও আত্মত্যাগের শক্তি অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানে নিজের পরিবার-পরিজনের সীমার বাহিরে তাহা সুপ্ত। এই সুপ্ত শক্তিকে কিরূপে জাগ্রত করা সম্ভব?

এই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে প্রথমে জনমানসে চিন্তা-বিপ্লব বা বিচার-বিপ্লব আবশ্যক। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধের ভিত্তির উপর বর্তমান সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এই জমিটুকু আমি খরিদ করিয়াছি. অতএব ইহা আমারই। এই সম্পত্তি...এই ধনদৌলত আমি অর্জন করিয়াছি, এই জিনিস আমি সংগ্রহ করিয়াছি; অতএব ইহা আমারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই ভূমি. এই সম্পত্তি, এই ধন-দৌলতের উপর অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। যদি কেহ তাহা করে তবে রাষ্ট্রের ও সমাজের সমগ্র শক্তি উহার প্রতিকারের জন্য তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। তাই সমাজে চিন্তা-বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি বোধের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। ভূমিতে কাহারও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না। সবই ভূমির মালিক ভগবান ('সবৈ ভূমি গোপালকী') অর্থাৎ ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। শুধু ভূমি কেন—সমস্ত সম্পত্তি, ধন-দৌলত, জগতের যাহা-কিছু সবই ভগবানের। সব কিছুর মালিকই ভগবান। তাই সবই ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিজের প্রয়োজনমত কিঞ্চিৎ ঈশ্বরের প্রসাদস্বরূপ ভোগ করিতে হইবে। ইহাকে 'অপরিগ্রহ' বলে। এই বোধ সমাজে জাগ্রত হইলে—এই অপরিগ্রহবৃত্তি সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে তবেই মানবসভ্যতার পূর্ণ বিকাশের পথ পরিস্কার হইবে। ভূমি সম্পর্কে এই বিচার-বিপ্লব বা চিন্তা-বিপ্লব ভূদানযজ্ঞের সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য। কিরূপে এই বিচার-বিপ্লব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে?

যেমন আত্মার শক্তি অপরিসীম তেমনি বিচার বা চিন্তার শক্তিও অপরিসীম। কোন চিতাধারা কোন এক মানুষের অন্তরে এমন লাগিয়া যায় যে উহা তাহার জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে। দেখা যায় কোন কোন শ্রেষ্ঠ মানুষের বিচারধারায় এমন শক্তি নিহিত থাকে যে, তাহা অন্য মানুষের জীবনে—শুধু তাহা নয় সমগ্র সমাজজীবনে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়। ইহার জন্য বিচারধারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ভূদানযজ্ঞের অন্তর্নিহিত বিচারধারা সত্যের ভিত্তির উপর আধারিত ও উহা ভারতীয় সমাজের বর্তমান অবস্থায় যাহা আশু প্রয়োজন তাহারই অনুকূল। এই

বিষয়টি আর একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া লওয়া যাউক। সাধারণভাবে ধর্মপ্রচার করা এবং ক্রান্তি (যাহাকে বিনোবাজী ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন বলেন) সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করা—দুই পৃথক ব্যাপার। মুনি-ঋষিগণ তো সর্বদা ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন ও তাহা প্রচারও করিয়া থাকেন। কিন্তু সময়ের প্রয়োজন কি, যুগের দাবী কি—তাহা চিনিয়া লইয়া তাহার সহিত ধর্ম-বিচার যুক্ত করিয়া দেওয়া ভিন্ন কথা। উহাই ক্রান্তির পথ। উহাই ধর্মচক্র-প্রবর্তনের পদ্ধতি। ঐ পন্থায় গান্ধীজী দেশকে অহিংসা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বিরোধীর সহিত সপ্রেম আচরণ করা ও অহিংসার পথে দ্বন্দ্ব করা পুরাতন কথা। কিন্তু তখন যুগের দাবী ছিল স্বরাজ। তাই তিনি যদি উহাকে স্বরাজের সহিত যুক্ত না করিতেন তবে তিনি আর কয়জন অনুগামী পাইতেন? ইংরাজ পরম শক্তিশালী ও অস্ত্রবলে বলীয়ান ছিল। আমরা নিরস্ত্র। তাই অহিংসপন্থায় ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু শুধু তাহাতেই হইত না। দেশের পরিস্থিতিও উহার অনুকূল ছিল। ঐভাবে আন্তরিক ধর্ম-বিচারের বল ও পরিস্থিতির বল—এই উভয়কে যুক্ত করিয়া তিনি দেশকে অহিংসা শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ ভূমিহীন দরিদ্রের আজ ভূমি চাই। কেবলমাত্র এই দেশে নহে—সারা দুনিয়ায়—বিশেষতঃ এসিয়া মহাদেশে। জমি না পাইলে কিছুতেই তাহারা শান্ত থাকিবে না—পরিস্থিতি এই। ইহার সঙ্গে আজ এক ধর্মবোধ জাগ্রত হইতেছে—ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। ক্ষুধার্ত ভূমিহীন প্রতিবেশীকে ভূমি দেওয়া চাই। সকলকেই উৎপাদক-শ্রম করিতে হইবে; তবে প্রকৃত শান্তিময় সাম্য আসিবে। উৎপাদক-শ্রমের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা চাই। যদি পাঁচশত—হাজার বৎসর পূর্বে এই ধর্ম-বিচার প্রচার করা হইত তবে কেহ তাহা শুনিত না। কিন্তু আজিকার পরিস্থিতি এই ধর্ম-বিচার শুনিবার ও অনুসরণ করিবার অনুকূল। এই ধর্ম-বিচারের শক্তি ও বর্তমান পরিস্থিতির শক্তি একসঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। বাহিরের পরিস্থিতির ফলে ধর্ম-বিচার সহজে হৃদয়ে ক্রিয়া করে ও হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আবার হৃদয় পরিবর্তিত হইলে উহার ফলস্বরূপ বাহিরের পরিস্থিতিও প্রভাবিত হয়। একে অন্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতে থাকে। যেমন ফল হইতে বীজ; আবার বীজ হইতে ফল।

কিন্তু এই বিচারধারা সমাজে ব্যাপকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আর একটি জিনিসের প্রয়োজন। এই বিচারধারা কে প্রবর্তন করিতেছেন? একমাত্র উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ জীবন অন্য জীবনকে শোধন ও উন্নীত করিতে পারে। যদি পৃথিবীতে একজন মাত্র খাঁটি সত্যাগ্রহী থাকেন, তবে তাঁহার প্রভাব সারা পৃথিবীর উপর পড়িয়া থাকে এবং সারা পৃথিবীর হৃদয় তাঁহার প্রভাবে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। তবে তাঁহার হৃদয়ে সারা দুনিয়ার প্রতি প্রেম থাকা চাই। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন মানুষের আবির্ভাব হয়—জগত-কল্যাণই যাঁহার একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য, যাঁহার জীবনে অন্যের সুখ-বিধানের জন্য আত্মত্যাগ ভিন্ন আর কিছু নাই, যাঁহার প্রেম সর্বব্যাপী হইয়াছে এবং যিনি 'আত্মৌপম্য'-বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ যিনি সর্বজীবের সুখ-দুঃখ নিজেরই সুখ-দুঃখ বলিয়া অনুভব করেনও যিনি সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন—সোজা কথায় যিনি প্রকৃত সত্যাগ্রহী। এরূপ মানুষকে আমরা মহাপুরুষ, মহাত্মা ইত্যাদি আখ্যা দিয়া আমাদের অন্তরের পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকি। এরূপ মানুষের আহ্বানে, তাঁহার দর্শনে, তাঁহার বাণী শ্রবণে আমাদের অন্তর্নিহিত ত্যাগবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়—আমাদের সুপ্ত আত্মশক্তি জাগ্রত হয়—আমাদের অন্তরস্থিত সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন হয় ও আমাদের অন্তরের নির্বাপিত আলো প্রজ্বলিত হয়। তিনি যে চিন্তাধারা মানুষকে গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন তাহা মানুষের জীবনে অচিরে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ত্যাগ বা দুঃখ-কষ্ট বরণের জন্য আহ্বান করিলে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষ তখন ত্যাগ ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজ-কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় এবং সমাজে ক্রান্তি (বিপ্লব)* আনয়ন করে। এমন

*হিন্দিতে 'বিপ্লব' শব্দের পরিবর্তে 'ক্রান্তি' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষায় 'বিপ্লব' অর্থে 'ক্রান্তি' শব্দের ব্যবহার এখনও করা হয় নাই। আমার মনে হয় বাংলা ভাষায়ও 'বিপ্লব' শব্দের পরিবর্তে 'ক্রান্তি' শব্দ প্রচলিত হওয়া উচিত। কারণ ঐ দুইটি শব্দের অর্থের তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে 'ক্রান্তি' শব্দই সঠিক ভাব-ব্যঞ্জক। 'বিপ্লব' শব্দ 'প্লু' ধাতু হইতে উদ্ভূত। উহার অর্থ 'প্লবন' বা 'প্লাবন'। উহার ভাব negative বা নঞর্থক

একজন মহামানব সম্প্রতি আমাদের মধ্যে ছিলেন তিনি হইতেছেন—মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার আহ্বানে সারা ভারত ত্যাগ-মন্ত্রে ও দুঃখ-কষ্ট বরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উথলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সর্ব শ্রেষ্ঠ অনুগামী আচার্য বিনোবাভাবের মধ্যে অনুরূপ বিভূতির বিকাশ

---

বোধক। 'বি' উপসর্গের যোগে উহার negative ভাব (নঞ্) আরও ভালভাবে ফুটিয়া উঠে ও ধ্বংসাত্মক ভাব সূচিত হইয়া থাকে। কারণ 'বি' উপসর্গ 'বিশেষ' 'বৈরূপ্য' ও 'নঞ্' বাচক। উপরন্তু উহাতে হিংসার অস্তিত্বের আভাসও আসে। এজন্য 'বিপ্লবের' আভিধানিক অন্যান্য অর্থ—'উপদ্রব', 'বিদ্রোহ', 'অস্ত্র-কলহ', 'অব্যবস্থা' ইত্যাদি। অন্য দিকে 'ক্রান্তি' শব্দ 'ক্রম্' ধাতু হইতে উদ্ভূত। উহার অর্থ হইতেছে 'গতি'। জ্যোতিষ শাস্ত্রে সূর্যের গতি পথকে 'ক্রান্তি' বলে। সূর্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে যাওয়ার নাম 'সংক্রমন' বা 'সংক্রান্তি'। খ-গোল মধ্যবর্তী সূর্য-গমনার্থ তির্যগ গোল রেখার নাম ক্রান্তি। এই রেখায় সূর্যের বার্ষিক গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই গতির ফলে এক ঋতুর পর অন্য ঋতুর উদয় হয়, পুরাতন বর্ষের পর নূতন বর্ষের আবির্ভাব হয়; বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে হইতে অয়নাংশ অতিক্রান্ত হইয়া থাকে এবং অতঃপর যুগ পরিবর্তন হয়। তাই ক্রান্তি শব্দের সাধারণ অর্থ—এক অবস্থা হইতে বিরাট পরিবর্তনের দ্বারা অন্য অবস্থা প্রাপ্তি। এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য অবস্থায় উপনীত হওয়ার ভাব ইহাতে আছে। বিনাশ সাধন করা ইহার ভাবার্থে নাই অর্থাৎ ইহা Positive (বিধায়ক)। সূর্যের ক্রান্তির দ্বারা প্রথমে ঋতু পরিবর্তন, পরে বর্ষ পরিবর্তন, বর্ষের পর বর্ষ যাইতে যাইতে অয়নাংশ পরিবর্তন ও সর্ব-শেষে যুগ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তেমনি ক্রান্তি প্রথমে মানুষের চিন্তায়, পরে বাক্যে ও পরে কার্যে উদয় হয়। ক্রান্তিকারক কার্য প্রথমে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ও পরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে বিকাশ হয় এবং অবশেষে উহা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য বাংলা ভাষায়ও বিপ্লবের স্থলে ক্রান্তি শব্দ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ। তাই এই পুস্তিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্থলে 'ক্রান্তি' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

হইয়াছে। তাই তাঁহার প্রবর্তিত বিচার এত অল্পদিনের মধ্যে সর্বশ্রেণী, সর্ব স্তরের লোকে গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে। দেশের বালক-বালিকারা পর্যন্ত ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে জানিয়া গিয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে দেশের অনেক স্থানে উহা ক্রান্তিকারক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বিরাট সমস্যার তুলনায় নিতান্ত অল্প হইলেও অল্প দিনের মধ্যে লোকে প্রেমভরে তাঁহার হস্তে ৩৩ লক্ষ একর ভূমি সঁপিয়া দিয়াছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে মনন ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই যে মহাত্মা ও মহাপুরুষের কথা উপরে বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কে? আত্মা অনন্ত গুণসম্পন্ন। আত্মা অনন্ত শক্তিতে ভরা। সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের সেই পরিস্থিতি-উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য আত্মার এমন এক গুণ বা শক্তির বিকাশ হওয়ার আবশ্যকতা আসে যাহার আবির্ভাব পূর্বে হয় নাই। তখন আত্মার সেই বিকাশ সাধিত হয় এবং মানুষের হৃদয়ে সেই শক্তি বা গুণের আবির্ভাব হয়। ইহার অন্ত নাই। যখনই প্রয়োজন আসিবে তখনই আত্মায় তদুপযোগী গুণের বিকাশ সাধিত হইবে এবং সমাজের কাজ চলিতে থাকিবে। এ পর্যন্ত আত্মার যত গুণ বা শক্তির বিকাশ হইয়াছে তাহাই শেষ, আর কোন নূতন গুণ বা শক্তির বিকাশ হইবে না—এরূপ মনে করা সংকীর্ণতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। আত্মার গুণ বা শক্তির ঐ আবির্ভাবকে বিনোবাজী অবতার আখ্যা দিয়াছেন। যে যুগপুরুষের মাধ্যমে ঐ গুণ বা শক্তির আবির্ভাব ও বিকাশ হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে অবতার নহেন; তিনি নিমিত্তমাত্র। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন —"অবতারের অর্থ এই যে—মানবের হৃদয়ে শক্তির আবির্ভাব হওয়া। যেখানে সত্যনিষ্ঠার আবির্ভাব হইল সেখানে উহা রামচন্দ্রের রূপ গ্রহণ করিল। যেখানে নিষ্কাম কর্মযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল সেখানে উহা শ্রীকৃষ্ণের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধের মধ্যে করুণা মূর্তিমতী হইল; তাই আমরা বুদ্ধকে অবতার বলিয়া মান্য করিলাম। ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়া আমরা মনুষ্যকে অবতার বলিয়া মান্য করিয়া থাকি। দেখিবার মত কিছু ইন্দ্রিয়ের জন্য আবশ্যক হয়। এইজন্য উহা রূপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ অবতার নহেন। সত্যনিষ্ঠা, নিষ্কাম কর্মযোগ এবং ভূত-

দয়ার অবতার সেই সেই ক্ষেত্রে হইয়াছিল। যেখানে এরূপ মানবতার শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল সেখানেই অবতার হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ তাহাতে মূর্তিপূজা আরোপ করিল। উহাতে উপাসনার সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু শরীর অবতার নহে; মানব হৃদয়ের আবির্ভূত ভাবাবলীই হইতেছে অবতার। যেমন যেমন আধ্যাত্মিক বিকাশ হইতে থাকিল তেমন তেমন উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অবতারের আবির্ভাব হইতে লাগিল। উহাই সমাজের বিকাশের প্রক্রিয়া। ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া তাহাদের শাসন কায়েম করিল। তাহারা এক চমকপ্রদ ব্যাপার দেখাইল। সমগ্র দেশকে নিরস্ত্র করিয়া দিল। তখন দেশের সম্মুখে এক সমস্যা দেখা দিল। হয় সারা দেশকে চিরদিন ইংরাজের গোলাম হইয়া থাকিতে হইবে, না হয় তাহাকে এমন শক্তি আবিষ্কার করিতে হইবে —যে শক্তিবলে বিনা অস্ত্রে সংকটের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হইবে ও দেশকে মুক্ত করিতে পারা যাইবে। পরিস্থিতি বশতঃ যখন এমন প্রয়োজন দেখা দিল তখন অহিংস প্রতিকার ও সত্যাগ্রহের আবিষ্কার হইল। মহাত্মা গান্ধী উহার নিমিত্তমাত্র হইলেন। আমি কয়েক বার একথা বলিয়াছি যে যদি মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব না হইত তবে তাঁহার স্থলে অন্য কাহারও আবির্ভাব হইত। কিন্তু ওই শক্তির আবিষ্কার হইতেই হইত। প্রয়োজন ছিল—ওই শক্তিরই আবির্ভাবের। কেন না পরিস্থিতি ও কালের চাহিদা ছিল তাহাই। লোকে দেখিল যে, অহিংসা এক বিরাট শক্তি যাহার সহায়ে এত বড় সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির সহিত বিরোধ করিতে পারা সম্ভব হইল এবং উহাকে ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। উহা হইতে এক চমৎকার ব্যাপার এই হইল যে, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। অত্যাচারী আর অত্যাচারী রহিল না। উভয়ে পরস্পরের বন্ধু হইল। এই প্রকারের শক্তির আবির্ভাব হইল এবং তাহার দ্বারা আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম। স্বাধীনতার জন্য অনেক দেশই অনেক প্রকার প্রযত্ন করিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের ইহা বিশেষ আবিষ্কার। কারণ ইহাতে মানব-হৃদয়ে নব শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এখন ভারতের আর্থিক স্বাধীনতা, দরিদ্রতা নিবারণ ও সাম্যযোগ প্রতিষ্ঠার কার্য উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে তদুপযোগী শক্তির আবিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন

হইয়াছে এবং সেই শক্তির আবির্ভাব হইতেছে।" সেই শক্তির নাম 'সর্বোদয়'। সর্বোদয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যে বুনিয়াদী শক্তির প্রয়োজন তাহা আজ সন্ত বিনোবাজীর মাধ্যমে বিকশিত হইতেছে। এখানে বিনোবাজী নিমিত্ত মাত্র।' তাই একথা বলা ঠিক হইবে না যে যাহা এ পর্যন্ত হয় নাই তাহা ভবিষ্যতে কিরূপে হইবে?

এই বিষয়টি আরও একভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যখনই ঐরূপে আত্মার শক্তির আবির্ভাব হইবার প্রয়োজন হয় তখন ভগবান তাহা এক মন্ত্ররূপে প্রদান করিয়া থাকেন। বিনোবাজী বলেন যে, মন্ত্রের অবতার প্রকৃত অবতার। যে বিশিষ্ট মনুষ্যের মাধ্যমে ঐ মন্ত্র ফলবতী হইয়া থাকে তাঁহাকে আমরা অবতার বলিয়া মানিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নিমিত্তমাত্র অবতার।

যখন ইহা বুঝা গেল যে দেশের সকল দুঃখের মূল পরাধীনতা এবং কেবলমাত্র ছোট ছোট দুঃখ দূর করিলে চলিবে না তখন দাদাভাই নৌরজী স্বরাজের মন্ত্র দেশের সম্মুখে রাখিলেন। তখন হইতে ঐ মন্ত্রের সাধনা হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এক বিরাট শক্তিশালী জাতি এই দেশ শাসন করিতেছিল। তাহাদের হাতে অস্ত্র ছিল। আর এই দেশকে তাহারা নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। তাই মহাত্মা গান্ধী সামুদায়িক অহিংসার ভিত্তিতে 'ভারত ছাড়' মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। উহা বিরাট গণ-আন্দোলনে পরিণত হইল। সরকার উহাকে দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। মনে হইয়াছিল যে, আন্দোলন দমিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইল না। মন্ত্রকে কখন দমন করা যায় না। উহার পশ্চাতে দর্শন থাকে ও শক্তি থাকে। উহা সূর্য-কিরণের ন্যায় সর্বত্র পৌঁছায় ও সকলের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এই মহান্ মন্ত্রোচ্চারণের পাঁচ বৎসর পরে ইংরাজকে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল। মন্ত্র ফলবতী হইল ও আমরা স্বরাজ লাভ করিলাম। এক মন্ত্রের পূর্তি হইল এবং ভগবান আমাদিগকে অন্য মন্ত্র প্রদান করিলেন। এইরূপে সমাজের কাজ চলিতে থাকে।

এরূপে মন্ত্রের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতঃ বিনোবাজী বলেন যে—"পরমেশ্বর এক পরমতত্ত্ব। ঐ তত্ত্ব হইতে মন্ত্র স্ফুরিত হইয়া থাকে। মন্ত্র হইতে মহাপুরুষগণ প্রেরণা পাইয়া থাকেন। মহাপুরুষদের বিচার সমাজকে চেতনা দান করিয়া থাকে। পরমেশ্বর প্রেরণার ক্ষেত্র ও মন্ত্রের মূল। মন্ত্ররূপে পরমতত্ত্ব প্রকটিত হইয়া থাকে। এক অবতারের কাজ পূর্ণ হইয়া গেলে দ্বিতীয় অবতার আসিয়া থাকে। তাহাতে সংসার সকল সময়ে সতেজ থাকে। ইহা ঈশ্বরের লীলা। রামচন্দ্রের সময়ে এক মন্ত্র আসিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে দ্বিতীয় মন্ত্র আসিল। বুদ্ধের সময়ে তৃতীয় মন্ত্র আসিল। এইভাবে মন্ত্রের পর মন্ত্র পাওয়া গেল ও পৃথিবীর উন্নতি হইতে থাকিল।

"এক মন্ত্র অন্য মন্ত্রকে জন্মদান দিয়া চলিয়া যায়। এইভাবে বীজ হইতে ফল হয় এবং ফল হইতে বীজ হয়। এক বীজ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আর একটি বীজ অঙ্কুরিত হয়। এইরূপে এক মন্ত্র পূর্ণ হয় তখন অন্য মন্ত্রের আবির্ভাব হয়। পৃথিবীতে কোন জিনিসের নাশ হয় না। ইহা বিজ্ঞানের শিক্ষা। স্বরাজ মন্ত্রের অবতারের পূর্তি হইয়া গেল। তখন মহাত্মা গান্ধী আর একটি মন্ত্র দেশকে প্রদান করিলেন। তিনি ঐ মন্ত্র পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার নাম "সর্বোদয়"। ঐ মন্ত্রের বীজ স্বরাজ আন্দোলনের মধ্যে বপন করা ছিল। স্বরাজ প্রাপ্তির পর উহা অঙ্কুরিত হইয়াছে।"

সর্বোদয়ের রূপ বিরাট ও ব্যাপক রূপ। উহার এক এক ভাগ লইয়া আমরা কাজ করিতে পারি। ভূমি সমস্যা সর্বোদয়ের বুনিয়াদ। আজ বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের মন্ত্র দেশকে দিয়াছেন।

### ভারতে আত্মজ্ঞানের বিকাশ

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় গভীরভাবে বুঝা আবশ্যক। ভূদানযজ্ঞ সত্যের উপর আধারিত এক মহান বিচার বা সিদ্ধান্ত এবং সেই বিচার দেশের বর্তমান জরুরী প্রয়োজনের অনুকূলে। উপরন্তু উহার প্রবর্তক ও প্রচারক আত্মত্যাগী ও বিশ্বপ্রেমিক এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ। কেবলমাত্র এই তিন কারণ যুগপথ বিদ্যমান থাকায় কি এত অল্প দিনের মধ্যে ভূদানযজ্ঞ এতদূর

অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে? অথবা এই তিন কারণ ছাড়া এমন আর কিছু আছে যাহার জন্য ইহা সম্ভব হইতে পারিয়াছে? হ্যাঁ, তাই। ভারতের চরিত্রে এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যে জন্য ভারতীয় জনগণ ভূদানযজ্ঞকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে। তাহা হইতেছে এই যে ভারতের হৃদয় অর্থাৎ ভারতীয় মানুষের হৃদয় নির্মল ও অবিকৃত আছে। মহাত্মা গান্ধী একথা বলিতেন, বিনোবাজীও এই কথা বলেন। এইজন্য ভূদান-যজ্ঞের বিচার জনসাধারণকে এত সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে বুঝান সম্ভব হইয়াছে এবং উহা এত সহজে গণ হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। হৃদয় পবিত্র ও অবিকৃত থাকার লক্ষণ কি? আমরা মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধির দ্বারা কোন বিষয় বুঝিয়া থাকি। কিন্তু কোন সৎ বিচার বুঝিলে বা উহার সম্বন্ধে জ্ঞান হইলেই মানুষ মাত্রেই তদনুসারে আচরণ করে না। কেবলমাত্র যাহার হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল সেই ব্যক্তিই উহার সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদনুরূপ আচরণ করিতে থাকে। এতদিন যে সে-ব্যক্তি তদ্রূপ আচরণ করে নাই তাহার একমাত্র কারণ এই যে, এতদিন ঐ সম্পর্কে তাহার জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞতা ছিল। কিন্তু যাহার হৃদয় নির্মল ও স্বচ্ছ নহে সেই ব্যক্তিকে উহা বুঝাইলে সে বুদ্ধি দিয়া উহা বুঝিবে কিন্তু সহজে সে তদনুরূপ আচরণ করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে তাহার যে জ্ঞান তাহা হইবে শাব্দিক জ্ঞানমাত্র। ঐ জ্ঞান তাহার হৃদয়ের উপর সহজে ক্রিয়া করে না। অন্যকে নিজের মত করিয়া দেখা ও তাহার প্রতি তদনুরূপ আচরণ করা 'আত্মৌপম্য' বৃত্তি। প্রতি-বেশীকে নিজের মত করিয়া দেখা ও তদনুরূপ আচরণ করা সর্বোদয়ের মূল কথা এবং উহাই ভূদানযজ্ঞের প্রেরক ভাবনা। ইহার সারমর্ম এই যে আমরা যেন নিজেকে একটিমাত্র দেহে সীমাবদ্ধ বলিয়া না ভাবি। আমাদের প্রতি-বেশী, শুধু তাহা নহে, সারা সমাজ আমাদের নিজেদের ব্যাপক রূপ। সাধারণ-ভাবে ভারতীয় মানুষের হৃদয় নির্মল ও শুদ্ধ। কিন্তু তাহার আত্মজ্ঞান সংকুচিত হইয়া রহিয়াছে, কারণ তাহাকে আত্মজ্ঞানের ব্যাপকতা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

আমাদের মুনি-ঋষিগণ ব্যক্তিগত ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু সামুদায়িক ধর্ম শিক্ষা দেন নাই; তাই ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল থাকা

সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে এতদিন সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে এই 'আত্মজ্ঞান'-ধর্ম আচরণ করা সম্ভব হয় নাই। বিনোবাজী বলেন—"আমি গ্রামে গ্রামে যাইয়া একই জিনিস বুঝাইতেছি। উহার সার এই—নিজেকে দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবিবেন না। ভারতে এরূপ বেদান্তের প্রচার কম হয় নাই। আত্মা সর্ব ব্যাপক—এই কথা তো এই দেশের সব লোকে মুখে বলে। কিন্তু শাব্দিক জ্ঞান এক কথা, আর সেই বিচারের প্রয়োগ জীবনে করা অন্য কথা। ভারতবর্ষে শাব্দিক জ্ঞান এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে যে কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে নহে পরন্তু প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা বিরাজমান ইহা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উহাদের আত্মা এতই সংকুচিত হয় যে, কেবলমাত্র নিজের শরীর ও উহার আশপাশ ভিন্ন সে চিন্তা করে না। ভারতের আত্মজ্ঞান এতই সংকুচিত হইয়াছে! মা নিজের সন্তানের জন্য ত্যাগ করেন; কারণ সন্তানের মধ্যে তিনি নিজের স্বরূপ দেখেন। তাঁহার আত্মজ্ঞান তাঁহার সন্তান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মা নিজের সন্তানকে স্নেহ করেন কিন্তু অন্যের সন্তানের প্রতি তাঁহার সে স্নেহ নাই; কারণ তাহার মধ্যে তিনি নিজের আত্মাকে অনুভব করেন না। মুখে বলিতে যাইলে তো আত্মজ্ঞানের কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু মা অনুভব করেন যে তাঁহার আত্মা কেবলমাত্র তাঁহার নিজের সন্তান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। সংস্কৃতে ছেলেকে সন্তান বা সন্ততি বলা হয়। সন্ততি অর্থাৎ বিস্তার। মা বুঝিয়া থাকেন যে সন্তান আমারই বিস্তার, আমারই রূপ। এই পর্যন্ত তাঁহার আত্মজ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন হইতে তাঁহার এই জ্ঞান হওয়া চাই যে নিজের রূপ এত ছোট নহে; উহা ব্যাপক।" আজ ভূদানযজ্ঞের মাধ্যমে ভারতবাসীকে তাহার আত্মজ্ঞানের বিস্তারসাধন করা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং তাই যেখানে আত্যন্তিকভাবে কাজ করা হইতেছে সেখানে লোকে অতি শীঘ্র ভূদানযজ্ঞকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছে। অবশ্য ইহার পশ্চাতে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষার মহান্ পটভূমিকা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভূদানযজ্ঞের বিচার মহাত্মা গান্ধীর প্রদত্ত শিক্ষার ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলা সৌধ।

ভারতের আত্মজ্ঞানের বিকাশসাধন সম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন যে—"কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, আমাদের হৃদয়ে এত বড়

খারাপ কিছু নাই। যদি তাহা থাকিত তবে ভূদানযজ্ঞের এত ব্যাপক প্রচার হইত না। এইজন্য আমি মনে করি যে, ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল আছে। কিন্তু আমাদের আত্মজ্ঞান সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। শিশুদের হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল থাকে কিন্তু উহাদের জ্ঞান থাকে না। তাই তাহারা অন্যকে কষ্ট দিতে পারে। কুকুরও অন্য কুকুরের নিকট হইতে খাবার কাড়িয়া লয়; কারণ উহার আত্মজ্ঞান অত্যন্ত সংকুচিত। উহার নিজের দেহের জ্ঞান আছে কিন্তু আত্মার জ্ঞান নাই। শিশুদের অবস্থাও এইরূপ। কেবলমাত্র খাওয়ার কথা শিশুরা জানে। কেননা উহাদের হৃদয় নির্মল বটে কিন্তু উহাদের আত্মার জ্ঞান নাই। যেখানে উহাদিগকে আত্মার জ্ঞান শিখাইয়া দেওয়া হয় সেখানে উহারা তাহা তাড়াতাড়ি বুঝিয়া লয়। আমি দেখিয়াছি যেখানে পিতামাতা শিশুদিগকে আত্মজ্ঞান এইভাবে শিক্ষা দেয় যে, নিজের জিনিস অন্যকে দিতে হয়, সেখানে তাহারা অন্যকে কিছু দিতে আনন্দ পায়। কিন্তু শিশু জন্মগ্রহণ করিলে সে দেহেই সীমাবদ্ধ থাকে। দেহ অপেক্ষা বড় কিছু সে ভাবিতে পারে না; কারণ তাহার আত্মার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু যখনই তাহাকে আত্মার জ্ঞান বুঝাইয়া দেওয়া হয় তখনই সে উহা বুঝিয়া লয়। উহার সংস্কারের আবশ্যকতা থাকে। সেইরূপ ভারতের হৃদয় শুদ্ধ, নির্মল কিন্তু তাহার সংস্কারের প্রয়োজন রহিয়াছে। ভারতবাসীকে ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে যে, 'ভাই, তুমি নিজেকে দেহেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছ। উহা ভুল। এই সমগ্র সমাজ আত্মার ব্যাপক রূপ; নিজেরই সন্ততি।' এই কথা বুঝাইয়া বলাতে লোকে বুঝিতেছে। ইহা আমার অনুভব।"

ভারতবাসীর আত্মজ্ঞান সম্পর্কে বিনোবাজীর প্রবচনের যে দুইটি অংশ উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। তাহা এই। বিনোবাজী এক স্থানে বলিতেছেন—ভারতে বেদান্তের প্রচার কম হয় নাই। আত্মা সর্বব্যাপক—এই কথা তো এই দেশের সব লোক মুখে বলে। শুধু মানুষের মধ্যে নয়—এমন কি প্রাণী-মাত্রেই একই আত্মা বিদ্যমান। কিন্তু ইহা শাব্দিক জ্ঞান মাত্র। তাই উহা হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করে নাই। কিন্তু অন্য স্থানে তিনি বলিতেছেন—

আমাদের আত্মজ্ঞান সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল আছে। তাই ভূদানযজ্ঞের বিচারের মাধ্যমে ভারতবাসী জনসাধারণকে আত্মজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া মাত্র উহা তাহাদের হৃদয়ের উপর এত তাড়াতাড়ি ক্রিয়া করিয়াছে। একটু গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য নাই ইহা বুঝা যাইবে। আত্মা সর্বব্যাপক—ইহা শিক্ষা দেওয়া বা এই জ্ঞান হওয়া এক কথা; আর এই আদর্শকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার প্রক্রিয়া ও কৌশল শিক্ষা দেওয়া পৃথক কথা। মা যদিও তাহার শিশুকে এই শিক্ষা দেয় যে শুধু মানুষের মধ্যে নহে—প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা বিরাজিত, তথাপি শিশু অন্য প্রাণীকে কষ্ট দিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। কিন্তু মা যদি শিশুকে শিক্ষা দেয় যে নিজের জিনিস অন্যকে দিয়া তবে নিজে খাইতে হয়, তবে শিশু সেইমত আচরণ করিতে থাকিবে। সাধারণভাবে এক মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ শিক্ষা দিলে মানুষ যদিও উহা মুখে বলিতে ও মনে অনুভব করিতে শিখিবে কিন্তু তাহার হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল থাকা সত্ত্বেও তাহা সে জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সহজে শিখিতে পারে না। আত্মজ্ঞানের মহান্ আদর্শের প্রয়োগ কিভাবে জীবনে করা যায় তাহা শিক্ষা দেওয়াই আত্মজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত অর্থ। তাই ভারতে বেদান্তের ব্যাপক প্রচার হওয়া সত্ত্বেও এবং তাহার হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল থাকা সত্ত্বেও বেদান্তের জ্ঞান তাহার নিকট শাব্দিক জ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু যখনই ভূদানযজ্ঞের বিচারধারার মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের শিক্ষা প্রচারিত হইতে থাকিল তখনই ভারত তাহা এত শীঘ্র ও সহজে তাহার ব্যবহারিক জীবনে গ্রহণ করিতে পারিতেছে।

## ক্রান্তির অভিব্যক্তির ক্রম

তিনটি ক্রমে 'বিপ্লব' বা 'ক্রান্তির' অভিব্যক্তি হয়। প্রথমে চিন্তায়, অতঃপর বাক্যে এবং অন্তিমে আচরণে বা কার্যে উহা অভিব্যক্ত হয়। আবার তিনটি পর্যায়ে ক্রান্তির পরিণতি ঘটিয়া থাকে। উহা প্রথমে কোন বিশিষ্ট বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনে, অতঃপর বহু ব্যক্তির জীবনে এবং অন্তিমে উহা সমাজদেহে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ প্রথমে হৃদয় পরিবর্তন, পরে

জীবন পরিবর্তন ও অবশেষে সমাজ পরিবর্তন হইয়া থাকে। বিনোবাজী তাঁহার এক ভাষণে এই সম্পর্কে অনুপমভাবে বলিয়াছেন—"যে কোনও ক্রান্তি প্রথমে চিন্তায় সংঘটিত হয়; পরে উহা বাক্যে প্রকাশিত হয়—সঙ্কল্পের রূপে আসে। অতঃপর কার্যে উহার বিকাশ হয়। কার্যও প্রথমে ব্যক্তিগত থাকে এবং পরে সামূহিক। অতঃপর উহার উপর সারা সমাজের মোহর অঙ্কিত হইয়া যায়। এইরূপভাবে ধর্ম-বিচার প্রথমে কোন কোন লোকের চিত্তে অঙ্কুরিত হয় এবং পরে উহা সারা সমাজে স্মৃতি বা আইনের বিধানরূপে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা-লাভ করে। অতঃপর উহাকে রূঢ় আচার বা ধর্মনিষ্ঠারূপে মানা হয়। আমি এক উদাহরণ দিতেছি। আজ চুরি করা অন্যায় বলিয়া গণ্য করা হয়। সারা সমাজ এবং আইন উহার বিরোধী। কিন্তু চুরির বিরুদ্ধে আইনের বিধান আছে—এইজন্য যে লোকে চুরি করে না একথা ঠিক নয়। চুরি করা মানবতার বিরোধী—ইহা মানুষের বিবেকবুদ্ধি মানিয়া লইয়াছে। এই কারণে ধর্ম-স্মৃতি ও আইন—উভয়েই উহা স্থান পাইয়াছে। গোড়ায় এই বিচারধারা ছিল না। কিন্তু যেমন যেমন নীতি-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইল তেমন তেমন নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইল। আমি সামাজিক নিষ্ঠার একটি উদাহরণ দিলাম। ঐরূপভাবে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি রাখিতে নাই, অধিক কিছু জমাইয়া রাখা উচিত নহে। অধিক সংগ্রহ করা পাপ। যেমন চুরি করা পাপ তেমনি সংগ্রহও পাপ—এই ধর্ম-বিচার আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করাইতে হইবে। এই বিচার নূতন নহে—ইহা বহু পুরাতন। মহর্ষিগণ নিজেদের জীবনে উহা প্রয়োগ করিতেন। ব্যক্তিগত ভাবে উহা নিজ জীবনে আচরণ করিয়াছেন—এমন মহাত্মা এবং সাধুসন্ত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে চুরির বিরুদ্ধে যেরূপ মনোভাব—সংগ্রহের বিরুদ্ধে সেরূপ দৃঢ় ও তীব্র মনোভাব নাই। সেরূপ মনোভাব এক্ষণে সৃষ্টি করিতে হইবে। এইজন্য আমি এই আন্দোলনের নাম দিয়াছি 'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন'। কেননা ইহাতে এক বিচারধারাকে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অসংগ্রহ ও অপরিগ্রহকে কেবলমাত্র ঋষি ও সাধুসন্ন্যাসীদের পক্ষে আচরণীয় গুণ বলিয়া মানা হইয়াছে। তদ্রূপ সাধারণ লোকের জন্যও—গৃহস্থ-দিগের জন্যও উহা জীবনের মূলাধার হওয়া চাই। ইহা ব্যতীত শোষণ কিছুতেই দূর করা যাইবে না। এই ধর্ম বিচার সামাজিক নিষ্ঠাস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে

হইবে। ইহার আরম্ভ বিচার ক্রান্তিতে এবং ইহার পরিণতি সামাজিক ক্রান্তিতে হইবে।" এরূপে শান্তির পথে সদ্‌ভাবনা জাগ্রত করিয়া ক্রান্তি সৃষ্টি করা ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের চরম লক্ষ্য। তিনি বলেন—"আমি ন্যায় ও প্রেম—উভয়কে একত্রিত করিতে চাহিতেছে। ইহাকে সূর্য-চন্দ্র বলা যায়। উহা ঈশ্বরের দুই চক্ষু। ওই দুই চক্ষু একসঙ্গে মিলিত হইলে তেজ পরিপূর্ণ হয়।"

## ভূদানযজ্ঞের মূল তত্ত্ব ও সাম্যদায়িক ধর্ম

ইহাই ভূদানযজ্ঞের মূলগত সিদ্ধান্ত। সর্বোদয় বিচারের মূলও এখানে। ইহা কোন খণ্ড বিচারও নহে। ইহা জীবনের সামগ্রিক মহান্ সিদ্ধান্ত ও জীবনে তাহার প্রয়োগের উপায়। মোট কথা বৈদিক ধর্মের সার ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে এবং তাহাই সূত্রাকারে "ঈশাবাস্য" মন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে। "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।" জগতে যাহা কিছু আছে সবই ঈশ্বরময়—সবই ঈশ্বরের। তিনিই একমাত্র মালিক। ইহা বুঝিয়া আমাদের সব কিছুই তাঁহাকে সমর্পণ করা চাই এবং যাহা কিছু তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে তাহা তাঁহার প্রসাদ গণ্য করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এখানে আমার কিছু নাই—সবই ভগবানের—এই ভাবনা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি এইভাবে জীবনযাপন করিবে কাঁহারও ধনে তাহার অভিলাষ থাকিবে না। ঈশ্বর-সমর্পণ, যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ, ঈর্ষা না করা ও ধনের লালসা না করা—ইহা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম-বিচার ও তাহা সাধনের উপায়। ইহাকেই সাম্যদায়িক ধর্মস্বরূপে সমাজনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের দেশে অনেক সাধু-সন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সাধুরা ধ্যান-জপ আদি শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু সাম্যদায়িক ধর্ম কি তাহা তাঁহারা শিক্ষা দেন নাই। এ সম্পর্কে প্রজা-সমাজবাদী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণজী যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। "আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন—'আপনি যে বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন, সে বিষয়ে মুনি-ঋষিগণ তো বহু করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে সমাজের পরিবর্তন হয় নাই কেন?' তাহার

উত্তরে আমি বলিব—তাঁহাদের অসফলতার কারণ এই যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একাঙ্গী ছিল। তাঁহারা কেবল ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, খারাপ যাহাকিছু সব ব্যক্তিরই মধ্যে। বুদ্ধের নিদান এই যে, তৃষ্ণাই সব দুঃখের মূল। একদিকে ইহা সত্য। কিন্তু একটি ছেলে রাজার ঘরে জন্মিল এবং আর একটি ছেলে গরীবের ঘরে জন্মিল—ইহার কারণ তৃষ্ণা তো নহে। এই প্রকারে আমরা সমাজবাদী সমাজ পরিবর্তনের উপর বেশী দৃষ্টি দিয়া থাকি। মুনি-ঋষিরা অন্তরেই সর্বকিছু ইহা মনে করিতেন; আর আমরা বাহিরেই সর্বকিছু ইহা মনে করিয়া থাকি। আমার মতে এই দুই বিচারই একাঙ্গী দোষে দুষ্ট। আমি চাই—এই দুইএর সমন্বয় হউক। যদি ইহার কোন একটিকে আমরা ছাড়িয়া দিই, তবে উত্তম সমাজ রচনা করিতে পারিব না। উভয়কে ধরিয়া থাকিলে তবে ভাল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে।"

মহাত্মা গান্ধী দেশকে সামুদায়িক ধর্মে শিক্ষাদান করিতে ব্রতী হন। ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক জীবন যে এক ও অবিভাজ্য তাহা বুঝাইয়া দিয়া তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সততা ও অহিংসা প্রয়োগের শিক্ষাদান করেন এবং অহিংস সমাজ রচনার উদ্দেশ্যে দেশকে প্রস্তুত করিবার জন্য গঠনমূলক কার্যের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের ভার আজ ভগবান বিনোবাজীর হস্তে সঁপিয়া দিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এই সামুদায়িক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় কি? আজ জনসাধারণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার মাধ্যমে ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই ধর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিচার ও আচারে মহান্ ক্রান্তি সৃষ্টি করিতে হইবে। রাষ্ট্রশক্তি বিচার-বিপ্লব বা নিষ্ঠা-বিপ্লব সৃষ্টি করিতে অক্ষম। রাষ্ট্রশক্তি অনুসরণকারী মাত্র হইতে পারে; সমাজে উহা পথপ্রদর্শনকারী হইতে পারে না। কোন মৌলিক ভাবধারা সৃষ্টি করা উহার সাধ্যাতীত। যখন কোন বিচার মানুষের বিবেক-বুদ্ধি মানিয়া লয় ও আচারে উহা অনুসৃত হইতে থাকে কেবলমাত্র তখনই রাষ্ট্র আইনের বিধান করিয়া উহাতে সমাজের ছাপ মারিয়া দিতে পারে এবং দণ্ডশক্তির বলে উহাকে সার্বজনীনভাবে কার্যে পরিণত করিতে পারে। এই

সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"বিচার-প্রচার তো নেতৃবৃন্দ ও বিচার প্রবর্তকগণের কাজ। ক্রান্তিকারক বিচার যখন লোকে মানিয়া লয় তখন সরকারকে উহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং যদি সরকার তাহা না করে তবে সরকারের পরিবর্তন হয়। '০' শূন্যের যেরূপ মূল্য, সরকারকে আমি তদ্রূপ মূল্য দিয়া থাকি। জনশক্তির সহিত সরকারের শক্তি মিলিত হইলে তবেই সরকারের মূল্য বড় হইতে পারে। যখন বিচার ছড়াইয়া পড়ে তখন ঐ বিচারের অনুকূলে রাজ্য গঠিত হয়। নচেৎ রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়। মার্কস্ বিচার প্রবর্তন করিলেন, তখন লেনিনের নেতৃত্বে রুশিয়ার বিপ্লব সংঘটিত হইল। রুশো ও ভল্টেয়ারের প্রবর্তিত বিচার-ক্রান্তির ফলে ফ্রান্সে রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। আমি মনে করি, আমার বিচার-ধারার ভিত্তিতে জনমত গঠিত হওয়া মাত্র সরকার তাহাকে মানিয়া লইবেন। যদি না মানেন তবে সরকার খতম হইয়া যাইবে ও তাহাতে আমার দুঃখ হইবে না।"

**সর্বোদয়প্রেমীর কর্তব্য**

কেহ কেহ বিনোবাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি বাহিরে রহিয়াছেন কেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই কেন? তাহার উত্তরে বিনোবাজী এক সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার যে কাজ তাহা রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের কোন্ পথে চলা উচিত সেই পথ রাষ্ট্রকে দেখাইয়া দেওয়া ও সেই পথ ঠিক করিয়া দেওয়া তাঁহার কাজ। তিনি বলিয়াছেন—"দুইটি বলদ গরুর গাড়ীতে জোতা রহিয়াছে। আমি যদি তৃতীয় বলদ হইয়া গাড়ীতে কাঁধ দিই, তবে তাহাতে গাড়ীর কি আর সুবিধা হইবে? তাহার চাইতে গাড়ীর যে পথে যাওয়া উচিত সেই রাস্তা যদি আমি একটু ঠিক করিয়া দিতে পারি তবে গাড়ীর সব চাইতে বেশী উপকার আমি করিতে পারিব।" তিনি রাষ্ট্রশক্তির নাম দিয়াছেন—'দণ্ডশক্তি'। বিনোবাজী বলেন—"আজ আমাদের যে রাজ-সরকার আছে তাহার হাতে আমরা 'দণ্ডশক্তি' সঁপিয়া দিয়াছি। হিংসা ঐ দণ্ড-শক্তির' অংশীভূত হইয়া রহিয়াছে। তথাপি আমরা উহাকে 'হিংসা' বলিতে

চাহি না। উহাকে হিংসা হইতে পৃথক শ্রেণীতে রাখিতে চাই। আমরা উহাকে হিংসাশক্তি হইতে ভিন্ন 'দণ্ডশক্তি' বলিতে চাই, কেন না সমগ্র জনগণ ঐ শক্তি উহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এইজন্য উহা অবিমিশ্র হিংসাশক্তি নহে; কিন্তু উহা 'দণ্ডশক্তি'।"

**রাষ্ট্রনায়কগণের করুণ অবস্থা**

বিনোবাজী মনে করেন যে, দেশের রাষ্ট্রনায়কদের অহিংসার উপর শ্রদ্ধা আছে। তাঁহাদের হৃদয় অনুভব করে যে অহিংসা ব্যতীত কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না। কিন্তু যখন তাঁহারা বুদ্ধি দিয়া চিন্তা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্বের কথা বিবেচনা করিয়া অহিংসার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে সাহস পান না। বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারা কাজ করেন। তাঁহাদের বুদ্ধি তাঁহাদিগকে বলিয়া দেয়—'আমরা সৈন্যদল তুলিয়া দিতে পারি না। আমরা যে জনগণের প্রতিনিধি সে জনগণ তেমন শক্তিমান নহে। সৈন্যবল বিনা চলিবার যোগ্যতা জনগণের নাই। এইজন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপে আমরা এই দায়িত্ব বোধ করি যে—আমাদিগকে সৈন্যদল সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও মজবুত করিতে হইবে।' এইরূপে তাঁহাদের হৃদয় এক কথা মানে কিন্তু তাঁহাদের বাস্তব পরিস্থিতি প্রভাবিত বুদ্ধি উল্টা কথা বলিয়া দেয়। হৃদয় ও বুদ্ধির বিরোধের বিপাকে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় তাঁহাদিগকে সৈন্যবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহাদের হৃদয় রচনাত্মক কার্যে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি চরকা বা অন্য গ্রাম্যশিল্প দ্বারা যুদ্ধযন্ত্র মজবুত করিতে পারিবে বলিয়া সাহস পায় না। ইহা তাঁহাদের ভণ্ডামি নহে; ইহা নিতান্ত করুণ অবস্থা। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আত্মনিরীক্ষণপূর্বক আমি ইহা বলিতেছি, যাঁহারা আজ দায়িত্বের আসনে বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহাদের আসনে যদি আমরা বসিতাম তবে আজ তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা হইতে বিশেষ অন্যরূপ যে আমরা করিতে পারিতাম—এমন নহে। ঐ স্থানই এমন। উহা যাদুর আসন। ঐ আসনে যে বসিবে তাহার উপর এক সংকুচিত, সীমাবদ্ধ, অস্বাভাবিক ও অস্বাধীন পরিধির দৃষ্টিকোণ হইতে চিন্তা করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে। যাহাকে আমি

অস্বাধীন নাম দিয়াছি সেই বন্ধভূমিতে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় দুনিয়ার স্রোত যে দিকে বহিতেছে বলিয়া দেখা যায় সেই দিকে তাকাইয়া চিন্তা করিবার দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসে।" এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? ইহার প্রতিকার কি? বিনোবাজী বলিয়াছেন, দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা এই কথা বলেন যে, "আমরা যে কাজ করিতেছি সে কাজ আপনারা করিবেন না। ঐ কাজে আপনারা আবদ্ধ হইবেন না। বরং আমরা যে অভাব বোধ করিতেছি তাহা যদি আপনারা পূরণ করিতে পারেন তবে তাহা করুন।" বিনোবাজী বলেন, "এই আশায় তাঁহারা আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ইহা আমাদিগকে ঠিক মত বুঝিতে হইবে এবং ঐ দৃষ্টিতে আমি যাহাকে 'স্বতন্ত্র লোকশক্তি' বলিয়া থাকি সেই 'স্বতন্ত্র লোকশক্তি' যেরূপে নির্মাণ করা যায় সেই কাজে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা রাষ্ট্রশক্তিকে প্রকৃত সহায়তা দান এবং দেশের সমুচিত সেবা করিতে পারিব।"

### দণ্ডশক্তি নিরপেক্ষ জনশক্তি

এই স্বতন্ত্র লোকশক্তি কি? ইহা রাষ্ট্রশক্তি বা দণ্ড শক্তি নহে। উহা দণ্ডশক্তি হইতে ভিন্ন। উপরন্তু উহা হিংসার বিরোধী। বিনোবাজী চাণ্ডিল সর্বোদয় সম্মেলনে তাঁহার প্রথম ভাষণে এই বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উপরে বলা হইয়াছে যে, ক্রান্তি প্রথমে চিন্তায় উদয় হয় এবং অবশেষে উহা কার্যে বা রূঢ় আচরণে পরিণতি লাভ করে। উপরন্তু ক্রান্তিমূলক আচরণ প্রথমে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ও অন্তিমে উহা সমগ্র সমাজে সমাজনিষ্ঠা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ক্রান্তির এই চরম পরিণতি যখন উহা রূঢ় আচরণে এবং সমগ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়—তখন তাহাই হয় 'স্বতন্ত্র লোকশক্তি বা জনশক্তি'র অভিব্যক্তি। শান্তি ও প্রেমের পথেই ইহা নির্মাণ করা সম্ভব। উহা সমাজের মনস্তাত্বিক অবস্থা মাত্র নহে। উপরন্তু রূঢ় সামাজিক নিষ্ঠামূলক আচরণে উহা অভিব্যক্ত হয়। এমতাবস্থায় সার্বজনীনভাবে উহার আচরণ করা আইনের বিধানের উপর নির্ভর করিবে না। শান্তির পথে বিচার প্রচারের দ্বারা লোকের মধ্যে এমন

মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইবে যাহাতে আইন হউক আর নাই হউক, লোকে বিচার-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তদ্রূপ কার্য করিবে, লোকে জমি বাঁটোয়ারা করিয়া লইবে। এই প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"কোন আইনের কারণে কি মাতা সন্তানকে দুগ্ধ পান করায়?" ইহা হইতে আমরা অহিংস ক্রান্তি বা জনশক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম। হিংসা তো দূরের কথা দণ্ডশক্তিরও প্রয়োগ করিবার অবকাশ না থাকে এইরূপ পরিস্থিতি সমাজে সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাহা সাধন করা—সর্বোদয়প্রেমীদেরই কার্য। বিনোবাজী বলেন—"যদি আমরা উহা করি তবে আমরা আমাদের স্বধর্ম চিনিয়া লইতে পারিয়াছি ও তদনুসারে আচরণ করিতে শিখিয়াছি। যদি আমরা তাহা না করি এবং দণ্ডশক্তির প্রয়োগ দ্বারা যে টুকু জনসেবা হইতে পারে তাহার প্রতি লালসা পোষণ করি তবে যে বিশেষ কার্য আমাদের দ্বারা হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হইয়া থাকে সেই কার্য বা সেই আশা আমরা সার্থক করিতে পারিব না। বরং আমরা বোঝাস্বরূপ গণ্য হইব—এইরূপ সম্ভাবনা আছে।"

**সমস্যা সমাধানে আইনের স্থান**

লোকে আইনের দ্বারা ভূমিসমস্যা সমাধানের কথা প্রায়ই বলিয়া থাকে। আইনের দ্বারা ভূমি সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করিতে হইলে তাহা ক্ষতি-পূরণ দিয়া হইবে কি বিনা ক্ষতিপূরণে হইবে—তাহা চিন্তা করিতে হয়। যদি একর প্রতি ৯০০৲ টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তবে ৫ কোটি একর ভূমির জন্য ৪৫০০ কোটি টাকার আবশ্যক হইবে। ক্ষতি পূরণ দিয়া ভূমি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা উচিত কিনা এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও সরকারের পক্ষে এত টাকা খরচ করা কখনও সম্ভব হইবে না। সুতরাং বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি বণ্টনের ব্যবস্থার কথাই চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু সংবিধানের আবশ্যকীয় সংশোধন করা না হইলে তাহা সম্ভব নহে। ভূদানযজ্ঞ—আইন প্রণয়নে কোন বাধা সৃষ্টি করে না; বরং ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের ফলে বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি বণ্টনের পক্ষে সংবিধান সংশোধন ও আইন প্রণয়নে সুবিধা হইবে। কারণ উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, বিচার-বিপ্লব সমাজে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিনা ক্ষতি-

পূরণে সংগত ভূমি বণ্টনের আইন প্রণীত হওয়া সহজসাধ্য হইবে না। আইন সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন—'সরকারের উপর আপনার প্রভাব আছে দেখা যায়। যাহাতে সরকার বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি বিতরণের পথ খুলিয়া দেয় এজন্য আপনি সরকারের উপর চাপ দিতেছেন না কেন? আপনি আপনার প্রভাব কেন এই দিকে প্রয়োগ করিতেছেন না?' এরূপ বহুবার লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে ইহা বলিতে চাই যে—ভাই, আইনের পথে তো আমি বাধা দিতেছি না। আপনারা যেরূপ চাহেন সেইদিকে যদি আমাকে আরও এক পা অগ্রসর হইতে বলেন তবে আমি বলি যে, যে পথ আমি গ্রহণ করিয়াছি ঐ পথে যদি আমি পূর্ণ সফলতা—ষোল আনা ফল না পাই এবং বার আনা—আট আনাও সফলতা পাওয়া যায়—তবে আইন হওয়ার সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ তো আমি আইন প্রণয়নের পথে বাধা দিতেছি না। দ্বিতীয়তঃ আমি আইন প্রণয়নের সুবিধা করিয়া দিতেছি। উহার জন্য আমি অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছি—যাহাতে আইন সহজে প্রণীত হইতে পারে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আরও এক পা যদি আমি আপনাদের দিকে অগ্রসর হই এবং রটাইতে থাকি 'আইন ছাড়া এই কাজ হইবে না; আইন করিতেই হইবে' তাহা হইলে আমি স্বধর্মচ্যুত হইয়াছি বলিয়া গণ্য হইব। উহা আমার ধর্ম নহে। বরং ইহা বিশ্বাস করা আমার ধর্ম যে, বিনা আইনের বলে জনতার হৃদয়ে এমন ভাবধারা সৃষ্টি করিতে পারিব যাহাতে কিছুমাত্র আইন না হইলেও লোকে ভূমি বণ্টন করিয়া লইবে। কোন আইনের ভয়ে কি মাতা সন্তানকে স্তন্য দান করে? অতএব মানুষের হৃদয়ে এমন এক শক্তি রহিয়াছে যাহাতে তাহার জীবন সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রেমই মানুষের জীবনে একমাত্র ভরসা। প্রেমে তাহার জন্ম। প্রেমের আওতায় সে লালিতপালিত। আর অবশেষে যখন তাহাকে এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয় তখন সে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লয় এবং তখন যদি তাহার প্রেমাস্পদ তাহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া থাকে তবে সে সানন্দে দেহত্যাগ করিয়া—ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অতএব প্রেমের এইরূপ শক্তি অনুভব করা সত্ত্বেও উহাকে অধিক সামাজিক-রূপে বিকশিত করিবার সাহস না রাখিয়া যদি আইনের জন্য চীৎকার করিতে

থাকি তবে জনশক্তি নির্মাণ করিয়া রাষ্ট্রকে সহায়তা দান করিতে পারিব বলিয়া যে আশা করা হয় তাহা বিফল হইবে। এইজন্য 'দণ্ডশক্তি' হইতে ভিন্ন 'জনশক্তি' আমি নির্মাণ করিতে চাহিতেছি। আর আমাদিগকে উহা নির্মাণ করিতেই হইবে। এই যে জনশক্তি আমরা রচনা করিতে চাহিতেছি উহা যে দণ্ডশক্তির বিরোধী হইবে এমন কথাও নহে; তবে উহা হিংসার বিরোধী। ঐ জনশক্তি দণ্ডশক্তি হইতে ভিন্ন।" আইন সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন—"আইন এক ভিন্ন ব্যাপার। হিংসা ও অহিংসা উভয়েরই সহিত উহার সম্বন্ধ। আইনের পিছনে ভৌতিক শক্তি অথবা নৈতিক শক্তি থাকা চাই। আমার কার্যের জন্য এমন এক নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হইতেছে, যাহার দ্বারা সরকারের আইন প্রণয়নে সুবিধা হইবে। সেই নৈতিক আবহাওয়া তৈয়ারী না হওয়া সত্ত্বেও যদি আইন করা হয় তবে সেই আইন প্রয়োগ করিবার জন্য দণ্ডশক্তির প্রয়োজন হইবে। যদি আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য সৈন্যবলের প্রয়োজন হয় তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের কি দশা হইবে তাহা মনোযোগের সহিত একবার ভাবিয়া দেখুন।" তিনি আরও বলেন—"লোকে আইন প্রণয়নের কথা তুলিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জানে না যে, আইন তো পশ্চাদনুসরণ করিবেই। আমার কার্যের দ্বারা যে আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে তাহার সাহায্যে সরকারকে অবশ্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। নচেৎ এই সরকার খতম হইয়া যাইবে। অন্য সরকার আসিবে।"

আইন তৈয়ারী হউক এবং তাড়াতাড়ি হউক কিন্তু সেই কাজে যদি সর্বোদয়ের কর্মীরা লাগিয়া থাকেন তবে তাহা তাঁহাদের পক্ষে পরধর্ম আচরণ করা হইবে। বিনোবাজী বলেন—"আমাদের স্বধর্ম হইবে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করা এবং বিচারের উপর বিশ্বাস রাখা। আমরা ইহা বলিব না যে—'ওরে বিচার শুনিলে-শুনাইলে কবে কাজ হয়?' বিচার অন্তরে আসিলেই কাজ হইবে; কারণ আমাদের কাজ বিচার দ্বারাই হওয়া সম্ভব।" দণ্ডশক্তি-নিরপেক্ষভাবে যে বিচারবোধের দ্বারা জনশক্তির কাজ সাধিত হয় তাহাকে বিনোবাজী নাম দিয়াছেন—"বিচার-শাসন"।

যাঁহারা সর্বোদয়ের দৃষ্টি মান্য করেন না তাঁহাদের কথা মানিয়া লইয়া যদি ইহা মনে করাও হয় যে, আইন ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান হইবে না—

আইন করিতেই হইবে; তথাপি এখনই কি উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হইবে? উপরন্তু আর একটি প্রশ্ন এই যে, পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী বিলোপ আইন প্রণীত হইয়াছে এবং খাস জমির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উহার বর্তমান মালিকের হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট জমি সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবার আইন প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে যে জমি পাওয়া যাইবে তাহার অতিরিক্ত জমি যাহা ভূমিহীনদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আবশ্যক হইবে তাহা তো সরকার কঠোরতর আইন করিয়া লইতে পারেন। এই অবস্থায় অন্ততঃ পশ্চিম বাংলায় ভূদানযজ্ঞের আর কি প্রয়োজন আছে? আইনের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ceiling নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে সরকার এই আশা পোষণ করেন যে, ৪ লক্ষ একর আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের জন্য সরকারের হাতে আসিবে। কিন্তু এদিকে ভূমির মালিকগণ আইনের বিধান এড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট ceiling এর অতিরিক্ত যে ভূমি তাঁহাদের আছে তাহা বেনামে হস্তান্তর করিয়া রাখিয়াছেন বা রাখিতেছেন। এইরূপ হস্তান্তর বন্ধ করিবার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। তথাপি ঐরূপ হস্তান্তর বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। এই অবস্থায় ৪ লক্ষ একর খাস জমি সরকারের হাতে আসা দুরাশা বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, যদিও ধরিয়া লওয়া হয় যে, সরকার ৪ লক্ষ একর খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের জন্য পাইলেন তবে তাহাতে কি ফল হইবে,? বর্তমান লোক গণনায় পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১ কোটি সাড়ে ৪০ লক্ষ (১,৪০,৪৬,০৪০)। তাহার মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৬০ লক্ষ। ইহা ব্যতীত যাহাদের ৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি আছে তাহাদিগকেও ভূমিহীন দরিদ্র বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহারাও ভূমি পাইতে অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। তাহাদের জন্যও ভূমি ব্যবস্থা করার আবশ্যক হইবে। তাহাদের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও যাহারা একেবারে ভূমিহীন দরিদ্র অথচ কৃষির উপর নির্ভরশীল এমন ৬০ লক্ষ লোকের জন্য (৫ জনের পরিবারের জন্য ৫ একর করিয়া ভূমি দিতে হইলে) ৬০ লক্ষ একর ভূমির আবশ্যক হইবে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমির অল্পতা নিবন্ধন ৫ জনের পরিবারে হয় তো ৫ একর করিয়া ভূমি দেওয়া সম্ভব হইবে না। ৫ জনের পরিবারে

১০/০ বিঘা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) করিয়া ভূমি দিবার ব্যবস্থা করিলেও পশ্চিম বাংলার ৬০ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকের জন্য ৪০ লক্ষ একর ভূমির প্রয়োজন হইবে। যেখানে ৪০ লক্ষ একর ভূমির আবশ্যক সেখানে ৪ লক্ষ একর ভূমিতে সমস্যা সমাধানে কতটুকু সাহায্য হইবে তাহা অনুমান করা যায়। উপরন্তু ঐ ভূমিও মূল্য বা ক্ষতিপূরণ দিয়া লইতে হইতেছে। ৪০ লক্ষ একর ভূমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া লইতে হইলে ৩৬০ কোটি টাকা লাগিবে। ঐ বাবদে এত টাকা খরচ করা গভর্ণমেণ্টের সামর্থ্য নাই। তাই আইনের সাহায্যে ভূমিহীনের জন্য ভূমির ব্যবস্থা করিতে হইলে যদি বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লওয়া সম্ভব হয় তবেই হইবে। নচেৎ নয়। আজ কি তাহা সম্ভব? অনেকে মনে করেন যে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই তাহা করিতে পারেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কোন ইচ্ছার উদ্রেক হয়—সমাজের আবহাওয়ায় বা আবহাওয়ার চাপে। তাই সরকার অনুগামী মাত্র হইতে পারেন। বর্তমানে এদেশের অর্থনৈতিক সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভূমি সম্পর্কে ঐ ভিত্তি জনমানসে বর্তমানে কিছু শিথিল হইলেও এখনও উহা দৃঢ় রহিয়াছে। যতদিন ভূমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বোধ বিদ্যমান থাকিবে তত-দিন ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব যাইবে না। ভারতীয় সংবিধানের বিধান অনুসারে যে কোন প্রকারের স্বত্ব হউক না কেন কাহারও কোন জমি অধিকার করিতে হইলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের প্রণীত জমিদারী বিলোপ সংক্রান্ত আইনে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা না থাকায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারে ঐ সব আইন বাতিল বলিয়া গণ্য হয়। উক্ত আইনগুলি পুনর্জীবিত করিবার জন্য সংবিধানের সংশোধন করা হইয়াছে ও তাহার দ্বারা সংবিধানের ক্ষতিপূরণ-দান সংক্রান্ত বিধানের কঠোরতা শিথিল করা হইয়াছে। তাহার ফলে এক্ষনে জমিদারী, মধ্যস্বত্ব এবং জায়গির বা ইনামী স্বত্বের ভূমি ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম ক্ষতিপূরণ দিয়া সরকার কর্তৃক অধিকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঐ বিধান অন্যান্য স্বত্বের খাসদখলের ভূমি সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। তাই রায়তী বা অন্যান্য স্বত্বের খাসদখলী ভূমি সরকার কর্তৃক অধিকার করিতে হইলে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। বিনা ক্ষতিপূরণে

যাহাতে অন্যান্য স্বত্বের খাসদখলী ভূমি দখল করা যাইতে পারে তৎপক্ষে এখনই সংবিধানের সংশোধন করা সম্ভব কি? জমিদারগণ সংখ্যায় অত্যল্প এবং বর্তমানে তাঁহাদের বিশেষ কিছু রাজনৈতিক প্রভাবও নাই। এই অবস্থায় জমিদারগণের স্বার্থের প্রতিকূল বিধান প্রণয়ন করা সহজ হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য স্বত্বের ভূমি সম্পর্কে সংবিধানের বিধান শিথিল করা এত সহজ নহে—বিনা ক্ষতিপূরণে উহা গ্রহণের বিধান করা আরও কঠিন। কারণ যাঁহার অত্যল্প ভূমি আছে এই বিষয়ে তাঁহারও স্বার্থ জড়িত। যাঁহার মাত্র ৫/০ বিঘা ভূমি আছে তিনিও মনে করিতে পারেন যে, বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লইবার আইন হইলে তাঁহার ভূমি ঐভাবে সব দখল করা যাইতে পারে। তাই যতদিন পর্যন্ত সমাজে ভূমি সম্পর্কে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধ থাকিবে অথবা উহা বিশেষভাবে শিথিল না হইবে ততদিন বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি অধিকার করিবার পক্ষে সংবিধানের বিধান সংশোধিত হওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন ভূমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব সম্পর্কে জনমানসে সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'ভূমি আমার নয়, সবই ভূমি ভগবানের'—এই বৈপ্লবিক বিচারবোধ যতই সমাজে উত্তরোত্তর অধিকতরভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে ততই সংবিধানের ক্ষতিপূরণ দান সংক্রান্ত বিধানের কঠোরতা শিথিল হইবার এবং অবশেষে উক্ত বিধান বিলুপ্ত হইবার পক্ষে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্ট হইতেছে। ভূদানযজ্ঞ আংশিকভাবে সফল হইলেও তাহাতে এমন এক বৈপ্লবিক বিচারবোধ সমাজে ব্যাপকভাবে জাগ্রত হইবে যাহাতে বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি গ্রহণের পক্ষে আইন প্রণয়ন অনিবার্য হইয়া পড়িবে। একমাত্র ভূদানযজ্ঞ অর্থাৎ সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বিচার, সমাজে এই চিন্তাবিপ্লব আনয়ন করিতে পারে। হিংসাত্মক উপায়ে ভূমি ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রচার বা আন্দোলন চালাইলে তাহাতে ভয় আসিতে পারে কিন্তু চিন্তা-বিপ্লব ও বিচার-বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে না। আইন করিবার জন্য ভয় দেখাইলে বিচার-বিপ্লব আসে না। কারণ মানুষ তো আইন ফাঁকি দিবার জন্য কৌশল উদ্ভাবন করিতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আইনের দ্বারা ভূমি বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলেও ভূদানযজ্ঞ একমাত্র পন্থা যাহা আইন প্রণয়নের পক্ষে বাধ্যকর নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে

পারে। ধরুন, দশ আনা রকম ভূমিবান ভূদানযজ্ঞে সম্যক ভূমি দান করিলেন কিন্তু অবশিষ্ট ছয় আনা লোক দিলেন না। তাহাতে সমাজে বিচার-বোধের বিপ্লব আসিবে এবং বাকি ছয় আনা লোকের জন্য আইন প্রণীত হইবেই। আইনের বলে ভূমি লওয়া হইলে সমাজে ভূমিবানগণের ইজ্জত, সম্মান ও ব্যক্তিত্ব চিরতরে নষ্ট হইবে। ভূমিবানগণ কি সেই দুর্দৈবের জন্য অপেক্ষা করিবেন?

ভূদানযজ্ঞ আইন চায় না। ভূদানযজ্ঞ চায়—ধনীকে প্রতিবেশী-ধর্মে দীক্ষা দান করিতে, তাঁহাদের আত্মজ্ঞানের বিকাশ সাধন করিতে এবং তাঁহাদের আত্মাকে পরিবারের পরিধির বাহিরে সম্প্রসারিত করিতে। তাঁহাদের পরিবারের বাহিরে দরিদ্র যাহারা আছে তাহাদিগকে নিজেদের পরিবারের অংশীদার স্বরূপ ভাবিতে আরম্ভ করুন। তাঁহাদের পরিবারের বাহিরে যে ভূমিহীন দরিদ্র তাহাকে নিজেদের পুত্র বলিয়া গণ্য করুন ও তাহাকে তাহার অংশ দিন। মা সন্তানকে যখন কোলে তুলিয়া লয় তখন মাকে একটু ঝুঁকিতে হয়। আজ ধনী তাঁহার ভূমিহীন দরিদ্র সন্তানকে কোলে তুলিয়া লউন। সেজন্য তাঁহাকে ঝুঁকিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার জীবনযাত্রার মান কিছু খর্ব করিতে হইবে। যুগের পরিবর্তন হইতেছে। ধনী, যুগের ইঙ্গিত বুঝিয়া লউন। আজ দরিদ্রের ভগবান জাগ্রত হইয়াছে। এ যুগে ভূমি ধনীর হাত হইতে দরিদ্রের হাতে যাইবেই। প্রশ্ন এই যে, কোন্ পথে তাহা যাইবে? আজ যদি প্রেমের পথে, শান্তির পথে ধনী তাঁহার ভূমি দরিদ্রের জন্য অর্পণ করেন এবং মা সন্তানকে স্তন্য পান করাইবার সময় যে পরম আনন্দ অনুভব করেন ধনী দরিদ্রের জন্য ভূমি অর্পণ করিবার সময় যদি সেইরূপ পরম আনন্দ অনুভব করেন তবে ধনীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা পাইবে, শুধু তাহা নহে তাঁহার সম্মান ও মর্যাদা বর্ধিত হইবে এবং তিনি সমাজের প্রকৃত সেবক ও নেতা হইতে পারিবেন। ধনীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে। আজ তাহা সমাজ সেবার কাজে লাগিতেছে না। তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তি ত্যাগের দ্বারা পূত—পবিত্র হউক। তবেই তাহা গণ-দেবতার অর্চনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হইবে। যুগ পরিবর্তনে তাঁহাদের ভূমি বা সম্পত্তি অধিক থাকিবে না। আজ যিনি রাজা তিনি কাল-প্রবাহের পরিবর্তনে কাল আর

বাহিরের রাজা থাকিবেন না। তবে তাঁহারা যেন চিরদিন জন-মানসে রাজর্ষি স্বরূপ বিরাজিত থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ ও সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। আজ দরিদ্র ভূমিহীন ধূলায় লুণ্ঠিত। ধনীর স্বেচ্ছা প্রণোদিত ত্যাগের দ্বারা দরিদ্র সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিবে। সমাজে দ্রোহরহিত উৎপাদক শ্রমের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনীও ত্যাগ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া জন-হৃদয়ে সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে। ইহাই ভূদানযজ্ঞের মুখ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

### দারিদ্র্যের মূল

সমাজে দারিদ্র্য কেন? সমাজে দারিদ্র্য, শোষণ ও ধনবৈষম্য উৎপত্তির মূল কোথায়? উৎপাদনের আধার, সাধন ও যন্ত্রে উৎপাদকের পূর্ণ অধিকার ও মালিকত্ব থাকা চাই। নচেৎ উৎপাদককে তাহার উৎপাদক শ্রম করিবার সুযোগ হারাইতে হয়; অথবা তাহাকে তাহার শ্রমলব্ধ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ভূমি উৎপাদনের মৌলিক সাধন বা ক্ষেত্র। যে ব্যক্তি নিজ হাতে জমি আবাদ করিয়া তাহাতে ফসল উৎপাদন করিবে জমির মালিকত্ব তাহারই থাকা চাই। যে শ্রমিক-শিল্পী যন্ত্র সাহায্যে মাল উৎপাদন করে উৎপাদন-যন্ত্রের অধিকার তাহার হাতে থাকা চাই। ইহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত নিয়ম। যত দিন এই নিয়ম যথাযথ পালিত হইতেছিল, ততদিন সকলেই শ্রম করিত এবং সকলেই ধনোৎপাদন করিত। কেহই শোষিত ছিল না। কেহই দরিদ্র ছিল না। আবার কেহ বিরাট ধনীও ছিল না। যখনই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ হইল তখনই সমাজে শোষণ, দারিদ্র্য ও ধনবৈষম্যের সূত্রপাত হইল। অর্থাৎ উৎপাদনের মৌলিক সাধন ভূমি যতদিন উৎপাদক চাষীর হাতে ছিল, ততদিন চাষীর দারিদ্র্য ছিল না। যখনই তাহা অনুৎপাদক ধনীর হাতে গেল, তখনই উৎপাদক চাষী অসহায়, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় তাহাকে শোষণ ও উৎপীড়নের কাছে নতি স্বীকার করিতে হইল। নচেৎ বেকার হইয়া তাহাকে উপবাসী থাকিতে হইত। তখন হইতে সে তাহার শ্রমার্জিত সম্পদের সবটুকু ভোগ করিতে পাইল না। কিঞ্চিৎ অংশমাত্র তাহার কপালে জুটিল।

তাহার শ্রমোৎপাদিত সম্পদের অধিকাংশ মালিক ধনিক আত্মসাৎ করিতে লাগিল। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা হইল। যতদিন পরিধেয় বস্ত্রাদির সূতা উৎপাদনের যন্ত্র চরকা উৎপাদক শ্রমিক গ্রামবাসীর হাতে ছিল ততদিন শোষণ ও দারিদ্র্য ছিল না। যখনই সেই চরকা বৃহৎ কলের আকারে অনুৎপাদক ধনিক পুঁজিপতির হাতে গেল তখনই বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও শোষণের সৃষ্টি হইল। যতদিন বস্ত্র উৎপাদনের যন্ত্র তাঁত উৎপাদক তাঁতীর হাতে ছিল ততদিন দারিদ্র্য ও শোষণ ছিল না। যখনই সেই তাঁত বৃহৎ বস্ত্র-কলের আকারে অনুৎপাদক ধনিক পুঁজিপতির হাতে গেল তখনই গ্রামে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইল। যতদিন তৈল উৎপাদনের যন্ত্র ঘানি গ্রামীন তৈলশিল্পী কলুর হাতে ছিল ততদিন দারিদ্র্য ছিল না। যখনই তাহা বৃহৎ তৈলকলের আকার ধারণ করিয়া ধনিক কল-ওয়ালার কুক্ষিগত হইল তখনই গ্রামে বেকার ও দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। যতদিন ধান ভানার যন্ত্র ঢেঁকি গ্রামের বিধবা ও ক্ষুদ্র কৃষকের আয়ত্তে থাকিয়া তাহাদিগকে অবসর সময়ে কাজ দিত ততদিন গ্রামে এত অভাব ও সম্বলহীনতা ছিল না। যখনই ঢেঁকি ছোট-বড় চাউলকলের আকারে অনুৎপাদক ধনী ও মধ্যবিত্তের হাতে যাইতে আরম্ভ করিল, তখনই বিধবার চোখে উত্তপ্ত অশ্রু-জল দেখা দিল ও দরিদ্র কৃষকের হৃদয় ভগ্ন হইল। এইরূপে আরও বহুতর উদাহরণ যোগ করা যায়।

আমাদের দেশের অবস্থা কি? পল্লীশিল্প প্রায় সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বঞ্চিত শ্রমিক-শিল্পীদের খুব কম সংখ্যকেরই অন্য শিল্পক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের সুযোগ মিলিয়াছে। তাই গ্রাম্য শিল্পসমূহ যাহাদিগকে জীবিকা দান করিত, তাহারা অধিকাধিক ভাবে উত্তরোত্তর জমির উপর চাপ-বৃদ্ধি করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে। বিপরীত দিকে বহুতর চাষী-মালিক জমির মালিকত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং ক্রমশঃ দ্রুততর বেগে হারাইয়া ফেলিতেছে। জমি দ্রুতবেগে অল্প সংখ্যক অনুৎপাদক ধনীর হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। দেশের অন্যান্য ধনসম্পদও অল্প সংখ্যক ধনিক পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ফলে বেকার ও দরিদ্রের অবস্থা

চরমে উঠিয়াছে। বন্ধমূল দারিদ্র্য ও নিঃসম্বলতা গ্রামের সাধারণ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার অভাবজনিত দুর্ভিক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইতে চলিয়াছে।

### পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থা

ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার অবস্থা সব চাইতে শোচনীয়। ভূমি-রাজস্ব (ফ্লাউড্) কমিশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৪০ সালে অবিভক্ত বাংলায় ৩ একর পর্যন্ত জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা গ্রামের মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৫৭·২ ভাগ এবং ৩ একরের অধিক জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৪২·৮ ভাগ। উহার চার বৎসর পরে ১৯৪৪-৪৫ সালে ভূমি সম্বন্ধে বিস্তারিত তদন্তের জন্য মিঃ এইচ, এস, এম, ইশাকের অধ্যক্ষতায় যে কমিশন বসে (Agricultural statistics by plot to plot Enumeration) তাহার রিপোর্ট (যাহা ইশাক রিপোর্ট নামে খ্যাত) হইতে জানা যায় যে, এই কয় বৎসরে অবস্থা আরও বহু পরিমাণে খারাপের দিকে গিয়াছে। ৩ একরের কম জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৭৬·১ ভাগ এবং ৩ একরের বেশী জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা হইয়াছে শতকরা মাত্র ২৩·৯। অর্থাৎ কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে এবং তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইতেছে। কম বেশী জমি আছে এই ভিত্তিতে ইশাক রিপোর্টে গ্রামের পরিবারসমূহকে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' ও 'ঙ'—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ও তদনুসারে কৃষিজীবী পরিবারসমূহের প্রকৃত অবস্থা উহাতে বিবৃত করা হইয়াছে। এই জমি হইতেছে 'খাস' জমি অর্থাৎ যে জমি জমির মালিক নিজেরা, পরিবারের লোকজনের দ্বারা কিংবা মজুরের দ্বারা চাষ করে অথবা যাহা বর্গা বা ভাগপ্রথায় অথবা অস্থায়ী বিলি করিয়া চাষ করা হয়। উহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রামে 'ক' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ যাহাদের কোন জমি নাই—বাস্তুভিটা পর্যন্ত নাই অথবা কেবলমাত্র বাস্তুভিটাটুকু আছে) তাহাদের সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার ৩৬·৪ ভাগ; কিন্তু তাহাদের জমির পরিমাণ বাংলার মোট জমির শতকরা মাত্র ১·৮ ভাগ।

'খ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ বাস্তু ছাড়া যাহাদের এক একর পর্যন্ত জমি আছে) তাহাদের সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার ১৭·৭ ভাগ কিন্তু তাহাদের অধিকৃত জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৪·২ ভাগ। 'গ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ যাহাদের হাতে এক একরের বেশী জমি আছে কিন্তু ৩ একরের অধিক জমি নাই) এমন পরিবার সংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ এবং তাহাদের জমি মোট জমির শতকরা ১৬·৯ ভাগ। 'ঘ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ ৩ একরের অধিক কিন্তু ৫ একরের বেশী নয় এমন জমি আছে) তাহাদের সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৯·৬ ভাগ এবং তাহাদের জমির পরিমাণ শতকরা ১৪·৭ ভাগ। এবং 'ঙ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ যাহাদের ৫ একরের বেশী জমি আছে) তাহাদের সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার ১৪·৩ ভাগ; কিন্তু তাহাদের অধিকৃত জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৬২·৪ ভাগ। সুতরাং ১৯৪৪-৪৫ সালের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে শতকরা ৩৬·৪ পরিবারের হাতে মোট জমির শতকরা মাত্র ১·৮ ভাগ। অন্য দিকে মোট পরিবারের শতকরা ১৪·৩ ভাগের হাতে মোট জমির শতকরা ৬২·৪ ভাগ। অর্থাৎ অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হাতে জমি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। অন্যদিকে অধিকাংশ লোকের হয় জমি নাই অথবা জমি যদি বা থাকে তবে এক একরের বেশী জমি নাই। ইহা হইতে দুর্দশা ও সংকটের চরম অবস্থা সহজে অনুমান করা যায়।

উপরন্তু অধ্যাপক মহালনবীশ প্রভৃতি মনীষীগণ ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ভাবীফল সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (Survey of the after effects of the Bengal Famine in 1943) তাহা হইতে বাংলার দুর্দশার আরও ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে দুর্ভিক্ষের পূর্বে ১৯৩৪ সালে শতকরা ৩৬টি গ্রাম্য পরিবারের কোন ধানী জমি ছিল না। শতকরা ৪১টি পরিবারের মাত্র ২ একর পর্যন্ত জমি ছিল। শতকরা ১৫টি পরিবারের ২ একর হইতে ৫ একর পর্যন্ত এবং শতকরা ৮টি পরিবারের ৫ একরের উপর জমি ছিল। দুর্ভিক্ষের ফলে অবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটে। দুর্ভিক্ষের সময় ৯ লক্ষেরও অধিক পরিবার তাহাদের সমস্ত ধানী জমি বিক্রয় করিতে

বাধ্য হইয়া নিঃসম্বল হয় এবং জীবিকার একমাত্র বা প্রধানতম উপায় হারাইয়া বসে। ২½ লক্ষ পরিবার তাহাদের সমস্ত জমি-জমা বাস্তু-ভিটা পর্যন্ত হারাইয়া কৃষি মজুরে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের পূর্বে কৃষিমজুর পরিবারের মধ্যে শতকরা ১৬টি পরিবারের কিছু কিছু ধান জমি ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের শতকরা ১৩টি পরিবার তাহাদের যাহা কিছু জমি ছিল সবই খোয়াইয়া বসে। অন্যান্য শ্রেণীর কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যেও অনুরূপ দুর্দশা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহারা সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতির ন্যায় কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। সাধারণ অবস্থায় কৃষিজীবী সমাজে আর্থিক অবনতির যে সকল কারণ ক্রিয়া করিয়া আসিতেছিল ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ তাহারই চরম পরিণতি। অবিভক্ত বাংলার এই অবস্থা।

কিছুকাল পূর্বে (১৯৪৬-৪৭) গ্রামাঞ্চলের ঋণভার সম্পর্কে এক সরকারী তদন্ত (Survey of Rural Indebtedness in West Bengal হইয়াছিল, তাহাতে ঐ সময়ে কাহার কিরূপ ভূমি আছে তাহাও অনুসন্ধান করা হয়। তাহা হইতে অবস্থার আরও বেশী অবনতি হইতেছে, ইহা সূচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কৃষি শ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৯ সালে এক নমুনা তদন্তের ব্যবস্থা করেন। উহাতে বৃন্দাবনপুর নামক গ্রামে নমুনা তদন্ত করা হয় (The sample Enquiry into the village of Brindabanpur) তাহা হইতে জানা যায় যে অবস্থার আরও দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। বৃন্দাবনপুর গ্রামে মোট পরিবার সংখ্যা ছিল ১৪৯। তাহার মধ্যে ৭২টি অর্থাৎ শতকরা ৪৮·৩ ভাগ কৃষিজীবী পরিবার। অবশ্য ইহার মধ্যে ৫৮টি পরিবারকে জমি চাষ করিতে দেখা গিয়াছে। এই ৫৮টি পরিবারের মধ্যে (ক) ৪৪টি অর্থাৎ শতকরা ৭৫·৯ ভাগের ২ একরের কম জমি, (খ) ১২টি পরিবারের অর্থাৎ শতকরা ২০·৫৬ ভাগ পরিবারের ২ একর হইতে ৫ একর পর্যন্ত জমি এবং (গ) ২টি পরিবারের অর্থাৎ শতকরা ৩·৫ ভাগ পরিবারের ৫ একর হইতে ১০ একর পর্যন্ত জমি আছে। ১০ একরের বেশী কাহারও জমি নাই। অবশ্য একটি মাত্র গ্রামের পরি-সংখ্যানের দ্বারা সাধারণ অবস্থা

সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব না হইলেও উহার দ্বারা অবস্থার-গতি যে কোন দিকে যাইতেছে তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এক্ষণে ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টের সহিত ঋণভার তদন্ত ও বৃন্দাবনপুর গ্রামের নমুনা তদন্তের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। তাহা হইতে পশ্চিম বাংলার সংকটের গভীরতা সহজে উপলব্ধি করা যাইবে :—

| | ভূমি রাজস্ব কমিশন ১৯৩৯-৪০ (পশ্চিম বাংলার জন্য নির্দ্ধা-রিত হিসাব) | গ্রাম্য ঋণভার তদন্ত (পশ্চিম বাংলা) ১৯৪৬-৪৭ | বৃন্দাবনপুর গ্রামের নমুনা তদন্ত ১৯৪৯ |
|---|---|---|---|
| ২ একর পর্য্যন্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য পরিবারের শতকরা হিসাব | ৪১·১% | ৬৪·৭% | ৭৫·৯% |
| ২ হইতে ৫ একর পর্য্যন্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য পরিবারের শতকরা হিসাব | ২৯·১% | ১৮·৩% | ২০·৬% |
| ৫ হইতে ১০ একর পর্য্যন্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য পরিবারের শতকরা হিসাব | ১৯·৭% | ১০·৭% | ৩·৫% |
| ১০ একরের অতিরিক্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য পরিবারের শতকরা হিসাব | ১০·১% | ৬·৩% | |
| | ১০০% | ১০০% | ১০০% |

এই হিসাব ১৯৪৭ সালের পূর্বেকার। দেশ বিভাগের ফলে জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি জনিত দুর্মূল্যতা, বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য উপর্যুপরি কয়েক বৎসর অজন্মা ও প্রায় প্রতি বৎসর রাজ্যের অল্পাধিক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা ইত্যাদি কারণে পশ্চিম বাংলার দুর্দশা ও সংকট যে এক্ষণে চরমে পৌঁছিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পশ্চিম বাংলায় বর্গাদারদের সংখ্যাবৃদ্ধি উক্ত দারুণ দুর্দশার অন্যতম প্রমাণ। ছোট ছোট জমির মালিক ক্ষুদ্র কৃষক নিজেদের জোতজমি হারাইয়া অধিকাধিকভাবে ভাগচাষীতে পরিণত হইতেছে। ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট ও ইশাক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৪০ সালে শতকরা ২২·৬ ভাগ জমি ভাগচাষীর দ্বারা আবাদ হইত। কিন্তু ক্রমশঃ ভাগচাষীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উহা শতকরা ৩৭—এ দাঁড়ায়। পরবর্তী একটি সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভাগচাষ জমির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৪৬-৪৮ সালে উহা মোট জমির শতকরা ৩৮·২৬ ভাগ হয়। ১৯৫১ সালের লোক গণনার হিসাবে ভাগচাষ জমির পরিমাণ উহা অপেক্ষা কম বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু উহা প্রকৃত অবস্থার পরিচায়ক নহে। ভাগচাষীরা নিজেদিগকে ভাগচাষী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করে। উপরন্তু জমির মালিকেরা যাহারা ভাগ প্রথায় জমি চাষ করাইয়া থাকে তাহারা তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী আইন প্রণয়নের ভয়ে তাহাদের জমি যে ভাগ প্রথায় চাষ হয় তাহা লিপিবদ্ধ না করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও আরও একটি কারণ আছে। যাহারা নিজের জমি চাষ করে এবং উপরন্তু কিছু জমি ভাগে চাষ করে তাহাদিগকে ভাগচাষী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। সুন্দরবন প্রভৃতি বহু স্থানে যে দুরবস্থা চলিতেছে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী দ্রুতবেগে তাহাদের জমি খোয়াইয়া ভাগচাষীতে পরিণত হইতেছে। ইহাতে অনুমান করা ভুল হইবে না যে, বর্তমানে ভাগচাষ জমির পরিমাণ শতকরা ৪০-এ দাঁড়াইয়াছে। সাম্প্রতিক দুই একটি অনুসন্ধান হইতেও ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

১৯৩১ সালে পশ্চিম বাংলায় মোট জন সংখ্যার শতকরা ৫১·৪ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাহা বৃদ্ধি হইয়া ১৯৫১ সালে

শতকরা ৫৭·২১ দাঁড়াইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে কর্মী ও তাহার পোষ্যবর্গ দুইই আছে। কত কর্মীর উপর কত পোষ্য নির্ভর করে তাহা বিচার করিলে দুর্দশার আর একটি পরিমাপ করা যায়। ১৯৩১ সালে ৫৯ লক্ষ পোষ্য ৩৮ লক্ষ কর্মীর উপর নির্ভর করিত; কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটিয়া ১৯৫১ সালে দেখা যায় যে এক কোটির উপর লোক পোষ্য হিসাবে ৩৭ লক্ষ কর্মীর উপর নির্ভর করিতেছে। এই দিক দিয়াও বুঝা যায় যে, পশ্চিম বাংলার অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। যাহারা নিজের জমি নিজেরা চাষ করে, তাহাদের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে পশ্চিম বাংলার অবস্থার শোচনীয়তা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে যাহারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করে তাহাদের সংখ্যা পশ্চিম বাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩২·৩ ভাগ, উত্তর প্রদেশে ৬২·২ ভাগ, বিহারে ৫৫·২ ভাগ, উড়িষ্যায় ৫৯·৫ ভাগ, বোম্বাইএ ৪৩·৭ ভাগ ও মাদ্রাজে ৩৪·৯ ভাগ। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার অবস্থা সব চাইতে শোচনীয়।

গ্রামাঞ্চলের ঋণভার সম্পর্কে যে সরকারী অনুসন্ধানের কথা উপরে বলা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৫৬টি পরিবার ঋণগ্রস্ত। বিলাসে বা বিবাহ ইত্যাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য এই সব ঋণ করা হয় নাই। আশ্চর্যের কথা, প্রধানতঃ খাদ্য খরিদের জন্য এই সব ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে। দেনার গড়পড়তা শতকরা প্রায় ৪৯ ভাগ মাত্র খাদ্য ক্রয়ের জন্য। যাহাদের জমি আছে তাহাদের ক্ষেত্রেও দেনার প্রায় ৫৫ ভাগ খাদ্য খরিদের জন্য। আবার ঐ দেনা শোধ করা হইয়াছে সংসারের আয় হইতে নয়—জীবিকার একমাত্র সম্বল চাষের জমি বিক্রয় করিয়া। উপরন্তু পূর্বে যে স্থলে জমি বন্দক রাখিয়া ঋণগ্রহণ করা হইত, আজকাল সেই স্থলে জমি একেবারে সাফ বিক্রয় করিয়া ফেলা হইতেছে। ১৯৪০ সালে যত জমি বিক্রয় হয়, তাহার শতকরা ২৪ ভাগ জমি বন্দক দেওয়া হয়; কিন্তু ১৯৪৩ সালে দেনার জন্য জমি বন্দক দেওয়া কমিয়া গিয়া বিক্রয়ের শতকরা ১০ ভাগে দাঁড়ায়। ইহাতে জমি সাফ বিক্রয় করিয়া ফেলা যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে। উপরন্তু আজকাল পেশাদারী মহাজন ও জমিদার কর্তৃক গ্রামে ঋণদান করা বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। সেই স্থলে এক

শ্রেণীর ভূমিলোভী জোতদার ধান প্রভৃতি অসময়ে হাওলাত দিয়া বা টাকা ধার দিয়া উক্ত দেনার দায়ে চাষীদের ভূমি বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছে। জনসংখ্যার শতকরা ৩০·৩ ভাগ লোক নিজ জমির চাষী। তাহাদের ঋণকৃত দেনার পরিমাণ মোট ঋণের শতকরা ৪৭·৪ ভাগ। ইহার পর আসে কৃষি-শ্রমিক। তাহাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৬·৫ ভাগ এবং তাহাদের ঘাড়ে দেশের মোট ঋণের শতকরা ১১·৬ ভাগ চাপিয়া আছে। জোতদার ও ব্যবসায়ীর ঋণের পরিমাণ সব চাইতে কম। ইহাতে সাধারণ কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের দুর্দশার গভীরতা সূচিত হইতেছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে সরকারী তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গত দুই তিন বৎসর যাবৎ পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি জেলায় দলিল রেজেষ্টারীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আশ্চর্যের বিষয় রেজেষ্টারিকৃত দলিলের মধ্যে ভূমি বিক্রয়ের দলিল অন্য দলিলের অনুপাতে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধানতঃ খাদ্যশস্যাদি খরিদের জন্য ঐ সব জমি বিক্রয় করা হইতেছে। ইহাতে পশ্চিম বাংলার অবস্থা যে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কি আর বাকী থাকে?

### পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে দুর্দশার দৃশ্য

এই সকল পরিসংখ্যানের উপর বিচার করিলে মনে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে গ্রামের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাহা অপেক্ষা আরও ভয়াবহ চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। জমির ফসলে ভাগচাষীদের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, এ' সম্পর্কে কিছু আইনও প্রণীত হইয়া চালু হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এখনও বহু অঞ্চলে ভাগচাষীরা স্বেচ্ছায় জমির মালিককে ফসলের অর্ধাংশ তো দেয়ই, উপরন্তু বিঘা প্রতি ৭৲-৮৲-১০৲ টাকা পর্যন্ত জমির মালিককে নগদ দিয়া থাকে। উহাকে সেলামী বলা হইয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে নগদ না দিয়া স্বেচ্ছায় জমির মালিককে অর্ধাংশের অতিরিক্ত ফসল ভাগ দেওয়া হয়। সেই সব স্থানে আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা ফলবতী হয় না। কারণ সেই সব অঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা এত বেশী যে, তাহারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া গোপনে

জমির মালিককে অতিরিক্ত ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়া জমি লইয়া থাকে। তাহারা লাভ-ক্ষতির দিকে লক্ষ্য করে না। চাষ করিয়া যে তাহার ক্ষতি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি জমি চাষ করিবার জন্য তাহার এরূপ দুর্দমনীয় আগ্রহ ও ব্যাকুলতা!

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে—ফসল স্বাভাবিক হউক বা কম হউক গ্রামের একাংশ লোকের মধ্যে প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষের অবস্থা আসিবেই। ইহারা হইতেছে ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত-মজুর। ইহা ছাড়া ৫।৭ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকও আছে। ফসল হইবার পর ৪।৫ মাসের মধ্যে তাহাদের গৃহে আর কিছু থাকে না। পুরা কাজও পায় না। সরকার হইতে সস্তা দামে খাদ্যশস্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলেও তাহাদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকে না। তাই পশ্চিম বাংলায় কয়েক বৎসর যাবৎ যে দুর্ভিক্ষ হইতেছে তাহা মাত্র খাদ্যশস্যের দুর্ভিক্ষ নহে—উহা প্রধানতঃ ক্রয় ক্ষমতার দুর্ভিক্ষ। ক্রমশঃ ঐ অবস্থা ব্যাপকতর ও গভীরতর হইতেছে। শুধু তাহাই নহে। ধরুন—দুর্ভিক্ষের অবস্থা নাই, স্বাভাবিক অবস্থা। আমন ধান্যের অঞ্চল। আশ্বিন-কার্তিক মাস। কোন এক গ্রামে গেলেন। চাষী গ্রাম। দেখিবেন—সন্ধ্যায় গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ বাড়ীতে চুল্লীতে আগুন জ্বলিবে না। গ্রামের লোক রাত্রে (৮।৯টার সময়) কোথাও সমবেত হইল। আপনি গ্রামের লোকের পরিচিত। শুষ্ক মুখ দেখিয়া কাহাকেও আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, খাওয়া হ'য়ে গেছে কি?" শুষ্ক মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিবে—"হ্যাঁ"। কিন্তু বাস্তবিক সে বেলা তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। এরূপে বৎসরের পর বৎসর তাহাকে অন্ততঃ ৩।৪ মাস একবেলা-একসন্ধ্যা খাইয়া থাকিতে হয়। এরূপ বহু শুষ্ক মুখ গ্রামে ঐ সময় দেখিতে পাইবেন। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই সব কথা বলিতেছি। বিনোবাজী এক সংস্কৃত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"বুভুক্ষুমানঃ রুদ্ররূপেন অবতিষ্ঠতে" অর্থাৎ ক্ষুধার্তের রুদ্র-মূর্তি। কিন্তু এখানকার দরিদ্র ক্ষুধার্তরা কেমন শান্ত। তাহার এক মুখ আছে বটে কিন্তু কাজ করিবার জন্য দুই হাতও আছে—কর্মক্ষম—বলিষ্ঠ। কাজ করিতে প্রস্তুত; অথচ কাজ পায় না। তাই অনাহারে থাকিতে হয়।

বিদ্রোহাগ্নি তো জ্বলিবার কথা! কিন্তু খাইতে পায় না—সেজন্য অপরাধ যেন তাহারই, এইভাবে সে জীবন ধারণ করিয়া আছে। ধনীরা আর কত-দিন তাহাদিগকে অনাহারে রাখিবেন? এখানে বিনোবাজীর এক মহতী বাণী স্মৃতিপটে উদিত হয়। "'অন্নে সমস্য যদসন মনীষাঃ' আমরা যদি এক গ্রাসও অন্ন গ্রহণ করি তবে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে উহার মধ্যে সকলেরই বাসনা নিহিত রহিয়াছে। এইজন্য সকলকে খাওয়াইয়া তবে নিজে খাইবে। তবেই খাদ্য হজম হইবে। ধনীদের ভাল হজম হয় না—কেন না তাঁহারা যাহা খাইয়া থাকেন তাহার উপর সকলের বাসনা পড়িয়া রহিয়াছে।" গ্রামের শিল্প আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। সবই তাহার কাছ হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। শেষ যাইতে বসিয়াছে—ঢেঁকি। যতই ভূমি ধনীর হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, ততই ঢেঁকির সর্বনাশ ঘটিতেছে। ধনীর গোলায় শত শত মণ, হাজার হাজার মণ ধান থাকে। সে তাহা কলওয়ালাকে বিক্রয় করিয়া দেয়। তাহার ধান ঢেঁকিওয়ালাকে দিয়া চাউল তৈয়ারী করাইয়া চাউল বিক্রয় করিবে না—সে ধানই বিক্রয় করিবে এবং তাহা কলওয়ালাকেই বিক্রয় করিবে। গ্রামের ঢেঁকিওয়ালাকে সে খুচরা বিক্রয় করিতে চাহে না। তাহার উপর এখন গ্রামে গ্রামে হাস্কিং মেশিন বা ছোট চাউল কল বসিয়া ঢেঁকির সর্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে সহর ও শিল্পাঞ্চলে বড় বড় চাউল কল ছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য যে চাউল প্রয়োজন হইত তাহা ঢেঁকিতেই প্রস্তুত হইত। এখন হাস্কিং মেশিন বসিয়া তাহা নষ্ট হইয়া গেল। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় ২৪ শত লাইসেন্সপ্রাপ্ত হাস্কিং মেশিন ও লাইসেন্স নাই এমন ১২ শত হাস্কিং মেশিন মোট ৩৬ শত হাস্কিং মেশিন চলিতেছে। বৎসরে ৩০০ দিন কাজ চলে ও দৈনিক গড়ে ৩০ মণ করিয়া ধান ভানে—এই হিসাবে বৎসরে অল্পাধিক ২½ কোটি টাকার আয় হইতে ঢেঁকি অর্থাৎ দেশের দরিদ্র সাধারণ বঞ্চিত হইতেছে। ইহা ভাবিলে হৃৎকম্প আসে। গ্রামাঞ্চলের যাঁহারা গণ্য-মান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাদের অনেকেই এইসব হাস্কিং মেশিন স্থাপন করিয়া গরীবের শেষ সম্বলটুকু কাড়িয়া লইতেছেন। ইংরাজ রাজত্বের সময়ে বৃহৎ কল আমাদের প্রায় সব কাড়িয়া লইয়াছিল, অবশিষ্ট ছিল—ঢেঁকি। দেশ

স্বাধীন হইবার পর স্বাধীন দেশই তাহার সর্বনাশ সাধন করিল। এ কলঙ্ক কাহিনী চিরতরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ থাকিবে।

**দরিদ্র চায় জমি**

বলা হয়—গ্রামের বহু দরিদ্র অলস ও কর্মবিমুখ। তাহাদিগের মধ্যে গৃহশিল্প প্রচলন করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়া বিফল হইতে হইয়াছে। ইহা সঠিক উক্তি নয়। তবে ইহা সম্পূর্ণ অসত্য—তাহাও নয়। প্রথমে গৃহ-শিল্প তাহাকে দিলে সে তাহা অন্তরের সহিত গ্রহণ করে না। কিন্তু তাহাকে জমি দাও, সে পাগলপ্রায় হইয়া ছুটিয়া আসিবে। কারণ সে প্রথমে চায় জমি। ভূমি সমস্যা প্রথমে সমাধান করিতে পারিলে আর সব কর্ম-প্রচেষ্টা সফল হইবে। নচেৎ সবই ডুবিবে। দরিদ্রের মধ্যে যে কিছুটা আলস্য আসিয়াছে, তাহা সত্য। কিন্তু তাহার জন্য সে দায়ী নহে। Enforced idlene-s বহু দিন চলিলে অর্থাৎ বাধ্যতামূলকভাবে বহু দিন কর্মহীন হইয়া থাকিতে হইলে ক্রমে তাহা কর্মবিমুখতা ও অভ্যাসগত অলসতায় পরিণত হয়। আমাদের গ্রামের দরিদ্রের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। তবে জমি চাষ করিতে তাহার আলস্য থাকিবে না; কিন্তু সে জমি তাহার নিজের করিয়া পাওয়া চাই।

**বেকার সমস্যার স্বরূপ**

আজকাল পত্রিকাদি ও লোকমুখে বেকার সমস্যার কথা প্রায়ই আলোচিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের আলোচ্য ঐসব বেকার কাহারা? যে অনশনক্লিষ্ট বা অর্ধাশনক্লিষ্ট মরণোন্মুখ কোটী কোটী দরিদ্র ভূমিহীনের কথা আমরা আলোচনা করিলাম এ তাহারা নহে। তাঁহাদের আলোচ্য বেকার হইতেছে—শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বেকার অথবা যাহারা কলকারখানায় কাজ করে কিন্তু সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত হইয়াছে তাহারা। উহাদের বেকারত্ব ঘুচাইতে হইবে এবং উহা দেশের এক সমস্যা—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের বেকার সমস্যা হিসাবে মাত্র তাহাদিগকেই দেশ বা জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরা বিভ্রান্তিকর। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনায়

তাহা সরকারী হউক আর বে-সরকারী হউক, ঐ সব কোটী কোটী ভূমিহীন দরিদ্রের স্থান থাকে না। যদি বা থাকে তবে তাহা নিতান্ত গৌণভাবে থাকে। তাই যাহা দেশের সব চাইতে জরুরী সমস্যা তাহা আজ সাধারণ শিক্ষিত সমাজের ও সরকারের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যাইতেছে—ইহা অদৃষ্টের পরিহাস। বিনোবাজী তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"যদি সর্বাত্মক পরিকল্পনা করা সম্ভব না হয় এবং যদি আংশিক পরিকল্পনাই (প্লানিং) করিতে হয় তবে ঐ সব কোটী কোটী দরিদ্রের স্থান তাহাতে অগ্রগণ্য হওয়া আবশ্যক।" ইহার কারণ কি? কারণ উহারাই দেশের সব চাইতে নিম্নস্তরের, উহারাই সব চাইতে দরিদ্র, সব চাইতে নিঃসম্বল ও অসহায়। এস্থলে মহামতি মার্কসের একটি কথা উল্লেখ করিতে চাই। তিনি সেই কালে ও সেই দেশে যাহাদেরই লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিয়া থাকুন না কেন আজ ঐ উক্তিতে এই সব অসহায় মরণযাত্রী ভূমিহীন দরিদ্রদের চিত্র ফুটিয়া উঠে :— "The forest of uplifted arms demanding work becomes ever thicker, while the arms themselves become ever thinner" অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের কাজের দাবীতে ঊর্ধ্বপ্রসারিত হস্তের সংখ্যা অনবরত বাড়িয়া চলিয়া ঐ সব প্রসারিত হস্তের বন যতই নিবিড়তর হইতেছে ততই ঐ সব কর্মহীন হস্ত নিরন্তর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। তাই আজ তাহাদেরই কল্যাণ ব্যবস্থার কষ্টিপাথরে সব কিছুকে যাচাই করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এক নিরুপম বাণী মানসপটে উদিত হয়।

'I will give you a talisman. Whenever you are in doubt ............apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain something by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions?"

"আমি আপনাকে একটি মন্ত্রপূত কবচ দিব। যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ হইবে তখনই এই পরীক্ষাটি প্রয়োগ করিবেন। নিজে দেখিয়াছেন এমন সব

চাইতে দরিদ্র, সব চাইতে অসহায় লোকের মুখ নিজের স্মৃতিপটে আনিবেন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে আপনি যে ব্যবস্থা করিতে যাইতেছেন, তাহাতে তাহার কোন উপকার হইবে কি না! ইহার দ্বারা সে কি লাভবান হইবে? ইহাতে কি সে নিজের জীবনযাত্রা ও ভাগ্যের উপর আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবে? অর্থাৎ ইহাতে কি ক্ষুধার্ত ও আধ্যাত্মিকতার আলোকবঞ্চিত কোটী কোটী লোকের স্বরাজ আসিবে?"

এই দৃষ্টিতে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন যে প্রকৃষ্টতম ব্যবস্থা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

**দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানের উপায়**

কিরূপে এই দারিদ্র্য, শোষণ ও অসহনীয় ধনবৈষম্য দূরীভূত হইবে? ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা কি? ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে—যে যে কারণে দারিদ্র্য ও শোষণের সৃষ্টি হইয়াছে সেই সেই কারণ দূরীভূত করা। অর্থাৎ উৎপাদনের মৌলিক সাধন ভূমিকে অনুৎপাদক ধনীর হাত হইতে দরিদ্র ভূমি-হীনকে ফিরাইয়া দেওয়া—ভূমির সংগত বণ্টন করিয়া দেওয়া। উপরন্তু উৎপাদনের যন্ত্র গ্রামের শ্রমিক-শিল্পীকে ফিরাইয়া দেওয়া। অনেকে মনে করেন—অন্য কাজ দিয়া দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অনেকের ধারণা—যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান করা যাইবে। ইংলণ্ড বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে ধনশালী হইয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার বৃহৎ যন্ত্রজাত পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য ইংলণ্ডের বিশ-পঁচিশ গুণ পরিমিত ভূখণ্ডকে বলপ্রয়োগে তাহার পদানত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। তবেই সে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্য বিক্রয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। আজ কি তাহা সম্ভব? ভারতকে যদি বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে তাহার দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তবে খরিদ্দারের অন্বেষণের জন্য তাহাকে মংগল আদি গ্রহে যাইতে হইবে। এই যুগে এ' পৃথিবীর কোথাও তাহার পণ্য বিক্রয় করিবার স্থান বা সুযোগ হইবে না। আমেরিকার ভূমি বণ্টন করিলে সেখানকার জনসংখ্যার মাথাপিছু ২৫ একর করিয়া পড়িবে। উপরন্তু অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সে পাইয়াছে। রুশিয়ার জনসংখ্যা ও

ভূমির পরিমাণ যেরূপ তাহাতে তাহারও ভূমিসমস্যা নাই। অস্ট্রেলিয়া ভারতের তুলনায় বহু বৃহৎ দেশ—তাহার লোক সংখ্যা এখনও এক কোটীতে উঠে নাই। ভারতের লোক সংখ্যা ৩৬ কোটী। কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩০ কোটী একর। মাথাপিছু ১ একর ভূমিও নাই। পশ্চিম বাংলার কর্ষিত ও কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ১ কোটী ৪০ লক্ষ একর এরূপ হইবে; লোক সংখ্যা ২ই কোটী—তাহার উপর নবাগত উদ্বাস্তু। মাথাপিছু ২ বিঘা করিয়া জমিও পড়ে না। জমি ভিন্ন জীবিকার অন্য কোন উপায় আর গ্রামে অবশিষ্ট নাই। ভারত উদ্যম করিলেও তাহার জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আমেরিকার বা ইংলণ্ডের জনসাধারণের মত উন্নীত করিতে কখনও সমর্থ হইবে না। ভারত যদি ঠিক পথে চলা শিক্ষা করে তবে সে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করিয়া সকলের জন্য স্বচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবে মাত্র। অন্যদিকে ভারত যদি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পদাঙ্কানুসরণ করিতে অগ্রসর হয় তবে সে আরও কতিপয় ধনকুবের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে বটে কিন্তু জনগণের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূর করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবে না—বরং উত্তরোত্তর সে অতল জলে ডুবিবে। বিনোবাজী বলিয়াছেন —"আমি তো প্লানিং কমিশনকে এই কথা বলিয়া দিয়াছি, যদি আপনারা দেশের সব লোকের জন্য প্লানিং করিতে সমর্থ না হ'ন এবং মাত্র আংশিক প্লানিং করেন তবে সে আংশিক প্লানিং গরীবের জন্য করুন। এই প্রসঙ্গে আমি রাজাজীর উদাহরণ দিতে চাই। রাজাজীর মত প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ যদি না থাকিতেন তবে মাদ্রাজে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা যায়। তিনি গরীবদের দৃষ্টিকেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কণ্ট্রোল উঠাইয়া দিয়াছেন এবং সব চাইতে তাঁহার বড় কাজ এই যে তিনি এখন তাঁতীদের সমস্যার কথা উঠাইয়া তাহাদের হিতের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছেন। আমি প্লানিং কমিশনকে এই কথা বলিয়া দিয়াছি যে, যদি বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে সব লোকের বেকার সমস্যা দূর করা যায় তবে আমি আমার চরকা জ্বালাইয়া দিব। পরন্তু আমি জানি যে, গ্রাম্য শিল্প ভিন্ন এই সমস্যা সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব নয়।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"লোকে বলে, জমি কোথা হইতে দিব? তাঁহারা অন্য

কাজ দিবার কথা বলেন। এ কথার কোন মূল্য নাই। অন্য কাজ দিবার আপনি কে? মায়ের কোল হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া অন্য কি কাজ আছে যাহা তাহাকে দিতে পারেন? গ্রাম্য শিল্পগুলিও তো তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে ও হইতেছে; তাঁতীর কাজ তো বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; এর পরে তাহাকে অন্য কি কাজ দিবেন? জমি তো এক বুনিয়াদী চাহিদা? জমি পঞ্চভূতের মধ্যে অন্যতম। উহা দিতে আপনি অস্বীকার করিতে পারেন না।" ভারতকে তাহার নিজের অবস্থা ও সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। জমির সঙ্গত বণ্টন হইলেও তাহাতেই গ্রামবাসীদের চলিবে না। গ্রাম্য পরিবার মোটামুটি ৫ একর করিয়া জমি পাইলেও তাহাতে তাহার স্বচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা চলিবে না। পশ্চিম বাংলায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ যেরূপ তাহাতে পাঁচজনের পরিবার পিছু ৫ একর করিয়া জমি দেওয়া চলিবে না। সুতরাং তাহার জন্য অন্য কিছু উপজীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একমাত্র গ্রাম্য শিল্পের দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে। বর্তমান অবস্থায় যে যে শিল্প কুটিরশিল্প স্বরূপ চালু করা সম্ভব, তাহারই ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করিতে হইবে। খাদ্য ও পরিধেয় এবং বাসগৃহের সরঞ্জাম যাহা গ্রামে প্রস্তুত করা সম্ভব তাহা গ্রাম্য শিল্পের দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যে সব কাঁচামাল গ্রামে উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে উৎপন্ন যে সব পাকা মাল ঐ গ্রামেরই প্রয়োজন, তাহা উৎপাদন করিবার ব্যবস্থাও গ্রাম্যশিল্পের দ্বারা করিতে হইবে। আজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি বিকারগ্রস্ত। আজ সে বৃহৎ শিল্প যন্ত্রের উন্নতি সাধনে উন্মত্ত। এ'দেশের কোন বৈজ্ঞানিক অন্য কথা দূরে থাকুক—ঢেঁকিতে 'বল-বেয়ারিং' বা অন্য সহজ সরল কিছু লাগাইয়া উহার ব্যবহার বা কাজ কম শ্রমসাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? আজ বৈজ্ঞানিককে গ্রাম্য শিল্পযন্ত্রের উন্নতি সাধনে জরুরীভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। হিংসার সহিত বিজ্ঞানের অবৈধ মিলন ঘটিয়াছে, তাই আজ জগৎ ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। বিজ্ঞান যদি জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে চায় তবে অহিংসার সহিত বিজ্ঞানের পরিণয় হওয়া চাই। গ্রাম্য শিল্পে উৎপন্ন খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতির মূল্য মিলজাত দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় অধিক হইলেও সমগ্র দৃষ্টিতে বা সারা

দেশের কল্যাণের দৃষ্টিতে সহরবাসীকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামকে দরিদ্র ও বেকার রাখিয়া মিলজাত সস্তা মালের দিকে ধাবিত হইলে চলিবে না। সহর গ্রামকে শোষণ করিবার জন্য নহে; পরন্তু গ্রামকে সেবা করিবার জন্যই থাকিবে।

**কর্তৃত্ব বিভাজন**

কিন্তু এই সংকল্প বা কাম্য সার্থক করিয়া তুলিবার উপায় কি? অর্থাৎ গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গ্রাম্য শিল্পকে তাহার যথাযোগ্য স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় কি? জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদি সরকার দণ্ডশক্তির সাহায্যে গ্রাম্য শিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন তবে ভাল কথা। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব করা যাইবে? ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য 'জনশক্তি' নির্মাণের বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। যদি তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকি, তবে দণ্ডশক্তি-নিরপেক্ষভাবে কিরূপে গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সমাজে বিচার-বোধ জাগ্রত করিয়া ঐ সম্পর্কে সমাজ-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাই হইবে সর্বোদয়-সেবকদের কাজ। খাদি প্রভৃতি রচনাত্মক কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সেই বিচার-বোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ভূদানযজ্ঞ পূর্ণ হইলে তবে ঐ সব রচনাত্মক কার্যক্রম সফল করা সহজসাধ্য হইবে। সমাজে ব্যাপকভাবে বিচার-বোধ জাগ্রত হইলে সেই বিচার-বুদ্ধি প্রাণোদিত হইয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াকে বিনোবাজী 'বিচার-শাসন' বলিয়াছেন। জন-শক্তি কার্যকরী করার জন্য বিচার-শাসন প্রধান উপায়। গৃহশিল্পের ক্ষেত্রেও ঐরূপ। কিন্তু গ্রাম্যশিল্প প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কেবলমাত্র বিচার-শাসনের দ্বারা কাজে পূর্ণ সফলতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। মনে করুন, কোন এক গ্রাম বা অঞ্চল বিচারবুদ্ধি প্রাণোদিত হইয়া কেবলমাত্র ঘানির তৈল ব্যবহার করিতে চাহিল এবং গ্রামের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘানি গ্রামের মধ্যে চালাইতে চাহিল। কিন্তু বাহির হইতে গ্রামের মধ্যে কলের তৈল

আসা বন্ধ হইল না। তাহাতে গ্রামের সংকল্প সিদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং গ্রামের এই অধিকার থাকা চাই যে, গ্রামের মধ্যে কোন্ জিনিস প্রবেশ করিতে পারিবে ও কোন্ জিনিস প্রবেশ করিতে পারিবে না—তাহা গ্রামই স্থির করিতে পারিবে। তাহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে তৎ তৎ জিনিসের প্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে। অতএব জনশক্তি কার্যকরী করার দ্বিতীয় উপায় হইতেছে—কর্তৃত্ব-বিভাজন। যতদিন সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাকিবে ও গ্রামে গ্রামে এই শক্তি বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া দেওয়া না হইবে ততদিন প্রকৃত 'গ্রাম রাজ' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। তাই বিনোবাজী বলেন যে—"বিচার-শাসন ও কর্তৃত্ব-বিভাজন—জনশক্তির এই দুই হাতিয়ার। অতএব আমরা এই ক্ষমতা চাহিতেছি যে, যদি কোন গ্রামের লোক এই চাহে যে 'আমরা গ্রামের মধ্যে বাহিরের মাল আসিতে দিব না' তবে গ্রামের সেই অধিকার থাকা চাই। যদি কোন গ্রাম বা অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইহা স্থির করেন যে, সেই অঞ্চলে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহা চাউল কলের জন্য চালান দেওয়া হইবে না ও কলের চাউল সেই অঞ্চলে আসিতে পারিবে না, তবে গ্রামের সেই অধিকার থাকা চাই ও সেই অধিকারকে কার্যকরী করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকা চাই। যদি সরকার তাহা মানিয়া লন তবে অহিংসার পক্ষে তাহা অনুকূল হইবে; কিন্তু যদি তাহা না করেন তবে উপায় কি? সে সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"সরকার যদি তাহা স্বীকার না করেন তবে আমরা জনসাধারণের কাছে গিয়া বলিব যে এই স্বরাজ্য আসল স্বরাজ্য নহে। সে ক্ষেত্রে আমরা ঐরূপ চাহিতে থাকিব ও সরকার উহার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আমরা উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইব।" বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন যে—"যখন আমরা এই কথা (কর্তৃত্ব-বিভাজন) বলি তখন কর্তৃপক্ষ বলেন যে, এইভাবে এক বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে ছোট রাষ্ট্র থাকা চলিতে পারে না। তাহাতে আমি ইহা বলিতে চাহি যে, যদি আমরা ক্ষমতার বিভাজন না করি, কর্তৃত্বের বিভাজন না করি তবে সেনাবল অনিবার্য—ইহা বুঝিয়া লউন। তাইতো সেনা ছাড়া আজ চলিতেছে না এবং কখনও চলিবে না। অতএব চিরদিনের জন্য ইহা স্থির করুন যে সেনা-বলের দ্বারা কাজ চালাইবেন ও সেনা সুসজ্জিত রাখিবেন, এবং একথা আর কখনও বলিবেন না যে আমরা

একদিন না একদিন সৈন্যবলের প্রয়োজন হইতে মুক্ত হইতে চাই। যদি কোনও দিন সৈন্য ছাড়িয়া দিতে চান তবে পরমেশ্বর যেরূপ করিয়াছেন আমাদেরও সেরূপ করিতে হইবে। পরমেশ্বর বুদ্ধির বিভাজন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেককে তিনি বুদ্ধি দিয়াছেন—বৃশ্চিককেও দিয়াছেন,সর্পকেও দিয়াছেন, ব্যাঘ্রকেও দিয়াছেন এবং মনুষ্যকেও দিয়াছেন। কমবেশী দিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যেককেই বুদ্ধি দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে তোমরা নিজ নিজ জীবনের কাজ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে কর। তাই সারা পৃথিবী এমন উত্তমভাবে চলিতেছে যে, তিনি বিশ্রাম লইতে পারেন এবং এতদূর বিশ্রাম লইতেছেন যে, লোকের সন্দেহও হয় যে পরমেশ্বর আছেন কি নাই? আমাদের রাষ্ট্রও এমনভাবে চলা চাই যাহাতে শঙ্কা আসে যে রাষ্ট্রশক্তি আদৌ আছে কি নাই? লোকে যখন বলিবে যে ভারতে বোধ হয় কোন রাষ্ট্রশক্তি নাই তখন বুঝিতে হইবে যে আমাদের রাজ্যশাসন অহিংসক হইয়াছে। এইজন্য আমরা গ্রাম-রাজ্যের কথা বলিয়া থাকি এবং এইজন্য আমরা চাই যে গ্রামেরই নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা হউক অর্থাৎ গ্রামের লোক নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা নিজের হাতে লউক। জনশক্তি সম্পর্কে ইহাও এক প্রশ্ন উঠিয়াছে যে গ্রাম-বাসীরা নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যদি ইহা স্থির করে যে, অমুক মাল আমরা উৎপাদন করিব এবং তাহারা সরকারের নিকট চাহে যে, অমুক মাল এখানে আসিতে দেওয়া হইবে না এবং উহার আসা বন্ধ করা হউক এবং যদি সরকার তাহা বন্ধ না করেন অর্থাৎ বন্ধ করিতে না পারেন, বন্ধ করিতে চাহিলেও যদি বন্ধ করিতে না পারেন তবে উহার বিরোধীতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার সাহস করিতে হইবে।”

**ভূদানযজ্ঞ—প্রেমের পথ**

অন্য দেশে হিংসার পথে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা হইয়াছে। ভূদানযজ্ঞে প্রেমের পথে সেই বৈষম্য দূর করা হইবে। ধনীর ধনিকত্ব দূর করা এবং গরীবের গরীবত্ব দূর করা—ইহাই ভগবানের প্রেমের রীতি। এই প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—“ভগবান সকলকে সমান করিতে চান। উহা তাঁহার প্রেম—দ্বেষ নহে। আমার কাজ ভগবানের। আমি

বড়োর অহংকার দূর করিতে চাই এবং ছোটকে উঁচুতে উঠাইতে চাই। বড়োর নিকট হইতে জমি লইয়া ভূমিহীন দরিদ্রকে জীবিকার জন্য দিতে চাই। ইহাতে এরূপ ভাবা ঠিক নহে যে, বড়োদের সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে। আমি তো তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছি। তাঁহাদের নিকট হইতে জমি লইয়া গরীবদের পবিত্র প্রেম তাঁহাদিগকে দেওয়াইতে চাহিতেছি। সমাজে বৈষম্য রহিয়াছে বলিয়া ধনী ও দরিদ্র উভয়ের অনিষ্ট হইতেছে ও সব মিলিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে। অন্য দেশে এই বৈষম্য দূর করিতে গিয়া ধনীদের হত্যা করা হইয়াছে। রুশিয়ায় হাজার হাজার ধনীকে হত্যা করা হইয়াছে ও তেলেঙ্গনাতে শত শত ধনীকে খুন করা হইয়াছে। বিনা হত্যায় ও বিনা খুন জখমে আমি ভারতে এই কার্য সাধন করিতে চাহিতেছি। আমার কাজ প্রেমের পথে হইবে। ভগবানের ইচ্ছা এই যে, সুখ এবং দুঃখ উভয়কে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লই। যদি সকলে নিজ নিজ স্বার্থের কথা চিন্তা করে এবং প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার না করে তাহা হইলে **এইরূপ** গ্রাম গ্রামই নহে—উহা শ্মশান—উহা জঙ্গল।"

### ভূমি সমস্যা সমাধানে অহিংস-পথের বিচার

মানুষকে বিচার বুঝাইলে সে বুঝিতে পারিবে এবং যখন সে তাহা বুঝিবে তখন সে তদনুযায়ী আচরণ ও কার্য করিবে। এই বিশ্বাসই অহিংসার ভিত্তি। মানুষ পশু নয়। পশুকে বিচার বুঝাইলে সে তাহা বুঝে না। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এইখানেই। পশুকে ভগবান স্বাধীন বোধশক্তি দেন নাই। মানুষকে তিনি তাহা দিয়াছেন। পশুকে ভগবান যেটুকু বুদ্ধি ও চেতনা দিয়াছেন তদনুসারে সে আচরণ করিবে—তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক। কিন্তু মানুষকে তিনি অপরিমিত বোধ-শক্তি দিয়াছেন। এই বোধশক্তির মধ্যে আত্মজ্ঞানের শক্তিও নিহিত। মানুষ তাহার আত্মজ্ঞানকে অনন্ত গুণ বিকশিত করিতে পারে। নিজেকে আপন দেহে সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবা আত্মজ্ঞানের সব চাইতে সংকুচিত অবস্থা। সারা জগতকে—সারা সৃষ্টিকে নিজেরই বিস্তার বলিয়া গ্রহণ করা হইল আত্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। আত্মজ্ঞান যতই বিকশিত হইবে ততই হৃদয়ে প্রেমের

বিকাশ হইবে এবং ততই জীবন প্রেমময় হইবে। এই প্রেমের শক্তিতে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত হয়। আবার জীবন যতই প্রেমময় হইতে থাকিবে আত্মজ্ঞানের বিকাশসাধন ততই সহজ হইবে। তাই প্রেমকে জীবনের মূল তত্ত্ব বলা হয়। আত্মজ্ঞানের বিকাশ তথা প্রেমের বিকাশ সাধনই ভূদানযজ্ঞের মূল তত্ত্ব।

অহিংসার পথে ভূমিসমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব কি? ধনীর হৃদয় পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কি? বিনোবাজী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজমান এবং আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার নিয়মন তিনিই করিয়া থাকেন এবং সারা প্রেরণা তিনিই দান করিয়া থাকেন তবে আমার বিশ্বাস এই যে তাঁহাদের (সকলের) হৃদয় পরিবর্তন করিতে পারা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। যদি কালাত্মা দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন এবং তিনি পরিবর্তন করাইতে চাহেন তবে পরিবর্তন নিশ্চয় হইবে। মানুষ চাহুক বা নাই চাহুক যখন মানুষ প্রবাহের মধ্যে পড়ে তখন তাহার নিজের তরিবার শক্তি কোন কাজে আসে না—তখন প্রবাহের শক্তিই কার্যকরী হয়। সেইরূপ মনুষ্য-হৃদয়ে পরিবর্তন আনাইবার জন্য কালপ্রবাহ সহায়করূপে ক্রিয়াশীল হয়। আজ তো সকলের ভূমি উত্তপ্ত হইয়া আছে। এই উত্তপ্ত ভূমির উপর দুই বিন্দু প্রেম-বারি সিঞ্চন করিবার কাজ ভগবান আমার দ্বারা যদি করাইয়া লইতে চান তবে আমি তাহা আনন্দের সহিত করিব।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে—"লোকে জিজ্ঞাসা করে, প্রেমের পথে—অহিংসার পথে সফলতা পাওয়া সম্ভব কি? যাহাদের সারা জীবন পরিবার পরিজনের স্নেহ-প্রীতির মধ্যে অতিবাহিত হয়, তাঁহারা প্রেমের শক্তির প্রতি কেমন করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন তাহাই আমার কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের জীবনই তো প্রেমময়। প্রেমই জীবনের মূল তত্ত্ব—যেমন সত্য জীবনের মূল তত্ত্ব। আসল কথা এই যে কেহই দুর্জ্জন নহেন। যাঁহাকে আমরা দুর্জ্জন বলি তিনি দুর্জ্জনতার প্রবাহে অগতিকভাবে বাহিত হইতে থাকেন এবং এই জন্যই তাঁহার মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সদ্‌গুণ আত্মায় বিদ্যমান—এই জন্য উহা

পরিবর্তনশীল। সত্য এবং আলো ভাবরূপ; অসত্য এবং অধিকার অভাব-রূপ। আলোর সম্মুখে অন্ধকার টিঁকিতে পারে না।"

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভূদানযজ্ঞে এ যাবৎ ৩৩ লক্ষ একরের অধিক ভূমি পাওয়া গিয়াছে। সমস্যার তুলনায় কম হইলেও ভূমিবানেরা এত অল্প সময়ে নিঃস্বার্থভাবে এত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রেমভরে ভূদানযজ্ঞে অর্পণ করিয়াছেন ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার। জগতে বা এই দেশে ভূমি-দান নূতন নয়; চিরদিনই মানুষ ভূমিদান করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু লোকে এতদিন যে ভূমিদান করিয়াছেন তাহা এই মনোভাব হইতে করিয়াছেন যে, ভূমি তাঁহাদেরই অর্থাৎ ভূমির মালিক তাঁহারাই। এবং সেই ভূমি দান করা হইয়াছে—মন্দিরকে, মসজিদকে বা কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে। 'ভূমি ভগবানের। ভূমি সকলের। ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি—এই বোধ বিসর্জন দিয়া দরিদ্র ভূমিহীনের জন্য ভূমিদান করা কর্তব্য। দরিদ্র ভূমিহীনকে তাহার অধিকার প্রত্যর্পণ করা কর্তব্য।' এই আবেদনে সাড়া দিয়া দরিদ্র ভূমিহীনের জন্য ভূমিদান জগতে এই প্রথম। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ বিপ্লবাত্মক দানে এত ভূমি সংগৃহীত হওয়াতে অহিংস পন্থার সফলতার ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ভূমি প্রাপ্তির হার ততই অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। অহিংসার ক্রিয়া—প্রেমের ক্রিয়া—লোক চক্ষুর অন্তরালে হইয়া থাকে এবং অপূর্ব সফলতায় উহা যখন প্রকাশ পায় তখন জগৎ চমৎকৃত হইয়া যায়। ভূদানযজ্ঞে আজও যাহা চলিতেছে তাহা অভাবনীয় হইলেও তাহাতে মানুষের গণিতই ক্রিয়া করিতেছে। এখনও ভগবানের গণিতের ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উহা অদৃশ্যে ক্রিয়া করিতেছে। উহার ক্রিয়া যখন প্রকাশ পাইবে তখন ভূদানযজ্ঞের অপূর্ব সফলতায় জগৎ চমৎকৃত হইবে।

**হিংস্র পথের বিচার**

ভূমি সমস্যার সমাধান তথা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন এরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের মনের কোণে এই চিন্তাধারা আছে যে, মানুষ আজ যেমন আছে চিরদিন তেমনই থাকিবে।

কিন্তু ইতিপূর্বে যে সব আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, এ কথার কোন ভিত্তি নাই। মানুষ বিচারশীল। মানুষকে সৎ-বিচার বুঝাইলে সে বুঝিবে এবং আজ না হউক কাল সে তদনুসারে আচরণ করিবে। মানুষ পশু নয়। অতএব হিংসার আশ্রয় লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি হিংসার পথ গ্রহণ করা হয় তবে তাহাতে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব কি? যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, হিংসার পথে ধনীদের নিকট হইতে জমি ছিনাইয়া লইয়া উহা গরীব-দিগকে দেওয়া যাইতে পারে তথাপি উহাতে জমি অর্থাৎ লক্ষ্মী মাত্র মিলিল বটে, কিন্তু প্রেম পাওয়া গেল না অর্থাৎ হৃদয় পরিবর্তন হইল না। বিচার-বিপ্লব আসিল না। হৃদয় পরিবর্তন ও বিচার-বিপ্লব ব্যতিরেকে যেখানে ভূমি ধনীর হস্তচ্যুত হইল সেখানে প্রতি-বিপ্লবের বা হিংস্র প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। উপরন্তু হিংসার দ্বারা কোন বিষয়ের সমাধান করিলে এক সমস্যার স্থলে আরও বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহাতে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না; বরং সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠে। হিংসার নিষ্ফলতার কথা বুঝাইতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—পরশুরাম ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে যাইলেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টার মধ্যে তিনি নিজেই ক্ষত্রিয় হইয়া গেলেন। উহার দ্বারা হিংসার নিষ্ফলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর এক দৃষ্টিতে পরশুরামের উপাখ্যানে হিংসার বিফলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরশুরাম একুশবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। একবার নিঃক্ষত্রিয় করা হইলে আবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার অবকাশ থাকে কি? তাহার অর্থ—আদৌ নিঃক্ষত্রিয় করা সম্ভব হয় নাই বা হইতে পারে না। ইহাতে হিংসার নিষ্ফলতা সূচিত হইতেছে। হিংসার পথে সমস্যার সমাধান সফল হউক বা না হউক, বর্তমান অবস্থায় এই দেশে হিংসার পথে ভূমি ভূস্বামীদের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়া ভূমিহীনদিগকে স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত করান সম্ভব কি? তেলেঙ্গনায় জমিদার-জোতদারদের নিকট হইতে বলপূর্বক জমি কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র চাষীদিগকে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সেই জমি আবার তাহাদের অধিকতর ক্ষতি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ভূস্বামী-গণকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। যতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব

আছে ততদিন হিংসার পথে জমি ছিনাইয়া লইয়া স্থায়ীভাবে রাখা সম্ভব হইবে না। তাই বিনোবাজী কমিউনিষ্টগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—তাঁহারা যদি তাঁহাদের পথে ভূমি দরিদ্রকে দেওয়াইতে চান তবে ছোট ছোট হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি করা পরিত্যাগ করিয়া টোট্যাল ওয়ার (Total war) এর জন্য চেষ্টিত হউন। টোট্যাল ওয়ারে দেশ যদি কমিউনিষ্টদের পদানত হয় তবেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। নচেৎ স্থানে স্থানে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির দ্বারা সাময়িকভাবে কিছু কার্যসিদ্ধি হইলেও তাহা অনতিবিলম্বে অধিকতর ধ্বংসসাধন করাইয়া তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে সন্দেহ নাই। সময়, অবস্থা, দেশের ঐতিহ্য ও দৃঢ়মূল সংস্কৃতি দেশের বিপ্লব বা ক্রান্তির প্রকৃতি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। রুশিয়ার তদানীন্তন অবস্থায় এবং সেইকালে যেভাবে ও যে প্রকৃতিতে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহা যে ভারতে হইতেই হইবে—এমন কথা নাই। বরং কাল, অবস্থা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ভারতের ক্রান্তি ভারতের নিজস্ব পথে সংঘটিত হইবে। বিনোবাজী এই সম্পর্কে বলেন—"বিপ্লব (ক্রান্তি) শব্দের অর্থ সাম্যবাদীদের অপেক্ষা আমি বেশী বুঝি। ক্রান্তির প্রকৃতি দেশ ও কাল অনুসারে পরিবর্তিত হয়। মার্কস্ যেরূপ লিখিয়াছেন সেরূপ ক্রান্তি প্রত্যেক দেশে এবং সব সময়ে হওয়া সম্ভব নয়। ভারতের ক্রান্তি ভারতের নিজস্ব পন্থায় হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতি অধ্যয়ন করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, অন্যান্য দেশ ভারতের নিকট হইতে বহু বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। আমি যে ক্রান্তির জন্য প্রচেষ্টা করিতেছি তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূল। ইহা কোন ছাঁচে-ঢালা উগ্রপন্থী ক্রান্তি নহে। এই বিচারধারা ভালভাবে উপলব্ধি করিয়া আমাদের কর্মীরা ভূদানযজ্ঞের কাজে আত্মনিয়োগ করুন—ইহা আমি চাহিতেছি।" সমাজের একজনের জন্য আর একজনকে ধ্বংস করিতে হইবে ইহা কিছুতেই উচিত নহে। ভারতীয় সংস্কৃতি—ইহাই বলিয়া থাকে। এই সংস্কৃতির ভিত্তিতে আধারিত হইয়া ভারতের ক্রান্তি আসিবে।

সাধারণতঃ এরূপ মনে করা হয় যে, মার্কসের ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ স্বীকার করিলে সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত ও বিপ্লব সৃষ্টিতে হিংসার

আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বিনোবাজী সেরূপ মনে করেন না। এ সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অনেকের চোখ খুলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন—ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্‌কে (Dialectical Materialism) আমি 'বৈতর্কিক বস্তুবাদ' নাম দিতেছি। 'ভৌতিকবাদ' নাম উপযোগী নহে। ভৌতিকবাদী তাহাকে বলে যাহার কাছে পানাহার ও আমোদ-প্রমোদ জীবনের সার বলিয়া বিবেচিত হয়। বিতর্কবাদ (Dialectics) হইতেছে—কেবলমাত্র এক বিচারপদ্ধতি। উহা হইতে ক্রান্তির সিদ্ধান্তের উদ্ভব হইতে পারে—উপক্রান্তির সিদ্ধান্তও হইতে পারে। টক্ লেবুর গাছে যদি মিষ্টি ফলের কলম তৈয়ারী করা হয় তবে তাহাতে অম্ল-মিঠা ফল উৎপন্ন হইবে। থিসিস্, এণ্টিথিসিস্ ও সিনথিসিস্ (Thesis, Antithesis, Synthesis) —উহা ঐরূপ ক্রিয়া। এই থিওরী হইতে ক্রান্তির পক্ষে কি উৎসাহ পাওয়া যায় এবং ধনীদিগকে হত্যা করিতে হইবে—এই কথাও কেমন করিয়া আসে তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

"প্রত্যেক জিনিসে গুণ ও দোষ উভয়ই বিদ্যমান আছে। দোষময় বস্তুর উপর গুণময় বস্তুর আক্রমণ হইলে এক তৃতীয় জিনিস উৎপন্ন হয় যাহাতে ঐ দুইএর দোষ থাকে না। পরন্তু ঐ দুইএরই গুণ উহাতে থাকে। আজ সমাজে এক বিচার রহিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার যোগ্যতা অনুসারে মাহিনা পাওয়া চাই। ইহাতে এক গুণ আছে এই যে উহাতে কাজ করিবার উৎসাহ জন্মে; কিন্তু ইহাতে এক অন্যায় এই রহিয়াছে যে ইহাতে দুর্বলের সর্বনাশ হয়। এইজন্য এই বিচারের বিরুদ্ধে সমতার বিচার খাড়া করা হয়; কিন্তু উহাতে এক দোষ আছে যে উহাতে অলস লোকেরা উৎসাহ পায়। সমগ্র ধন একজনের হাতে জমা করিবার যে ক্রিয়া চলিতেছে উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আত্যন্তিক সমতার কথা উঠিয়াছে পরন্তু উহাতেও দোষ আছে। এইজন্য উহার ফল এই হইবে যে, এক তৃতীয় বিচারের উদ্ভব হইবে —যাহাতে ঐ দুইএর গ্রাহ্য অংশ বিদ্যমান থাকিবে বটে কিন্তু উহাদের ত্যাজ্য অংশ থাকিবে না। অতঃপর এই নূতন জিনিসে যদি দোষ থাকিয়া যায় তবে উহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আর একটি জিনিস খাড়া হইয়া যাইবে।

তখন আবার ঐ প্রক্রিয়া শুরু হইয়া যাইবে। এইরূপে বিতর্কবাদ এক বিচার-প্রণালী মাত্র হইতেছে। উহা হইতে কোন বিশিষ্ট আচার প্রণালীর উদ্ভব হইবে এমন কথা নাই—যদিও মার্কস্ সেই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত বিতর্কবাদের বিচার-প্রণালী হইতেই উদ্ভুত এবং মাত্র সাম্যবাদই ঐ বিচার-প্রণালী হইতে উদ্ভূত হইতে পারে—অন্য কিছুই নহে। কিন্তু এক বিচার-প্রণালী হইতে একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের উদ্ভব অনিবার্য—একথা আমি মানি না।"

অপহরণ (Expropriation) -এর দ্বারা রুশিয়া প্রভৃতি দেশের ক্রান্তি আসিয়াছে। কিন্তু ভারতের ক্রান্তি অপরিগ্রহ (Non-possession) এর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিবে। এই সম্পর্কে বলিতে গিয়া বিনোবাজী যে গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ঃ—"আমি যে বিচারধারা চালাইতে চাহিতেছি উহার বিরোধী যে বিচার আজ সমাজে প্রচলিত আছে তাহাকে 'অপহরণ' বলে। যাঁহারা 'অপহরণ'-বিচারে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের অভিমত এই যে, ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজের জন্য এবং সমাজের স্বার্থের জন্য ব্যক্তির সম্পত্তি 'অপহরণ' করা দোষ নহে—বরং ব্যক্তির সম্পত্তি 'অপহরণ' কার্যে যাঁহারা বাধা দিতে চান তাঁহাদের চিন্তাধারা ভ্রান্ত। আজ ঐ বিচারের দিকে পৃথিবীর কয়েকটি দেশ আকৃষ্ট হইয়া আছে। উহার বিরুদ্ধে আমি 'অপরিগ্রহ' বিচার খাড়া করিয়াছি। সাধারণতঃ ইহা মনে করা হয় যে, 'অপরিগ্রহ' গান্ধী, বিনোবা প্রভৃতির ন্যায় সন্ন্যাসীদের জন্য এবং জনসাধারণের জন্য 'অপরিগ্রহ' নহে—লোভ। সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ আদর্শস্বরূপ গণ্য করা হয়। কিন্তু গার্হস্থ্য-জীবনেও 'অপরিগ্রহ' আচরণ করা যায়। ধর্মবিচারকে ঐভাবে খণ্ডিত করিলে তাহার ফলও মাত্র সংকুচিত আকারে পাওয়া যায়। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে নির্লোভ লোভীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সে নিজেই লোভী হইয়া পড়ে। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ত্ব দূর করিতে গিয়া নিজেই ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছিলেন—এই দৃষ্টান্ত তো আমাদের কাছেই আছে। যাহার বিরোধিতা করিতে হইবে, তাহার শাস্ত্র যদি আমরা মান্য করি তবে তাহার স্থূল রূপ নষ্ট করিতে আমরা সক্ষম হইতে পারি; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে আমরা উহাকে অমর করিয়া রাখিয়া দিই। আজ দুনিয়ায় লোভের ও পরিগ্রহের

রাজ্য চলিতেছে। পরিগ্রহের আশেপাশে এরূপ আইন খাড়া করা হইয়াছে যাহাতে পরিগ্রহকে অন্যায় বলিয়া মনে করা হয় না। চুরিকে আমরা অপরাধ গণ্য করি; কিন্তু যে ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া চুরির প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে তাহার বৃত্তিকে আমরা চুরি বলিয়া মনে করি না। উপনিষদের এক উপাখ্যানে রাজা বলিতেছেন যে, 'আমার রাজ্যে কেহ চোর নাই—কৃপণও নাই।' কারণ কৃপণই চোর সৃষ্টি করে। চোরকে আমরা জেলে পাঠাই; আর চোরের জন্মদাতাকে আমরা মুক্ত রাখি এবং সে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া গদীতে উপবিষ্ট থাকে। ইহা কেমন বিচার? গীতাও ইহাকে চোর বলিয়াছেন। কিন্তু আজ তো আমরা গীতাকে সন্ন্যাসীদের গ্রন্থ মনে করিয়া গীতা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছি।"

**ভূমির প্রশ্ন এত দিন না উঠিবার কারণ**

জমির মালিক বলিতে পারে যে, অন্যেরা তাহাদের সঞ্চিত অর্থ—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, ধন-বাড়ী, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া লাভবান হইতেছে। আমি সেরূপ আমার সঞ্চিত অর্থ ভূমিতে খাটাইতেছি। ইহাতে আমি কি দোষ করিলাম? সকল ভূমির মালিক যে অন্যায়ভাবে ভূমি অর্জন করিয়াছেন তাহা নহে। সে প্রশ্নও এখানে আসে না। ন্যায়ভাবে হউক বা অন্যায়-ভাবে হউক, যে ভূমি তাহার হাতে আসিয়াছে সে ভূমি তাহার নয়—সে ভূমি ভগবানের। সে ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। যুগ যুগ চলিয়া গেল, এতদিন সে প্রশ্ন উঠে নাই কেন? তাহা হইলে তো তাহারা এমনভাবে ভূমি-সংগ্রহ করিত না। যতদিন লোকসংখ্যা কম ছিল এবং ভূমি বেশী ছিল তত-দিন এ প্রশ্ন উঠাইবার আবশ্যকতা না থাকায় ঐ প্রশ্ন উঠে নাই। আজ লোক বেশী—জমি কম। দারিদ্র্যের চাপে সারা সমাজদেহ নিষ্পেষিত। তাই এই প্রশ্ন উঠিতেছে। তাই অবস্থার চাপে এই বুনিয়াদী সত্যের বোধ সমাজে জাগ্রত হইয়াছে। আমেরিকায় এই প্রশ্ন উঠে নাই। অষ্ট্রেলিয়ায়ও এই প্রশ্ন উঠে নাই। কারণ উঠিবার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডে এখনও উঠে নাই, কিন্তু তাহা অন্য কারণে। সেখানে ভূমির অভাবজনিত দারিদ্র্য অন্য উপায়ে দূর করার সুযোগ আসিয়াছিল। ভারতে আজ এই সত্যকে স্বীকার ও কার্যে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই এই প্রশ্ন আজ সব চাইতে জরুরী।

**শক্তি-বুদ্ধিও ভগবানের দান**

কোন মানুষ বলিতে পারে না যে, সে ভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। যে জিনিস সে সৃষ্টি করে নাই—যাহা ভগবান দিয়াছেন তাহা কি তাহার একার ভোগ করিবার জন্য? ভগবান মানুষকে খাইবার জন্য এক মুখ দিয়াছেন। তেমনি খাদ্যাদি উৎপন্ন করিবার জন্য দুই হস্তও দিয়াছেন। উৎপাদনের জন্য তাহার হাত খাটাইবার বুনিয়াদী সাধন ভূমি ভগবান দিয়াছেন। উৎপাদক শ্রম করিবার জন্য তাহার খাদ্যবস্ত্রাদির অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, যে ব্যক্তি তাহার দুই হাত খাটাইতে চাহিবে তাহাকে রুধিবার অধিকার কাহারও নাই। যদি তাহা হয় তবে যে শিল্পপতি, যে ব্যবসা করে, চাকুরী করে বা অন্যভাবে শক্তি বা বুদ্ধি খাটাইয়া উপার্জন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে তাহার সেই শক্তি ও তাহার সেই বুদ্ধি তো ভগবানের দান। তবে তাহা প্রয়োগ করিয়া যে ধন সংগ্রহ করা হইতেছে তাহা সে একা ভোগ করিবে কেন? তাহার অংশ সে সমাজকে দিবে না কেন? ইহা ঠিক কথা। ভূমি ছাড়া মানুষের যা কিছু ধনদৌলত তাহারও অধিকারী ভগবান। তাই ধনদৌলতও সে ভগবানে অর্পণ করিয়া প্রসাদস্বরূপ তাহার প্রয়োজন মত মাত্র কিছু ভোগ করিবে। এই বিচার কার্যে পরিণত না করিলে ভূদানযজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাই বিনোবাজী 'সম্পত্তি-দান-যজ্ঞ' প্রবর্তন করিয়াছেন। সম্পত্তি-দান-যজ্ঞ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাইবে।

**'দান' শব্দে আপত্তি**

দরিদ্রের প্রতি দয়া করা, দরিদ্রের উপকার করা পুণ্য কর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। সাধারণ লোকে পুণ্য কর্ম বলিতে কি বুঝে? যাহা মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, অথচ যাহা মানুষ দয়াপরবশ হইয়া অন্যের উপকারের জন্য করে—সেরূপ কিছু করিলে পুণ্য অর্জিত হইল বলিয়া বলা হয়। ইহার মধ্যে এই মনোভাব নিহিত আছে যে দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের জন্য ধনী কিছুমাত্র দায়ী নহে এবং তাহার দারিদ্র্য মোচনের জন্য তাহার কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। অর্থাৎ ধনীর নিকট হইতে কিছু পাইবার অধিকার বা দাবি দরিদ্রের নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধনিকত্ব ও দারিদ্র্য

উভয়েরই যুগপৎ উৎপত্তি শোষণেই। একজনের দ্বারা অন্যে তাহার স্বাভাবিক জীবিকার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে তবে একজন হইতে থাকে ধনী ও অন্যজন হইতে থাকে দরিদ্র। তাই দরিদ্রের অধিকারের দাবীতে ধনীর নিকট হইতে ভূমি চাহিতে হইবে। সুতরাং ধনীকে দান দিতে বলা এবং দরিদ্রের তাহা গ্রহণ করা ধনীর কৃপাগ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। ইহাতে দরিদ্রের অসম্মানই করা হয়। ইহা হইতেছে ভিক্ষার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা বর্তমান সমাজের রীতি। তাই মহাভারতের 'দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়' অথবা খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের 'চ্যারিটী' (charity) অথবা মুসলমানদিগের 'জাকাত' আজ বঞ্চিতের সম্মুখে কোন আশার বাতি জ্বালাইয়া দেয় না। কারণ এই ভিক্ষালব্ধ অন্ন আসে উপর হইতে। সমাজের নিম্নের স্তরে যাহারা দুর্দৈবগ্রস্ত আছে তাহাদের হাতপাতা আর কোনদিন ঘুচে না। ইহার পিছনে নিষ্পেষণের যন্ত্র নিঃশব্দে কাজ করিয়া যায়। তাই 'ভূদানযজ্ঞে' দান শব্দের প্রয়োগে আপত্তি উঠিতে পারে। 'ভূদানযজ্ঞ' তো ভূমিহীন দরিদ্রের অধিকারের দাবিতে ভূমি দেওয়ার জন্য আহ্বান। তবে এখানে 'দান' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে কেন? যজ্ঞ, দান ও তপঃ—এই তিন শব্দ ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মহান্ স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহা প্রয়োগ করিয়া ভারতীয় মানুষকে মহৎ কার্য সম্পাদনে যেরূপ প্রেরণা দান করা যায় তাহা অন্য শব্দ প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব হয় না। তাই সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে উহাদের অর্থের বিস্তার সাধন করা হইয়াছে। গীতায় 'যজ্ঞ' শব্দ 'পরোপকার' বা 'নিঃস্বার্থ সেবা' অর্থে ব্যবহার করিয়া উহার অর্থের বিকাশ সাধন করা হইয়াছে। ইহাকে শব্দ-ক্রান্তি বলা যায়। মহাত্মা গান্ধীও বর্ণ ব্যবস্থা, ট্রাস্টীশিপ্ ইত্যাদি শব্দকে অভিনব অর্থে প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল শব্দের ভাবার্থে ক্রান্তি আনয়ন করিয়াছেন। তাই শাস্ত্রজ্ঞ বিনোবাজী 'দান' শব্দ পরিত্যাগ না করিয়া উহা এক ক্রান্তি-কারক অর্থে 'ভূদানযজ্ঞে' সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শংকরাচার্য বলিয়াছেন—"দানং সংবিভাগঃ"। দান-এর অর্থ সম্যক বণ্টন বা সংগত বণ্টন। এই অর্থেই 'ভূদানযজ্ঞে' দান শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। দানের অর্থ এই যে নিজের কাছে যাহা আছে তাহার সংবিভাজন। এই প্রকার দানের যিনি দাতা তাঁহার হৃদয় পরিবর্তন

হইয়া থাকে। দানের প্রচলিত অর্থ যাহা স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে তাহা এই—"স্বসত্ত্বধ্বংসপূর্বক পরসত্ত্বোৎপত্ত্যনুকূলত্যাগঃ দানম্" অর্থাৎ নিজের সত্ত্ব নষ্ট করিয়া অন্যের সত্ত্ব সৃষ্টি করার জন্য দেওয়াকে দান বলে। দানের এই প্রচলিত অর্থে উহা ব্যবহার করা হয় নাই। বিনোবাজী বলেন যে—দানের প্রচলিত যে অর্থ উহা দানের প্রকৃত অর্থের বিকৃত অর্থ মাত্র। দানের প্রকৃত অর্থ সংবিভাগ। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আমি ভিক্ষা-স্বরূপ দান চাহিতেছি না। দান শব্দের অর্থ লোকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে—যেমন ধর্ম, বিজ্ঞান, ত্যাগ, নীতি ইত্যাদি শব্দের অর্থ বিকৃত করা হইয়াছে।" এই অর্থের মধ্যে দরিদ্রের অধিকারের দাবিতে ধনীর নিকট হইতে ভূমি চাওয়ারই ভাব রহিয়াছে। ভূমি ভগবানের দান ও ভূমি উৎপাদনের মৌলিক সাধন এই কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য এক দৃষ্টিতেও ভূদানযজ্ঞের 'দান' শব্দের উক্ত অর্থ অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। মনুষ্য সামাজিক জীব। কোন মানুষ যাহা পাইয়াছে বা যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার ঐ পাওয়া ও করার ব্যাপারে সারা সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা রহিয়াছে। এজন্য মানুষ সমাজের নিকট ঋণী এবং সমাজ প্রত্যেক মানুষের নিকট হইতে ঐ সবেরই অংশ পাইবার অধিকারী। সুতরাং এই দৃষ্টিতে 'দান' শব্দের এই অর্থ সহজে উপলব্ধি করা যায়। অতএব 'ভূদানযজ্ঞের' দ্বারা ধনীদের নিকট বিনোবার ভিক্ষার সংবাদমাত্র পেঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে এইরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত।

ভূদানযজ্ঞের 'দান' শব্দ উহার প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া ভিন্ন আর এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা বিনোবাজী বুঝাইয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"ভূদানযজ্ঞের 'দান' শব্দে কোন কোন লোকের খট্‌কা লাগিয়াছে। কতিপয় বন্ধু এক নূতন বিবাহবিধি রচনা করিয়াছেন। যখন তাঁহারা ঐ বিধি রচনা করিতে বসিলেন তখন কন্যাদান শব্দে তাঁহাদের খট্‌কা আসিল। গরু মহিষের দানের মত কন্যার দান কিরূপে করা যায়? মূলে বিবাহ-বিধিতে 'কন্যাদান' শব্দই নাই। সেখানে 'সম্প্রদান' অর্থবোধক শব্দ আছে। উহার অর্থ কেবলমাত্র 'দেওয়া হইল' এই মাত্র। ইহার দান করা হইল, উহাকে দান প্রদান করা হইল—এইরূপ অর্থ নহে। যে জিনিসে আমার

মালিকত্ব আছে তাহাতে আজ হইতে তোমার মালিকত্ব হইল—এইরূপ ভাব উহাতে নাই। 'দেওয়া হইল' কেবলমাত্র ইহা বলিলে কোন গৌণত্ব বুঝায় না। এইজন্য ঐ নূতন বিবাহ-বিধিতে 'কন্যা-সম্প্রদান' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেখানে 'সম্প্রদান' আছে সেখানে 'অপাদান' আসিয়াই যায়।

"ভূদানযজ্ঞে এই প্রকারের কল্পনা রহিয়াছে। জমির মালিক উহার স্বামী নহেন। তিনি কন্যার বাপেরই মত প্রতিপালক মাত্র। সৎ পাত্র দেখিয়া তাহাকে ঐ জমি সম্প্রদান করিতে হইবে। এরূপ সৎ পাত্রের খোঁজও করিতে হইবে। এই ব্যাপারে মালিকত্বের কল্পনা কোথাও নাই।"

### 'মালিক' শব্দের ব্যবহারে বিভ্রান্তি

এখানে একটি বিষয়ে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। ভূমির মালিক ভগবান। অথচ আবার এইরূপ বলা হয় যে, ভূদানযজ্ঞে যেসব ভূমিহীন ভূমি পাইবে তাহারা ঐ ভূমির মালিক হইবে। ইহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ভূমির সংগত বণ্টনের দরুন যাহারা ভূমি পাইবে তাহাদিগকে যে মালিক বলা হয় তাহা মাত্র ব্যবহারিকভাবে বলা হইয়া থাকে। ভূমি ভগবানের—এই বিচার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে এই দাঁড়ায় যে ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। ইহার মূলে এই উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে যে, সকলেই ভূমিতে কায়িক পরিশ্রম করিবে ও সকলেই উৎপাদন করিবে। অর্থাৎ সকলকেই পরিশ্রমী ও উৎপাদনকারী হইতে হইবে। যদি কেহ তাহা না করে তাহার ভূমি রাখিবার অধিকার নাই। অন্য দিকে যে ব্যক্তি দুই হাত খাটাইয়া ভূমিতে উৎপাদন করিতে চাহিবে তাহার ভূমি পাওয়া চাই। নিজে পরিশ্রম করিয়া ভূমিতে উৎপাদন করে এমন ব্যক্তির নিকটও যদি তাহার প্রাপ্যাংশ অপেক্ষা অধিক ভূমি থাকে তবে অন্য কেহ পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন করিতে চাহিলে তাহাকেও তাহার প্রাপ্যাংশমত ভূমি রাখিয়া বাকি ভূমি ফেরৎ দিতে হইবে। কেহ আজ ভূমিতে পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন করিতেছেন কিন্তু কাল আর তিনি তাহা করিলেন না। তাঁহার আর সে ভূমি রাখিবার অধিকার থাকিবে না। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"প্রতি আট-দশ বৎসর পর পর নূতন করিয়া জমির পুনর্বণ্টন হইবে। যদি কাহারও ঘরে সংখ্যা বাড়িয়া

যায় তবে সে অপেক্ষাকৃত অধিক জমি পাইবে এবং কাহারও ঘরে সংখ্যা কমিয়া যায় তবে সে কম জমি পাইবে। ঐ সময়ের জন্য ঐ ব্যক্তি জমির মালিক থাকিবে ও ঐ সময়ে উহার জমি লওয়া চলিবে না। সকলেই এই মনোভাব লইয়া চলিবে যে, সমস্ত জমি আমাদের। প্রয়োজন হইলে ইহা হইতে আমাদের জমি মিলিবে ও প্রয়োজন না থাকিলে জমি আমাদের নিকট হইতে লওয়া চলিবে। কোন বাপ একথা বলিতে পারে না যে, সে তাহার পুত্রের মালিক—যদিও পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্বন্ধ অটুট। ঐরূপ জমির উপর মমত্ব থাকিবে কিন্তু মালিকত্ব নহে।" তাই তিনি বলিয়াছেন যে, জমি গঙ্গার মত বহিতে থাকিবে। এই অবস্থায় তাহাকে জমির মালিক বলা হইলে সে হয় নামে মাত্র মালিক অথবা তাহার মালিকত্ব সর্তাধীন ও গৌণ। সর্তাধীন মালিকত্ব তো মালিকত্বই নহে।

### না বুঝিয়া দান দেওয়া নিষেধ

এই আন্দোলনের সব চাইতে বড় কথা দাতার অন্তরে ভাব-ক্রান্তি আনয়নের প্রয়োজনীয়তা। তাই বিনোবাজী প্রথম হইতেই সকলকে সতর্ক করিয়া আসিতেছেন যে, কেহ যেন ভূদানযজ্ঞের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া দান না দেন। কারণ না বুঝিয়া দান দেওয়া হইলে ভূমি পাওয়া যাইবে বটে কিন্তু সমাজে ক্রান্তি অর্থাৎ ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। তাই তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া তাঁহার আবেদনে (ভারতবাসীর প্রতি) লিখিয়াছেন—"আমাদের তিনটি সূত্র আছে ঃ—

(১) আমাদের কথা উপলব্ধি করিয়াও যদি কেহ ভূমি না দেন তবে আমাদের তাহাতে দুঃখ নাই। কারণ আমরা মনে করি, আজ যিনি দিতেছেন না কাল তিনি দিবেন। 'বিচার-বীজ' অংকুরিত না হইয়া যায় না।

(২) আমাদের কথা বুঝিয়া যদি কেহ ভূমি দেন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়—কারণ তাহার ফলে সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৩) আমাদের কথা না বুঝিয়া কোনরূপ চাপে পড়িয়া যদি কেহ দেন তবে তাহাতে আমাদের দুঃখ হইবে; কারণ যে কোন রকমে জমি সংগ্রহ করা

আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু আমাদিগকে সর্বোদয়ের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইবে।"

**ধনীদের আন্তরিকতার প্রশ্ন**

এরূপ বলা হয় যে, ধনীরা যে দান দিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ কিছু আন্তরিকতা নাই, উহাতে কপটতা আছে। এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"মানুষের হৃদয়ে সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব অহরহ চলিতেছে—উহা অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। তাহাতে সৎ-এর রক্ষা ও অসতের নাশ হইয়া থাকে। ধনীর কৃতকার্যের মধ্যে কিছু না কিছু অন্যায় যে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যায় পন্থা অবলম্বন না করিলে কি কখন হাজারো একর জমি এক হাতে জমা হওয়া সম্ভব? যে সব ধনী দান দেন তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ প্রকারের দ্বন্দ্ব শুরু হইবে—'আমরা যাহা করিয়াছি তাহা কি ঠিক হইয়াছে?' পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি দান করিবেন। তাঁহারা অন্যায় পরিত্যাগ করিবেন। এইভাবে তাঁহাদের হৃদয় পরিবর্তন সংঘটিত হইবে।"

**ধনীদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির প্রশ্ন**

কেহ কেহ আক্ষেপ করেন যে, বিনোবাজী নিজেকে ধনীদিগের 'ভাই, পুত্র' ইত্যাদি রূপে অভিহিত করিয়া তাহাদিগের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা ঠিক কাজ হইতেছে না। উহার উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"তাহা হইলে কি আমি ধনীদের অপ্রতিষ্ঠা ঘটাইব? আমি তাঁহাদেরই দ্বারা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করাইয়া লইয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছি—ইহাতেই কি আপনাদের আপত্তি হইতেছে? তাহা হইলে কি তাঁহাদের দ্বারা বদমাশি করাইয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার হানি করিব? এমনি তো তাঁহাদের বদমাশি রহিয়াছে। আরও বদমাশি করার জন্য কি তাঁহারা আমার কোন অপেক্ষা রাখেন? তাই তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের কর্তব্য করাইয়া লইতে হইবে। তাঁহাদের প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দান গ্রহণ করা উচিত। দান যিনি দেন আর দান যিনি গ্রহণ করেন তাঁহারা উভয়ে সমপর্যায় ভুক্ত—এই ভাব

মনে রাখিয়া কাজ করিলে কল্প-বৃক্ষের সমান ফল মিলিবে। অন্যথায় এক মুষ্টি মাটি মিলিবে মাত্র। ধমকানি দিয়া কাজ আদায় করায় কোন আনন্দ নাই। কোনরূপ লেন-দেনের ভাব যেন ইহাতে না থাকে। আমাদের অন্তরে এরূপ শ্রদ্ধা থাকা চাই যে, যদি আমার ত্যাগ করিবার শক্তি থাকে তবে অন্য লোকের ত্যাগ করিবার শক্তি থাকিবে না কেন? যে পরমেশ্বর আমাকে চাহিবার প্রেরণা দিয়াছেন সেই পরমেশ্বর অন্যকে দিবার প্রেরণা দান করিবেন না কেন?"

**ভূমিদানে প্রেরণাদানকারী বাণী**

বিনোবাজী ভূমিদানে প্রেরণা দিবার জন্য যে সব অমৃতময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা খুবই প্রাসঙ্গিক হইবে সন্দেহ নাই।

"সন্তানকে স্তন্যপান করাইতে মাতার যেরূপ আনন্দ হয়, ভূমিদান করিবার সময় দাতার সেরূপ পরম আনন্দ হওয়া চাই।

"এখন দান দিবার সময় আসিয়াছে। আপনারা সকলে হৃদয় খুলিয়া দান দিন, ইহা আমার প্রার্থনা। দানের দ্বারা এক 'দৈবী সম্পত্তি'র নির্মাণ হয়। উহার সম্মুখে 'আসুরী সম্পত্তি' টিঁকিতে পারে না। আসুরী সম্পত্তি ধ্বংসোন্মুখ। মমত্বভাবের উপর উহার ভিত্তি। উহাতে সমত্ব নাই। দৈবী সম্পত্তির ভিত্তি সমত্ব। এইরূপে দৈবী ও আসুরী সম্পত্তি চিনিতে পারা যায়।

"আমি যাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়া থাকি তাহার মধ্যে হৃদয়-মন্থন, হৃদয়-পরিবর্তন, মৈত্রী, মাতৃ-বাৎসল্য, ভ্রাতৃ-ভাবনা এবং গরীবের প্রতি প্রেমভাবের আশা করিয়া থাকি। যেখানে অন্যের জন্য চিন্তা জাগ্রত হইয়া থাকে সেখানেই সমত্ব বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে। সেখানে বৈরভাব টিকিতে পারে না। বৈরভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পুণ্যে শক্তি আছে; পাপের মধ্যে কোন শক্তি নাই। আলোকে শক্তি আছে; অন্ধকারে কোন শক্তি নাই। আলোককে অন্ধকারের অভাব বলা যায় না। আলোক বস্তু এবং অন্ধকার অবস্তু। লক্ষ বৎসরের অন্ধকারের মধ্যে আলোক লইয়া যান, এক মুহূর্তেই

অন্ধকার চলিয়া যাইবে। সেইরূপ আজ পুণ্যোদয় হইয়াছে। উহার সম্মুখে বৈর-ভাব থাকিতে পারিবে না। ভূদানযজ্ঞ এক অহিংসার প্রয়োগ এবং জীবন পরি-বর্তনের প্রয়োগ। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আপনারাও নিমিত্ত মাত্র। পরমেশ্বর আপনাদের দ্বারা ও আমার দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিতেছেন। ইহা কালপুরুষের প্রেরণা, ইহা পরমেশ্বরের প্রেরণা। তাই আমি ভূমিদান যাচঞা করিতেছি। আপনারা হৃদয় খুলিয়া দান করুন। যেখানে লোকে এক ফুট জমির জন্য ঝগড়া করিয়া থাকে সেখানে লোকে হাজার হাজার একর জমি দান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়, ইহাতে আপনারা বুঝিয়া লউন যে, ইহা পরমেশ্বরের প্রেরণা। তদনুসারে কার্য করুন। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন না। ইহার দ্বারা কল্যাণ আসিবেই।

"আজ কেবলমাত্র ভারতবর্ষ দুঃখার্ত নহে, সারা পৃথিবী—আমেরিকা, রুশ, ফ্রান্স প্রভৃতি বড় রাষ্ট্র হউক অথবা পাকিস্তান, জাপান প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হউক, সকলেই আজ দুঃখী। একে অন্যের ভয়ে ভীত হইয়া রহিয়াছে। অশান্তির জন্যই দুঃখী। প্রত্যেক ব্যক্তিও দুঃখী। একে অন্যের প্রতি সন্দিগ্ধ। লোকে অধিকাধিক ভোগ উপভোগ চাহিতেছে। ভোগ-বিলাসের জিনিসপত্রও বহু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি কাহারও সন্তোষ হইতেছে না। এই সকলের কারণ কি? যদি আমরা মনোযোগপূর্বক ভাবিয়া দেখি, তবে আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা কেবলমাত্র নিজেদের হিত চাহি বলিয়াই আমরা দুঃখী। নিজের লাভ চাহিতেছি—অপরের কথা চিন্তা করি না। ইহাতেই সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। ইহা দূর করিবার একমাত্র উপায় আমাদের শাস্ত্রকারেরা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তোমার কাছে ভোগের সামগ্রী যাহা আছে তাহা প্রথমে অন্যকে বাঁটিয়া দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাই মাত্র নিজে ভোগ কর।

"আহার, নিদ্রা, ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্য ও পশু সমান পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এইমাত্র পার্থক্য যে, কোন ভাল লোক ভোগময় জীবন যাপন করিয়া সুখী হন না। যযাতি বহু ভোগ করিয়াও তাঁহার ভোগলালসা তৃপ্ত না হওয়ায় নিজের পুত্রের নিকট হইতে যৌবন ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল। তিনি বলিলেন, 'কাম-বাসনা কখনও

ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হয় না, বরং উল্টাই হয়, অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে যেমন অগ্নিকে আরও বৃদ্ধি করে মাত্র।' এত দৃষ্টান্ত ও এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আজ লোকে ভোগই সর্বস্ব—ইহা মনে করিয়া বসিয়া আছে। তাই দেখিতেছি যে, বিভিন্ন প্রকারে ভোগ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও এবং একে অন্যের জন্য চিন্তা না করিয়াও সুখ-শান্তি পাইবার আশা করিয়া আছে। নিজের সুখের জন্য অন্যের গলা কাটা যায় যাউক তথাপি নিজের সুখ চাই। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, কেহই প্রকৃত সুখ পাইতেছে না। সারা দুনিয়া ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। ঐরূপ হওয়াও অনিবার্য। আমরা বাবলা বৃক্ষ রোপণ করিয়া আম্র ফল পাইতে পারি না। আম্র পাইতে হইলে আমেরই কলম রোপণ করিতে হইবে। সেইরূপ আমরা অন্যকে দুঃখ দিয়া কিছুতেই সুখ-শান্তি পাইতে পারি না। আমরা অন্যকে সুখী করিয়া তবেই নিজেরা সুখী হইতে পারিব।

"সত্যভামা দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন, 'আমি অন্তঃপুরে থাকিয়া যে সুখ না পাই তুমি বনে-জঙ্গলে বাস করিয়াও তদপেক্ষা অধিক সুখ-প্রসন্নতা পাও। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?' ইহার উত্তরে দ্রৌপদী বলিযাছিলেন, 'সুখ পাওয়ার জন্য দুঃখ ভোগ করা আবশ্যক।' বর্তমান পৃথিবীর সমস্যার সমাধানের উপায় দ্রৌপদীর এই মহাসূত্র বাক্যে নিহিত রহিয়াছে। সুখ হইতে সুখ পাওয়া যায় না, দুঃখ হইতেই সুখ পাওয়া যায়। ইহা অতি সুন্দর কথা। যতদিন পর্যন্ত আমরা অন্যের চিন্তা না করিব, নিজের সব-কিছু অন্যকে বাঁটিয়া দিয়া তবে ভোগ না করিব—ততদিন আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত সুখ জুটিতে পারে না।

"ভারতের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমি বহির্গত হইয়াছি এবং তাহাকে দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার করিতে চাহিতেছি। ভগবান তাঁহার সৃষ্ট জীবকে দুঃখ দেন না। পিতা পুত্রকে কি কখনও দুঃখ দিতে পারেন? ভগবান বাতাস, জল, ভূমি, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সব কিছুই আমাদিগকে দিয়াছেন; অতএব আমরা কিরূপে বলিব যে তিনি আমাদিগকে দুঃখ দিতে চাহেন? আমরা তাঁহার দেওয়া সামগ্রীর যোগ্য ব্যবহার না জানিয়া উহার অপব্যবহার করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমরা যদি কেরোসিন তৈলকে জল মনে

করিয়া অগ্নিনির্বাণের জন্য তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করি তাহা হইলে তাহাতে ভগবানের কি দোষ?

"অতএব নিজের সম্পত্তি, জমি, ধন, বুদ্ধি, সময়—সব কিছু অন্যকে ভাগ করিয়া দিয়া ভোগ করা চাই। লোকে যেন আমাকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী মনে না করেন, আমাকে তাঁহারা নিজের ষষ্ঠ পুত্র মনে করিয়া আমার প্রাপ্য অংশ দরিদ্রনারায়ণকে যেন দেন। ইহাতে কল্যাণ, ইহাতে যশঃ ও ইহাতে সারা বিশ্বের প্রকৃত সুখ মিলিবে।

"লোকে আমাকে বলে আমাদের মোহ ত্যাগ করাইয়া দিন—যাহাতে আমাদের দান দিবার প্রেরণা জাগে। তাই আমি ইহা চাই যে, যিনি আজ দান দিলেন না, তাঁহাকে যেন কদাপি নিন্দা করা না হয়। কারণ তিনিও পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তি। তিনি আজ দিলেন না; তিনি কাল নিশ্চয় দিবেন। মানুষের হৃদয়ের প্রতি, বর্তমান সময়ের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রেরণার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। সেজন্য আমি বিশ্বাস করি যে প্রেমপূর্বক বুঝাইলে এই কাজ সফল হইবেই।

"আমাদের চারিদিকে অনন্ত সৃষ্টি বিস্তৃত রহিয়াছে এবং এই অনন্তের মাঝে আমরা তুচ্ছ এক শরীর ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছি। আর সমগ্র সৃষ্টি আমাদিগকে নিরন্তর দান বিতরণ করিয়া আসিতেছে। সূর্যনারায়ণ প্রাতে উদিত হন ও নিজের সহস্র কিরণমালায় আমাদিগকে আলিঙ্গন করেন। যেমনভাবে অনুচর তাহার প্রভুর গৃহে হাজির হয় ঠিক তেমনিভাবে সূর্য আমাদের ঘরে প্রবেশ করে। ইহার প্রতি তাহার এরূপ মর্যাদাজ্ঞান যে যদি দরজা বন্ধ করা যায় তবে ধাক্কা দিয়া সে ঘরে প্রবেশ করে না। নিজের কিরণ লইয়া বাহিরে দরজার পাশে অপেক্ষা করে ও লক্ষ্য রাখে যে মালিক দরজা খুলিলেই সেবা করিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিবে। হাওয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত ঐ হাওয়া কোথা হইতে আসে ও কোথায় যায় তাহা কে জানে। এক তো হিমালয়ের দিক হইতে আসে ও আমাদের হৃদয়ে মধুর স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। উহার জন্যই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস চলে। আমাদের তুচ্ছ জীবনকে সার্থক করিবার জন্য হাওয়া নিরন্তর কাজ করিতেছে। হাওয়া না বহিলে আমরা বাঁচিব

না। গঙ্গামাতা আমাদের সেবা করিবার জন্য নিত্য প্রবাহিত রহিয়াছেন। আমের গাছই লাগাই আর বাবলার গাছই লাগাই তিনি তাহাদের জীবনদান করিবেনই। আমাদের ন্যায় সন্তানদের সেবা করিবার জন্য তিনি এই বীরোচিত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মেঘও আমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করে না কিন্তু নিত্য নিরন্তর দিতেছে। এইভাবে সারা সৃষ্টি আমাদিগকে দানের শিক্ষাদান করিতেছে।

"মাতা-পিতা আমাদের জন্য ত্যাগ করেন। সেই কারণে আমাদের জীবনরক্ষা হয়। আমাদের দুধ পান করিবার যত না ইচ্ছা হয় মায়ের আমাদিগকে দুধ পান করাইবার ততোধিক ইচ্ছা হয়।

"এইভাবে ভগবান বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে দান দেওয়া শিক্ষা দান করিতেছেন। লোকে বলে, আমার কাজে উল্টা গঙ্গা বহান হইতেছে; কিন্তু আমি তো সীধা গঙ্গা বহাইতেছি। কেন না এই কাজ সমগ্র সৃষ্টির অনুকূল। বরং আজ যাহা চলিতেছে তাহা কৃত্রিম ও বিপরীত। সন্তানদের লালন-পালন করা হয়—ইহা কি কোন আইনের বলে? আমরা পরিবারের মধ্যে থাকিয়া কতই না আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। সেই প্রেমের প্রবাহ সারা সমাজে বহাইতে থাকুন। তাহা হইলে কি মহান্ আনন্দ আসিবে তাহা একটু হিসাব করিয়া দেখুন।"

**বামন অবতার**

তেলেঙ্গনায় ভ্রমণ কালীন তেলেঙ্গনার অন্তর্গত বারঙ্গল নামক স্থানে ভূদানযজ্ঞের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিনোবাজী বলেন যে, ভূদানযজ্ঞে দান চাহিবার জন্য তিনি 'বামন-অবতার' রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"আমি ব্রাহ্মণ ছিলামই, এক্ষণে আমি 'বামন-অবতার' রূপ গ্রহণ করিয়াছি এবং ভূমিদান চাওয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছি।" পরে একবার তিনি এই 'বামন-অবতারের' উল্লেখ করিয়া ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে তাঁহার তিন-পাদের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—"ভূদানের পরে 'সম্পত্তি-দান' বামনের দ্বিতীয় পাদ। উহার পরে তৃতীয় 'পাদ' যে উঠিবে—তাহা নিশ্চিত। সেই পুণ্য কালের জন্য জনগণের প্রস্তুত হইতে হইবে—কেননা সেই পুণ্য যুগে তাঁহা-

দিগকে মানবতার বিনম্র সেবক হইতে হইবে।" ইহাতে লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগিতে থাকে যে, তিনি কি অবতার-বাদে বিশ্বাস করেন এবং তিনি কি সত্যই মনে করেন যে তিনি একজন অবতার। বিনোবাজী তাঁহার লিখিত এক পত্রে এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই আশংকা দূর করিয়াছেন। "কোন জীবনধারী মানুষের সম্বন্ধে অবতার কল্পনা আমি কদাপি করি না। বিভূতি-সম্পন্ন—দেহ-মুক্ত বিভূতিসম্পন্ন জ্ঞানদেবের ন্যায় পুরুষ যাঁহার প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা, তাঁহাকেও আমি অবতার বলিয়া মনে করি না। তাঁহাকে আমি শ্রেষ্ঠ সৎ পুরুষ বলিয়া মানি। রাম ও কৃষ্ণ অবতার। কেন না শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ রাম ও কৃষ্ণের মানবতার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পক্ষে উপাসনার জন্য এক স্থান মিলিয়াছে। তাই আমি তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া মানিয়া থাকি। আর কোন অবতার আমি মানি না। 'বামন-অবতার' ব্যক্তিগত ভাষা নহে; উহা ভূদানযজ্ঞের বর্ণন মাত্র। ভূদানযজ্ঞের রূপ 'বামনের' ন্যায় ক্ষুদ্র। কিন্তু 'বামন' যেরূপ বিরাট রূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেরূপ ইহার দ্বারা অহিংসক ক্রান্তি রচিত হইতে পারে। 'বামন' ভিক্ষা মাগিতেছেন এরূপ মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বলীকে দীক্ষাই দিয়াছিলেন। এই সমগ্র রূপক বুঝিয়া লইতে হইবে। এই প্রকার অবতারের উল্লেখ তো আমি না করিয়া পারি না। কেন না আমাদের সমাজ এবং আমি এই সংস্কারে ভরপুর হইয়া আছি। কেবল বামন অবতারের উল্লেখ আমি করিয়া থাকি, ইহা নহে। 'প্রজাসূয় যজ্ঞ', 'ভূদানযজ্ঞের অশ্ব', নূতন 'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন' এই সবেরও আমি উল্লেখ করিয়াছি। এ সকল নেহাৎ ছোট বিষয়ও নহে। কিন্তু আমি এই সবের উল্লেখ করিয়া থাকি এইজন্য যে, ইহার দ্বারা আপনাদের সহায়তা মিলিবে। আপনারা ক্ষুদ্র নহেন—আপনারা মহান। ইহা আপনাদিগকে শিখাইতে চাই। আমার মধ্যে যে 'আমি' রহিয়াছে তাহা ব্যক্তিগত 'আমি' নহে। উহা সমগ্র 'সর্বোদয়'-সমাজকে উদরে প্রবেশ করাইয়া লইয়া কথা বলিতেছে—এরূপ ভাষা।"

সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে আত্মার এক এক গুণের বিকাশ হয় এবং এক এক মন্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং যুগের এক

বিশিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত গুণ বিকশিত ও উক্ত মন্ত্র ফলবতী হয়। ঐরূপ গুণের বিকাশ বা মন্ত্রের আবির্ভাবই প্রকৃত অবতার আর ঐ ব্যক্তি নিমিত্তমাত্র অবতার। এ বিষয়ে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

**ভূমিহীন দরিদ্র ধনীর ষষ্ঠ পুত্র**

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পরিবারের পরিধির ধারণাকে সম্প্রসারিত করাই ভূদানযজ্ঞের এক মূলগত কথা। ভগবান কাহাকে এক পুত্র দেন, কাহাকেও দুই পুত্র, তিন পুত্র বা চার পুত্র দেন। যাঁহার চার পুত্র তিনি মনে করিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহার ধনসম্পত্তি তাঁহার পুত্রগণ চার ভাগে ভাগ করিয়া ভোগ করিবে। যদি তখন তাঁহার পঞ্চম পুত্র জন্ম গ্রহণ করে তবে কি তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন বা তাহাকে অনাদর করেন? তিনি তাহাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করেন। সেইরূপভাবে ধনী মনে করিয়া লউন—এই যুগে ভূমিহীন দরিদ্র তাঁহার ষষ্ঠ পুত্র। ইহা এই যুগের ইঙ্গিত; ইহা 'যুগ ধর্ম' ও 'যুগকর্ম'। অন্যত্র বিনোবাজী বলিয়াছেন—"যদি আপনার চার পুত্র থাকে তবে আমাকে পঞ্চম পুত্র মনে করুন এবং আমার যাহা পাওনা তাহা আমাকে দিন। আজ যিনি দিতেছেন না তিনি কাল দিবেন। তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষে এমন কেহ নাই যিনি আমাকে ভূমিদান করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।"

বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন—"৬ একরের মধ্য হইতে ১ একর দিন। ১ একর দিলেও ৫ একর হইতে ফসল কম পাওয়া যাইবে না। একই পরিমাণ সার ও পরিশ্রম উহাতে পড়িবে এবং ভগবানের আশীর্বাদও পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক কৃষকই বুঝে যে, ৬ একর জমিতে যে ফসল জন্মে ৫ একব জমি হইতে সেই ফসল পাওয়া যাইতে পারে। তাই আমি বলি, ৬ একর হইতে ১ একর দিন। তবেই পরমেশ্বর বরদান করিবেন এবং গরীবরা খাইয়া বাঁচিবে।"

**ধনী নিমিত্তমাত্র হও**

শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—'আমি এই সকলকে পূর্ব হইতে মারিয়া রাখিয়াছি। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।' সেরূপ গভীর

আত্ম-বিশ্বাসের সুরে বিনোবাজী ধনীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—'ভূমি ধনীর হাত হইতে গরীবের হাতে চলিয়া গিয়াছে। প্রশ্ন এইমাত্র যে, কোন্ পথে ভূমি যাইবে? হে ধনী, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও—যাহাতে শান্তি ও প্রেমের পথে ভূমি সমস্যার সমাধান হইতে পারে।' কত গভীর তাঁহার বিশ্বাস—জনশক্তি অভ্যুদয়ের অনিবার্যতায়! তাঁহার এই দিব্যদৃষ্টিসূচক বাণী যে অদূর ভবিষ্যতের দিকে সঠিক অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। ভূমিতে যে নিজে চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন করিবে ভূমির মালিকত্ব তাহারই হওয়া উচিত—এই বোধ সমাজে ক্রমবর্ধমানভাবে জাগ্রত হইতেছে। দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতেও এই দাবি ক্রমশঃ উত্থিত হইতেছে। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে ভূমি বণ্টনের জন্য সরকারের উপর ক্রমশঃ চাপ দেওয়া হইতেছে। সরকার কর্তৃক ভূমি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ অনুভূত ও স্বীকৃত হইতেছে। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ভূমির সঙ্গত বণ্টনের পক্ষে আগ্রহশীল। অন্যান্য দেশের পরিস্থিতিও ইহার অনুকূল। তাই মনোস্থিতি ও বস্তুস্থিতি উভয় দিক হইতেই সময়ের ইঙ্গিত বুঝা যাইতেছে। ভূমির সঙ্গত বণ্টন আর বেশী দিন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। ধনীরা কি ইহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই? বৈশাখের সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়ু কোণে কাল মেঘ জমিয়াছে। বাতাসের গতি বন্ধ হইয়া গুমোট ভাব হইয়াছে। শীঘ্র কালবৈশাখী উঠিবে। কিন্তু তাহাতে যদি কেহ মনে করে যে ঝড় উঠিবে না তবে তাহার বুদ্ধি যেরূপ ভ্রান্ত, সেরূপ আজ যদি ধনীরা মনে করিয়া থাকেন যে, জমি তাঁহাদের হাতে থাকিয়া যাইবে তবে তাঁহাদের বুদ্ধিও তদ্রূপ ভ্রান্ত। ভূস্বামীগণ সময়ের ইঙ্গিত চিনিয়া লউন। আজ 'কালপুরুষ' বিনোবাজীর মুখ দিয়া কথা বলিতেছেন। আজ যুগ দেবতা বিনোবাজীর দ্বারা নূতন যুগধর্ম প্রতিষ্ঠা করাইতেছেন—'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন' করাইতেছেন।

### ধনীদের সম্মান রক্ষার প্রশ্ন

ভূমি তো ধনীর হাত হইতে চলিয়া যাইবে, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভূমির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মর্যাদা, সম্মান ও মনুষ্যত্বও কি চলিয়া যাইবে না তাহা

রক্ষা পাইবে? যদি ভূদানযজ্ঞের পথে—শান্তি ও প্রেমের পথে ভূমি সমস্যার সমাধান হয় তবে ধনীর ইজ্জত বাঁচিবে, তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, সমাজ তাঁহার বন্ধু হইবে। কিন্তু যদি ভূমি অন্য পথে চলিয়া যায় তবে ভূমির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্মান, মনুষ্যত্ব সবই নষ্ট হইবে। আইনের পথে গেলেও তাঁহার সম্মান ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। তাই সম্প্রতি গয়া জেলার এক-স্থানে বিনোবাজী জমিদারগণকে এসম্পর্কে সতর্ক করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"পাটনায় জমিদারদের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সাফ কথা বলিয়া দিয়াছিলাম, যদি আপনারা সময়ের দাবি বুঝিয়া লইয়া এখনই ভূমিদান করেন, তবে আপনারা বাঁচিয়া যাইবেন। আজ আমি পুনরায় বড় জমিদারগণের নিকট আবেদন করিতেছি —আপনাদের শুধু ভূমিদান দিলে চলিবে না, ভূদানযজ্ঞের কাজকে আপনাদের নিজেদের কাজ গণ্য করিয়া উহাতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আপনারা আমাকে আর কতদিন পর্যন্ত ঘুরাইবেন; আপনাদেরই এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই আমার সন্তোষ আসিবে। ইহাতে আপনাদের হৃদয়ে সত্ত্ব গুণের প্রকাশ হইবে এবং সমাজের নেতৃত্ব করিবার, সমাজের সেবা করিবার সুযোগ আপনারা পাইবেন। এই সম্পর্কে ইংরাজদের নিকট হইতে আপনাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যখন ইংরাজগণ দেখিলেন যে ভারতবর্ষ ছাড়িতেই হইবে তখন তাঁহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া একটি তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং সেই দিনই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিলেন। যদি তাঁহারা এইভাবে না ছাড়িতেন তবে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তাঁহাদিগকে ছাড়িতে হইত কিন্তু উহার সাথে সাথে তাঁহারা সম্মান ও শ্রদ্ধা হারাইতেন। কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা ভারতবাসীর প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ব্যবসাও চালু আছে। গান্ধীজী অহিংসার দ্বারা স্বরাজ লাভ করাইয়াছেন ইহা যেরূপ ইতিহাসে লিখিত থাকিবে সেরূপ ইংলন্ড সম্পর্কে ইহাও ইতিহাসে লিখিত হইবে যে, ভারতের স্বাধী-নতার যুদ্ধে ইংলন্ড বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। আমি ইহা মনে করি যে, আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংলন্ডের নৈতিক বিজয় লাভ হইয়াছে। সত্যা-গ্রহ ও অহিংস-যুদ্ধের মহত্ত্ব এই যে উহাতে উভয় পক্ষেরই জয় হয়।" হিংস্র

যুদ্ধে এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরাজয় হইয়া থাকে। তাই, ভ্রাতৃবৃন্দ, ইংলণ্ডের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যদি সম্মান, গৌরব, প্রেম, সৌহার্দ্য ও স্নেহভাব বজায় রাখিতে চাহেন তবে সময় ও সুযোগমত কাজ করা চাই। জমি তো যাইবেই, কিন্তু দান না দিলে সম্মান ও প্রেম সবই হারাইয়া বসিবেন। গরীব আর কত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে? প্রতীক্ষা করা বা অন্য সব কিছুরই একটা সীমা আছে। এখন দরিদ্র জাগ্রত হইয়াছে। খুসী হইয়া দান দিলে তাহাতে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিবে। ঠিক সুযোগমত 'দেশে কালে চ পাত্রে চ' দান দেওয়া উচিত। এবং আমি ঠিক পাত্র নহি কি? ঠিক সময়ে উচিত কাজ করিলে উহার পরিণাম ভাল হয়।"

### ভয়-প্রযুক্ত দান

বলা হয় যে, ভূস্বামীগণ যে এখন দান দিতেছেন তাহা তাঁহারা ভয় পাইয়া দিতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহাদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা পাইবে কিরূপে? এই আপত্তিও করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচার প্রসঙ্গে যাহা বলা হয় তাহাতে ভূস্বামীদিগকে ভয় প্রদর্শনই করা হয়। ভূস্বামীগণকে যে ভয়ের কথা বলা হয় তাহা যে কিছু খারাপ, এ কথা নহে। উহাকে নৈতিক ভয় বলা যায়। ঐরূপ ভয় পাইয়া দান দেওয়া বিধেয়। শাস্ত্র বলে—"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্, হ্রিয়া দেয়ম্, ভিয়া দেয়ম্।" 'ভিয়া দেয়ম্' অর্থাৎ ভয়ে দান দেওয়া যায়। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"এইরূপেই আমরা বলিতেছি যে, ভয় পাইয়াও দান দিন। ইহার অর্থ এই নহে যে, যদি দান না দাও তো তোমাকে খুন করিব। এরূপ ভয়ে ভীত হইয়া কেহ দান দেন ইহা আমরা কিছুতেই চাহি না। কিন্তু যদি আমরা কাহাকেও বলি যে, তোমার বিছানার উপর সাপ রহিয়াছে, এইজন্যই বিছানা ত্যাগ কর তবে বাস্তব ক্ষেত্রে যে ভয় রহিয়াছে তাহা তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইল। মানুষের যে বিষয়ের ভয় থাকা কর্তব্য সেই ভয় করা ভাল এবং যে বিষয়ে ভয় করা উচিত নয় সেই বিষয়ে তাহার ভয় করা ঠিক নহে। ভয়ও একটি ভাল জিনিস। ভয়ে পড়িয়াও যদি কেহ খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকে তবে তাহার তাহা ঠিকই করা হইবে। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, 'আপনি

কেন এরূপ বলেন যে 'যদি মিথ্যাকথা বল তবে ক্ষতি হইবে, যদি হিংসা কর তবে অনিষ্ট হইবে?' 'দুনিয়াতে বিনাশ হইবে' একথাও বা আপনি 'কেন বলেন?' কিন্তু ইহা তো ভয় নহে; ইহা এক বিচার। মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল মিলিবে। এই জন্য মন্দ কাজ করিও না। লোককে বুঝাইবার জন্য আমরা এরূপ বলিয়া থাকি। ইহা যদি ভয় হয় তবে ইহা ধর্ম-ভয়। সমাজকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সময়ের অবস্থা বুঝিয়া যদি উদার হৃদয়ে দান দেওয়া না হয় তবে বিপদ আছে। লোককে ভয় দেখাইয়া ধমক দিয়া আমরা একথা বলি না। পরন্তু ইহার দ্বারা বিচারই বুঝাইয়া দিয়া থাকি। খারাপের ফল খারাপই হইয়া থাকে—ইহা বুঝাইয়া দেওয়া ভীতি প্রদর্শন করা নহে; ইহা তো কর্ম-বিপাক বা কর্ম-পরিণাম।" সময়োপযোগী সাবধান বাণী উচ্চারণ করাও ভীতি প্রদর্শন নহে। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই—আপনারা কি অন্ধ? আমি দেখিতেছি সম্মুখে এক স্তম্ভ। আমি সাবধান করিয়া দিতে চাই। আপনারা কি বুঝিবেন না? অথবা অন্ধের মত ধাক্কা খাইবেন? লোকে বলিতে পারে, বিনোবাজী আসিয়াছিলেন, কমিউনিষ্টদের কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং ধমকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি বলিতেছি, আমি কমিউনিষ্ট নই। ধমকানিতে আমার বিশ্বাস নাই। কিন্তু আপনি যে গদির উপর বসিয়া আছেন তাহা খুব নরম বটে কিন্তু তাহার উপর সাপ পড়িয়া রহিয়াছে। আমি উহা দেখিতে পাইতেছি। তাই আপনাকে গদি ছাড়িবার জন্য বলিতেছি। ইহা কি ধমকানি হইল? আর ইহা যদি ধমকানি হয় তবে বেদও তো ধমকাইয়াছে।

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রেচতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইত্‌ স তস্য,
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি"

'মূর্খ অনর্থক অন্নের স্তূপ করে। বেদ বলে, আমি সত্য বলিতেছি, সে অন্ন জমা করিতেছে না—সে নিজেকে হত্যা করিতেছে। যে ব্যক্তি অন্ন জমাইয়া রাখিতেছে সে নিজের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে। যে ব্যক্তি একা একা খায় সে ব্যক্তি পুণ্য নয়—পাপই ভোগ করে।'

অতএব ভাই সব, যাহাতে বিপদ রহিয়াছে তাহা আমাদিগকে চিনিতে হইবে এবং শীঘ্রই চিনিয়া ফেলিতে হইবে। বার্দ্ধক্য আসিবার পর বার্দ্ধক্যকে সকলেই চিনিতে পারে। কিন্তু যে যৌবনে বার্দ্ধক্য কি তাহা বুঝিয়া চলে, সেই ব্যক্তির সম্মান রক্ষা পায়। এইরূপে বিপদ আসিবার পূর্বে বিপদকে চিনিতে পারিলে সম্মান রক্ষা পাইবে।" সুতরাং এইভাবে ধনীর অন্তরে ধর্মভয় জাগ্রত হওয়ায় অথবা পূর্ব হইতে বিপদ বুঝিয়া লইয়া যদি ধনী দান দেন তবে তাহার ইজ্জত, সম্মান ও গৌরব রক্ষা পাইবে না কেন? মনে করুন, এক ধনী এইসব শুনিবাব বুঝিবার পর তাহার মনে এরূপ ভাবের উদয় হইল—'ভূমিতে যে সকলের সমান অধিকার আছে এ বোধ এতদিন আমার ছিল না, এখন সেরূপ বুঝিতেছি। সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। যাহার ভূমি যদি তাহার জন্য এখনই ভূমিদান না করি তবে হিংসার পথে বা আইনের পথে এ জমি আমার হস্তচ্যুত হইবেই। অতএব যদি বুদ্ধি পূর্বক কাজ করিতে হয় তবে এখনই ভূমিদান দেওয়া শ্রেয়ঃ।' এরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই ধনী সংগত পরিমাণ ভূমি এখনই দান করিলেন। কিন্তু অন্য একজন ধনী এরূপ শুনিয়া বুঝিয়াও ভূমিদান দিলেন না। জীবন থাকিতে স্বেচ্ছায় দিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইলেন। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভূমি সমস্যা লইয়া কোথাও অশান্তি সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইলে তাহা সরকারের দ্বারা দৃঢ় হস্তে দমন করাইবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন। অন্য দিকে সরকার যাহাতে ভূমিবণ্টনের জন্য কোন আইন প্রণয়ন না করে তজ্জন্য রাজনীতি ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তাহা সত্ত্বেও যদি ঐরূপ আইন প্রণীত হইয়া যায় তবে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত তাহা লইয়া মামলা মোকদ্দমা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন। এরূপে অবশেষে হিংসার পথে বা আইনের বলে ভূমি তাহার হস্তচ্যুত হইল। এই দুইজন ধনীর আচরণের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে কেন যে ভূদানযজ্ঞে সংগত পরিমাণ ভূমিদান দিলে ধনীর ইজ্জত ও সৌহার্দ্য বজায় থাকিবে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে হৃদয়-পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। কেহ

কেহ ধনীদের হৃদয়-পরিবর্তনের কথায় অবিশ্বাসের সুরে হাসিঠাট্টা করিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নহে। বাহিরের পরিস্থিতিতে মানুষের হৃদয় পরিবর্তন হইতে পারে। হয়ও তাহাই। এই ভাবে যাহার হৃদয় পরিবর্তন হয় তাহার ভিতরে সেই বিচার বীজ এতদিন উপ্ত ছিল। বাহিরের পরিস্থিতির বারি সিঞ্চনে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ একই পরিস্থিতি অন্যের হৃদয়ে অনুরূপভাবে ক্রিয়া করে না। প্রবল অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও অন্যের হৃদয় অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, সেই কারণে তাহার বৈরাগ্য আসিল। বৃদ্ধত্ব ও পুত্রের মৃত্যুর কারণে বৈরাগ্য আসিয়াছে বলিয়া কি ঐ বৈরাগ্য খাঁটি নয়? হাঁ, উহা খাঁটি। যখন ঐ ব্যক্তি যুবক ছিল ও তাহার পুত্র জীবিত ছিল তখন তাহার আসক্তি ছিল। কোন কোন লোক বৃদ্ধ হয় এবং তাহাদের পুত্রেরও মৃত্যু হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের বৈরাগ্য আসে না। ইহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তির বৈরাগ্য আসিয়াছে উহার হৃদয়ে প্রথম হইতে ঐরূপ ভাব ছিল এবং পুত্রের মৃত্যু এক নিমিত্তস্বরূপ হইয়াছে যাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত ভাব জাগ্রত হইয়াছে। এইজন্য প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ভাল ভাব আছে এরূপ বিশ্বাস রাখিতে হইবে।"

**কে কত দান দিবে?**

এখন প্রশ্ন হইতেছে ভূমিদান কে দিবে? যজ্ঞে সকলকেই নিজ নিজ 'হবির্ভাগ' আহুতি দিতে হয়। ভূদানযজ্ঞে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই ভূমিদান দিবার জন্য আহ্বান করা হইয়া থাকে। সকলের নিকট হইতে জমি চাওয়া হইয়া থাকে, তাই বলিয়া সকলের নিকট হইতে সমান জমি চাওয়া হয় না। মধ্যবিত্ত কৃষক ও জোতদারের নিকট হইতে একষষ্ঠাংশ চাওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা বড় বড় জোতদার বা জমিদার তাঁহাদিগকে বলা হয় যে, আপনারা নিজেদের জন্য কিছু রাখিয়া দিয়া বাকি সবই গরীবের জন্য দান করুন। যাঁহারা নিতান্ত গরীব তাঁহাদের নিকট হইতে দাবি করিয়া কিছু চাওয়া হয় না। তাঁহারা প্রেমপূর্বক যাহা দেন তাহা প্রসাদস্বরূপ গণ্য করিয়া গ্রহণ করা হয়। যেমন সুদামার নিকট হইতে খুদ কুঁড়া পাইয়াও

ভগবান প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেরূপ সামান্য জমি আছে এরূপ গরীব কৃষক যদি প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত একটু দেন তবে ভারতমাতা প্রসন্ন হইবেন। তাই ধনীর ভূমিদান হইতেছে 'দান' আর দরিদ্রের ভূমিদান হইতেছে 'যজ্ঞ'।

আর একটি কথা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। ভূদানযজ্ঞে এক ক্রান্তি-কারক বিচার-বোধকে সারা সমাজ-জীবনে রূপদান করিতে হইবে। এইজন্য যদি অল্প সংখ্যক লোকের দানের দ্বারা আবশ্যকীয় ভূমি প্রাপ্তি পূর্ণ হওয়া সম্ভবও হয় তথাপি তাহাতে ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। বিনোবাজী কেবলমাত্র প্রাপ্তব্য ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেছেন না, তিনি দাতার সংখ্যাও (কোটা) নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। তাই বিনোবাজী বিহারে ৮ লক্ষ দাতা ও ৩২ লক্ষ একর ভূমি চাহিয়াছেন।

**দরিদ্র ভূমিদান দিবে কেন?**

আপত্তি করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞে গরীব কৃষকের নিকট হইতে দান লওয়া অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা। সাম্যবাদীরা তো এই আপত্তি করেনই। অন্যেরাও —এমন কি যাঁহাদের রাজনৈতিক দল বা কোন অর্থনৈতিক মতবাদের সহিত সম্পর্ক নাই এমন গ্রামসেবক গঠনকর্মীরা পর্যন্ত আপত্তির সুরে এই প্রশ্ন করেন যে, গরীব কৃষকের এখন যে জমি আছে তাহাতে তাহার নিজেরই পেট ভরে না। এই অবস্থায় তাহার নিকট জমি চাহিয়া ও তাহার নিকট জমি লইয়া তাহাকে আরও গরীব করিয়া দিলে কি লাভ হইবে? আপাত দৃষ্টিতে এই আপত্তি সংগত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করিলে এই আপত্তি অমূলক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আজ পর্যন্ত মানুষের আত্মজ্ঞান সাধারণভাবে নিজের পরিবার পর্যন্ত বিকশিত হইয়াছে। মানুষ নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্য কতই না ত্যাগ করে ও দুঃখ কষ্ট বরণ করে। কিন্তু পরিবারের বাহিরে মানুষ সাধারণতঃ হৃদয়হীন। মানুষ পরিবারের মধ্যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ; কিন্তু পরিবারের বাহিরে সাধারণতঃ তাহার আচরণ পশু প্রকৃতির সহিত তুলনীয়। ভূমি সমস্যার মূলেও পরিবার বহির্ভূত মানুষের প্রতি মানুষের এই সহৃদয়তার অভাব। এই ব্যাপারে ধনীও যেমন দরিদ্রও তেমন। নিজের

অপেক্ষা যে অধিক দরিদ্র তাহার প্রতি আজ দরিদ্র চাষীর সহানুভূতি নাই। নিজে দরিদ্র হইলেও ভূমিহীন দরিদ্রের তুলনায় সে সুখী। সুখী ও দুঃখী কথা তো আপেক্ষিকভাবে বলা হয়। একজন এমনি দুঃখী হইতে পারে কিন্তু অন্য দুঃখীর সহিত তুলনায় সে সুখী মনে হইতে পারে। ভূমিহীন নিঃস্ব দরিদ্র আজ সব চাইতে দুঃখী। সমাজে আজ কারুর সহিত তুলনায় সে সুখী মনে হইবে না। তাই সে সমাজের সকলেরই চক্ষে দুঃখী। সেজন্য অল্প ভূমিসম্পন্ন কৃষকেরও তাহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ ভূমিদান দেওয়া উচিত।

ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য স্বামিত্ব মোচনের দীক্ষা দান করা। যাহার দুই হাজার একর জমি আছে সে যেমন নিজেকে ভূমির মালিক মনে করে, যাহার দুই একর জমি আছে সেও তেমনিভাবে নিজেকে জমির মালিক মনে করে। তাই ধনীর ন্যায় দরিদ্র কৃষকেরও শুদ্ধির প্রয়োজন আছে। নচেৎ ক্রান্তির ভিত্তি কখনও দৃঢ় হওয়া সম্ভব নহে। মালিকত্বের মোহই মানুষকে পুঁজি-বাদের গোলাম করিয়া রাখিয়াছে—সে বড় মালিক হউক আর ছোট মালিকই হউক। যাহার সম্পত্তি দুইখানি মাত্র ল্যাঙগট—তাহারও ঐ দুইখানি ল্যাঙগটে আসক্তি থাকে। পুঁজিবাদের মূল এই। তাই কিছু-না কিছু দান ভূদান-যজ্ঞে অর্পণ করিয়া দরিদ্র কৃষকের মালিকত্ব বিসর্জনের দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

অনেক পুঁজিপতি নিজেদের সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য দরওয়ান-শান্ত্রী নিয়োগ করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষাকার্য হইতে পারে বটে কিন্তু তাহার দ্বারা পুঁজিবাদ টিকাইয়া রাখা সম্ভব হয় না। পুঁজিবাদে অল্প অল্প জমিও যাহাদের আছে বা অল্প স্বল্প ধনও যাহাদের আছে তাহাদিগকেও ভূমি বা ধনের মালিকত্ব দেওয়া হইয়াছে। তাহার দ্বারা পুঁজিবাদের বুনিয়াদ দৃঢ় করা হইয়াছে। বড় মালিক তো সংখ্যায় অল্প। ছোট ছোট মালিকই বেশী। এই সব দরিদ্র মালিকের মালিকত্বের মোহই আজ ভূমি বা ধনের পুঁজিবাদকে রক্ষা করিতেছে। বড় মালিকেরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষাকল্পে ক্রমে ক্রমে ছোট মালিকদিগকে বলিতে থাকিবে—'আমাদের একশত দুইশত একর যাইলে তোমাদের দু-পাঁচ একরও থাকিবে না; তাহাও চলিয়া যাইবে। যাহাদের কিছু নাই তাহারা তোমাদের ঐ দু-

পাঁচ একর ছিনাইয়া লইবে।' এইভাবে পুঁজিবাদ নিজেকে সংগঠিত করিয়া থাকে। যতদিন না এই সব দরিদ্র ছোট ছোট মালিক তাহাদের মালিকত্ব বিসর্জন দিবে ততদিন তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচিবে না আর পুঁজিবাদেরও অন্ত হইবে না। তাহারা মালিকত্ব ত্যাগ করিলে তবে বিচার ক্রান্তি রচনার পথ সুগম হইবে ও ভূমির পুনর্বণ্টন হইলে তাহাদের দারিদ্র্য দূর হইবে।

অত্যল্প জমির দরিদ্র মালিক অন্তর হইতে বৃহৎ জমির ধনী মালিকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। কেন? সমাজ হইতে ধনিকত্ব দূর করিতে সে চাহে না, বরং সে নিজেই উহার মত ধনী হইতে চায় ও হাজার হাজার একর জমি পাইবার লালসা সে অন্তরে পোষণ করিয়া থাকে। ভূদান-যজ্ঞে ভূমি আহুতি দিয়া দরিদ্র কৃষকগণ এই লালসা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। অত্যল্প করিয়া দিলেও যখন হাজার হাজার দরিদ্র কৃষক ভূমিদান দিতে থাকে তখন এমন এক নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যে, বৃহৎ জোতদার এবং জমিদারও দান দিতে প্রবৃত্ত হয়। বিহারে যে আজ বড় জমিদার ও রাজারা হাজার হাজার একর—লক্ষ একর পর্যন্ত ভূমিদান দিতেছেন ইহার পশ্চাতে এই পটভূমিকা রহিয়াছে। সর্বোদয় পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদাদা ধর্মাধিকারী এক সুন্দর উপমা দিয়া এই বিষয়টি বুঝাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কৃষক খাইবার জন্য যে শস্য রাখে তাহা পৃথক করিয়া রাখে এবং যে শস্য বীজের জন্য রাখে তাহাও পৃথক করিয়া রাখে। তাহার খোরাকীর জন্য যে শস্য রাখা হয় তাহা অপেক্ষা বীজ শস্য অধিক গুণ-সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধনীর দানে মালিকত্ব বাঁটোয়ারা হইবে। ধন ও ভূমির মালিকত্বের বণ্টন তাহার দ্বারা হইবে। কিন্তু মালিকত্বের বিসর্জনের ক্রান্তি গরীবের দানের দ্বারাই সম্ভব হইবে। গরীবের দানে ক্রান্তির বীজ-ধর্ম নিহিত থাকে, তাই অহিংস ক্রান্তির প্রক্রিয়ায় গরীবের স্বামিত্ব বিসর্জন এক মূলভূত বস্তু।"

দরিদ্র ঠিক মত বুঝিয়া অন্তরের সহিত যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দান দিবেন তাহার মূল্য দানের পরিমাণে নহে, তাহা অমূল্য; কারণ সে দান অভিমন্ত্রিত। সেই মহান দান সমাজের আবহাওয়াকে পূত ও পবিত্র করিয়া তুলিবে এবং তাহা বিচার-ক্রান্তি সৃষ্টি করিতে মহান প্রেরণা দান করিবে। সেই অমূল্য অভি-মন্ত্রিত দান হইবে সমাজের পক্ষে স্পর্শমণি। তাহার পরশে সারা সমাজ

সোনা হইয়া যাইবে। মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞের নকুলের কাহিনী স্মরণ করুন। তাহা হইলে ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার কয়েকদিন যাবৎ উপবাসী আছেন। ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে সামান্য পরিমাণ শক্তু (ছাতু) সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। পরিবারে ৪ জন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণপুত্র ও পুত্রবধূ। উহাতে ৪ জনের উদরপূর্তি হওয়া দূরের কথা প্রত্যেকের কয়েক গ্রাস করিয়াও হইবে না। ৪ জনের জন্য উহা ৪ ভাগ করা হইল। স্নান সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ তাঁহার অংশের শক্তুটুকু ভোজন করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, এক দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত কংকালসার ব্যক্তি তাঁহার দ্বারে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র না খাইয়া তাঁহার অংশের সবটুকুই পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তাহাকে খাইতে দিলেন ও নিজে উপবাসী রহিলেন। ক্ষুধার্ত আগন্তুক সেটুকু খাইয়া বলিতে লাগিল যে, উহাতে তাহার ক্ষুধার শান্তি তো হইলই না, বরং ক্ষুধা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণীও পরম স্নেহসহকারে তাঁহার অংশের খাদ্যটুকু তাহাকে ধরিয়া দিলেন। সে তাহা খাইয়া বলিতে লাগিল, তাহার ক্ষুধার জ্বালা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণপুত্র অতীব সহানুভূতি সহকারে তাঁহার অংশের শক্তুটুকু তাহাকে দিলেন। সে তাহা খাইল; কিন্তু তথাপি ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। তখন পুত্রবধূ পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার অংশের শক্তুকণিকাগুলি তাহাকে খাইতে দিলেন। সে তাহা খাইল। এখন তাহার ক্ষুধার শান্তি হইল। সে পরম পুলকিত হইয়া চলিয়া গেল। এক নকুল পার্শ্বের এক বৃক্ষের উপর বসিয়া এই সব ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল। ভোজনাবশিষ্ট কিছু পড়িয়া থাকিলে তাহা খাইবার জন্য নকুল তখন বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই ব্যক্তি যেখানে খাইয়াছিল সেখানে আসিল। কিন্তু সেখানে এক কণাও পাইল না। তখন সে সেই স্থানে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিলএবং উঠিবার পর সে দেখিল যে তাহার শরীরের অর্ধাংশ সোনা হইয়া গিয়াছে। আনন্দে তাহার ক্ষুধা চলিয়া গেল। সে মনে করিল যেখানে অতিথিকে খাওয়ান হয় সেখানে গড়াগড়ি দিলে শরীর স্বর্ণময় হইয়া যায়। তাই তখন হইতে যেখানে অতিথি ভোজন করান দেখে সে সেখানে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়।

তাহার একান্ত বাসনা তাহার শরীরের বাকি অর্ধাংশ স্বর্ণময় করিয়া লওয়া। কিন্তু তাহার পর বহু বৎসর কাটিয়া গেল। অসংখ্য অতিথি সৎকারের স্থানে গড়াগড়ি দিয়াও তাহার আর একটি লোমও সোনা করিতে পারিল না। অবশেষে রাজসূয় যজ্ঞ আসিল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অতিথি সেখানে ভোজন করিল। বড় আশায় সেই নকুল দিনরাত্রি রাজসূয় যজ্ঞের ভোজনালয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গড়াগড়ি দিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাহার আর একটি লোমও সোনা হইতেছে না। নকুলের এই অদ্ভুত কাণ্ড সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে তাহা দেখিতে আসিলেন ও নকুলের মুখ হইতে তাহার সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে অহঙ্কার হইতেছিল। নকুলের কাহিনী শুনিয়া তাহা দূর হইয়া গেল এবং তাঁহাদের অন্তরে এই জ্ঞানোদয় হইল যে, দরিদ্র অন্য দরিদ্রের প্রতি অন্তরের সহানুভূতি লইয়া তাহার জন্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দান দিলেও সে দানের মহিমা অতুলনীয়। সেই দান যেখানে দেওয়া হয় তাহার আশে পাশের আবহাওয়া পূত-পবিত্র হইয়া যায়।

গরীবের নিকট ভূমি চাওয়া সম্পর্কে যে আপত্তি করা হয় তাহার উত্তর দান প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"এই আপত্তির উত্তর দিতে আমার আনন্দ হয়। কেন না ইহার দ্বারা জ্ঞান প্রচার হইয়া থাকে। আমরা যে গরীবের নিকট হইতে জমি লইয়া থাকি তাহার কারণ ৪টি :—

(১) ভূমিহীন দরিদ্র আজ সমাজে সব চাইতে দুঃখী। উহার তুলনায় গরীব কৃষক কম দুঃখী। যখন আমরা কাহাকেও সুখী বা দুঃখী বলি তাহা তুলনামূলকভাবে বলিয়া থাকি। নিজের অপেক্ষা নিম্ন স্তরে যে আছে তাহার দিকে যদি কেহ তাকায় তবে সে নিজেকে সুখী মনে করিবে এবং নিজের চাইতে যে উপরে আছে তাহার দিকে যদি সে দেখে, তবে নিজেকে দুঃখী মনে করিবে। এইজন্য সমাজে যে সব চাইতে দুঃখী তাহার জন্য সকলের কিছু কিছু ত্যাগ করা উচিত। সমুদ্র সব চাইতে নীচের তলে আছে। সেজন্য পৃথিবীর সমস্ত জল সমুদ্র পানে প্রবাহিত হয়। পাহাড়ের জলও সমুদ্রের দিকে দৌড়িতে থাকে এবং মাঠের জলও সমুদ্রের দিকে যায়। যদি সেই জলকে বলা হয় যে 'তুই কেন সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিস্ রে, ওতো নীচের

দিক?' তাহা হইলে সে উত্তর দিবে—'আমি তো উঁচুর দিকে আছি? এজন্য আমি তো উহার দিকে ছুটিবই।' এই প্রকারে ধনীর যেমন কর্তব্য ভূমিহীনকে কিছু দেওয়া, তেমন গরীবেরও কর্তব্য ভূমিহীনকে কিছু দেওয়া। কারণ যে একেবারে ভূমিহীন তাহার তুলনায় গরীব কৃষক কিছু সুখী। অতএব ভূমিহীনের জন্য কিছু না কিছু করা সকলেরই কর্তব্য। আমার পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে এমন অন্ন আমার কাছে নাই তাহা সত্ত্বেও যদি কোন ক্ষুধার্ত আমার কাছে আসিয়া যায় তবে আমার কাছে যতটুকু আছে তাহার মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ তাহাকে দেওয়া আমার কর্তব্য। ইহা এক ধর্ম। আমি এই চিন্তাধারা সমাজে আনিতে চাহিতেছি।

(২) পরিশেষে আমি ইহা দেখাইতে চাই যে, জমিতে কাহারও মালিকত্ব থাকা উচিত নয়। আজ যেমন ধনী নিজেকে জমির মালিক বলিয়া মনে করে তেমনি গরীবও নিজেকে তাহার সেই অল্প জমির মালিক বলিয়া মনে করে। উভয়েই নিজেকে জমির মালিক মনে করে। আমরা উভয়কে এই মালিকত্বের মনোভাব ত্যাগ করাইতে চাই। যেমন তৃষ্ণার্তকে জল পান করান কর্তব্য, তেমনি যে জমি চাহিতেছে তাহাকে জমি দেওয়া কর্তব্য। কারণ জমি পরমেশ্বরের—ইহা আমি বুঝাইতে চাহিতেছি। আজ মালিকত্বের মনোভাব ধনী ও গরীব উভয়েরই রহিয়াছে। বনবাসী বাবাজীর যে দুইটি ল্যাঙ্গট আছে তাহার প্রতি তাঁহার যেমন আসক্তি থাকে, ধনী যাঁহার গাদী প্রমাণ কাপড় আছে তাঁহারও তেমনি উহার উপর আসক্তি থাকে। এজন্য আমি সকলের আসক্তি ত্যাগ করাইতে চাহিতেছি।

(৩) যদি আমরা ধনীর নিকট জমি চাহি তবে উহার জন্য তাহার উপর প্রভাব পড়া আবশ্যক। কিন্তু এই প্রভাব কি ভাবে আসিবে? আমাদের কাছে কি শক্তি আছে? আমাদের কাছে কি পিস্তল আছে? আমাদের কাছে পিস্তল নাই, আর পিস্তলের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাসও নাই। আমাদের তো ইহা মানা চাই যে, পিস্তলের দ্বারা কোন কাজ হইতে পারে না, পরন্তু উহার দ্বারা সব কাজ বিগড়াইয়া যায়। এইজন্য আমরা নৈতিক শক্তি নির্মাণ করিতে চাহিতেছি। যখন হাজার হাজার গরীব দান দিবে তখন নৈতিক শক্তির সৃষ্টি হইবে ও উহার প্রভাব ধনীদের উপর পড়িবে।

এবং এইরূপ এখন ঘটিতেছেও। প্রথমে তো ধনী লোকেরা আমাকে বিমুখ করিতেন কিন্তু এখন হাজারীবাগে তাঁহারা আমাকে কতই না জমি দিয়াছেন। তাঁহারা এখন আমাকে কেন জমি দিয়াছেন? এইজন্য যে, গরীবলোকে দুই-বৎসর যাবৎ আমার উপর দান বর্ষণ করিয়াছে। তাহা ধনীদের কাছে এক লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জা যাহার নাই তাহার লজ্জা আসা ভাল। শাস্ত্র বলিয়াছেন- "হ্রিয়া দেয়ম্।" ইহা নৈতিক শক্তি প্রকাশ পদ্ধতি। যতই দিন যাইতে থাকিবে ততই আমাদের কাজের দায়িত্ব ধনীরা গ্রহণ করিবে—ইহা আমাদের বিশ্বাস। যিনি এক লক্ষ একর দান দিয়াছেন সেই রাজাসাহেব আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে আমি বলিয়াছি যে, আপনি দান দিয়াছেন খুব ভাল করিয়াছেন, কিন্তু কেবল মাত্র ইহাতে কাজ হইবে না। আপনার অঞ্চলে অন্য লোকের কাছ হইতে দান সংগ্রহ করিবার কাজ আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি আমার কথা মানিয়া লইয়াছেন। ধীরে ধীরে বড় লোকেরা আমার কাজের দায়িত্ব লইবেন। কেননা গরীবেরা যে দান দিয়াছে তাহার দ্বারা এক নৈতিক শক্তি নির্মিত হইয়াছে।

(৪) আমি তো কয়েকবার বলিয়াছি যে, আমি আমার সেনা তৈয়ারী করিতেছি। উচ্চ-নীচভেদ আমাকে দূর করিতে হইবে এবং এমন সেনা তৈয়ারী করিতে হইবে যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা লড়াই করিতে সমর্থ হইব। যাঁহারা দান দিয়াছেন বা ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাই আমাদের সৈনিক হইবেন। আমাদের সেনা হিংসাশ্রয়ী নহে। সহিংস সেনাতে যাহার ছাতি ৩২ ইঞ্চি তাহাকে সৈন্যদলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আমাদের সৈন্যদলে ভর্তি হইতে হইলে ত্যাগের ছাতি থাকা চাই।"

ভূদানযজ্ঞে গরীবের নিকট হইতে ভূমিদান গ্রহণের প্রশ্ন সম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন যে, ভূদানযজ্ঞে দান দেওয়া ধর্মকার্য। ধর্মের আচরণ একমাত্র ধনী করিবে আর গরীব তাহা করিতে পারিবে না—এমন হইতে পারে না। ধনীর অর্থ আছে বলিয়া গাড়ী চড়িয়া গিয়া কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু গরীবের গাড়ীভাড়া দিবার অর্থ

নাই বলিয়া সে বিশ্বনাথ দর্শন না করিয়া থাকিবে কেন? সে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া আসিবে। এই কথা শুনিয়া হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে, ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কেও গরীব এইরূপ মনোভাব অবলম্বন করিতে পারিবে। কিন্তু আজ আর সেরূপ কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। বিনোবাজীর হাতে তো দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও সর্বস্ব অর্পণ করিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিতেছে। কিন্তু যখন দেখি যে অন্যের হাতেও দরিদ্রেরা ঐরূপ মনোভাবে ভূদান অর্পণ করিতেছে তখন বিচার-ক্রান্তি যে সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে ইহা বুঝিতে বাকি থাকে না। এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতে চাই। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ভূদানযজ্ঞের কাজে গয়া জেলার গ্রামগুলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কুমারী বিমলা ঠকার (শ্রীদাদা ধর্মাধিকারীর কন্যা) তাঁহার সংগে ছিলেন। তিনি উক্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত সর্বোদয় পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

খিজরসরায় গ্রামে ভূদানযজ্ঞের সভায় জয়প্রকাশজী ভাষণ দিবার পর ভূমিদান চাহিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। "বিনয়পূর্ণ সৌজন্যমূর্তি রূপে তাঁহাকে দরিদ্রনারায়ণের জন্য ভূমিদান ভিক্ষা মাগিতে দেখিয়া জনতা গদগদ হইয়া গেল।" ভূদান ঘোষণার বর্ষা শুরু হইল। এক মুসলমান ভাই দাঁড়াইলেন। তাঁহার মাত্র ১৫ কাঠা জমি। তিনি বলিলেন—'এক কাঠা নিন।' হরিজন ভাইরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বলিলেন—'আমাদের কাছ থেকেও নিন। আমরা কেন এই দান গংগায় স্নান করিব না?'

জেঠিয়ান নামক এক স্থানে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণজী জনসভায় ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়া ভূমিদান চাহেন। "ভূমিদান বর্ষিত হইতে লাগিল। বাবু শিবধর সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—'সাড়ে ছয় বিঘা'। জয়প্রকাশজী ঘোষণা করিলেন, 'সাড়ে ছয় বিঘা'। একজন কর্মী আস্তে আস্তে জয়প্রকাশজীর কানে কানে বলিল, "ইহার ঐ সাড়ে ছয় বিঘা মাত্র জমি। সব জমি দিলে সে খাইবে কি?" জয়প্রকাশজী সভায় ঘোষণা করিলেন—"এই ভাই-এর উপার্জনের আর অন্য পথ নাই। ইঁহার দানবৃত্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি। সুতরাং এক বিঘা মাত্র রাখিয়া বাকি সাড়ে পাঁচ বিঘা তাঁহাকে ফেরৎ দিলাম।" দাতা বাবু শিবধর সিংহ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত

জোড় করিয়া বলিলেন, "মহারাজ দান যদি ফেরৎ দেন তবে আমি অনশন করিব। আমার শরীরে শক্তি আছে। কোথাও উপার্জন করিয়া আমি আমার পেট ভরাইতে পারিব। আজ পর্যন্ত ধরিত্রীর নিকট হইতে আমি সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমার অন্য গরীব ভাইরা সেই সুখ প্রাপ্ত হউক।" জয়প্রকাশজী গদগদ হইয়া গেলেন। তিনি দাতাকে বলিলেন, "আমি আপনার কাছে নত মস্তক হইতেছি। আপনি শিবি, দধীচি, হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণের বংশধর। যে দানবীর শরীরের অংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া দান করিয়াছিলেন, যে দানবীর নিজের অস্থি শরীর হইতে নিষ্কাষণ করিয়া লইয়া দান করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদের বংশজ! তাঁহাদের রক্ত আপনার ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে—ইহা আমার খেয়াল ছিল না। দাতার ইচ্ছানুসারে আমি এই দান গ্রহণ করিলাম।" এই সভাতে দরিদ্র হরিজন ভাইরা ২৫ একর জমি দান করেন। এই সভায় এত লোক ভূমিদান করিয়াছিলেন যে, দানপত্র যাঁহারা লিখিতেছিলেন তাঁহারা লিখিতে লিখিতে ক্লান্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে বজীরগঞ্জ নামক এক স্থানের কথা। সেখানেও জয়প্রকাশ নারায়ণজী জনসভায় ভূদানযজ্ঞের মহত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর দানপত্র বর্ষিত হইতে লাগিল। "একটু পরে ভাগবত পাঁড়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার ৩ বিঘা জমির দান ঘোষণা করিলেন। অন্য একজন ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন—'১৯৩০ সাল হইতে পাঁড়েজী দেশের জন্য অসীম ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। ঐ ৩ বিঘা জমিই তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি। এখন আবার তাহা তিনি ভারতমাতার চরণে অর্পণ করিয়া দিলেন। তাঁহার ছেলে-পিলেদের জন্য তাঁহার চিন্তা না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চয় উহাদের জন্য চিন্তা করি! এজন্য আমি আমার নিজের জমি হইতে ৫ বিঘা জমি পাঁড়েজীকে দিতেছি।' জয়প্রকাশজীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এরূপ মানবতার সাক্ষাৎকারের জন্য বিনোবাজী এই আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন!

অম্বা নামক গ্রামে এক মুসলমান ভাই, নাম গফুর—তাঁহার যাহাকিছু জমি ছিল তাহা ভূদানযজ্ঞে দান করেন। অম্বার সভা হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া অন্য একটি স্থানে যাইবার জন্য যখন জয়প্রকাশজী মোটরযোগে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন গ্রামের প্রান্তে দেড়শত-দুইশত লোক তাঁহার

জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা জয়প্রকাশজীর হাতে দানপত্র দিয়া বলিলেন—'আপনি তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন। এজন্য আমরা দুঃখ পাইয়াছি। আমরা ২ ঘণ্টায় এতগুলি দানপত্র সংগ্রহ করিয়াছি। অনুগ্রহ-পূর্বক ইহা গ্রহণ করুন।' ঐ সকল দাতা দরিদ্র ছিলেন।

**আন্দোলনে দরিদ্রের কর্তব্য**

সর্বাত্মক ক্রান্তি সাধনের কার্যক্রম এরূপ হওয়া চাই যাহাতে তাহার মধ্যে দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য কার্যক্রম থাকে অর্থাৎ যাহাতে সর্বশ্রেণীর লোক ক্রান্তি সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় ও করে। নচেৎ প্রকৃত ক্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। ভূমি চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি বা ধনদৌলত-অর্থের অংশ না চাহিলে ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকে। তাই সম্পত্তিদানযজ্ঞ প্রবর্তন করা হইয়াছে। তাহাতে ভূমি যাহাদের নাই এমন ধনশালী ব্যক্তিদের এই ক্রান্তিকারক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই আন্দোলনে স্বল্প ভূমিসম্পন্ন কৃষক বা ভূমিহীন কৃষকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ নাই। উপরে দরিদ্র কৃষকের ভূমিদান সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের ভূমিদানের যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে স্বল্প ভূমির চাষী সম্পর্কে এরূপ আপত্তির কি কোন অবকাশ থাকে? বরং ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনে এযাবৎ যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে স্বল্প ভূমিবান দরিদ্র চাষী এই আন্দোলনে অধিকতরভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ও দাতাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহারা। এই অবস্থায় বিনোবাজীকে মন্তব্য করিতে হইয়াছে যে, "কেন জানি না ভগবান দরিদ্রের হৃদয়কে উদার ও ধনীর হৃদয়কে সংকীর্ণ করিয়াছেন।" এরূপ এক প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"যখন আমরা দান চাহিতে যাই তখন এরূপ অনুভব হয় যে গরীব লোক বেশী দেন, মধ্যম শ্রেণী কিছু দেন এবং ধনী শ্রেণী অত্যন্ত কম দেন। জমি তো তাঁহাদের কাছে বেশী আছে এবং তাহাতে সমাজে অশান্তির বিপৎপাতের বীজ নিহিত রহিয়াছে। গয়ায় তো দেখা গিয়াছে যে, ধনী লোক সাক্ষাৎই করেন নাই—লুকাইয়া গিয়াছেন। কিংবা যদি দান দিয়া থাকেন তবে খুব কমই দিয়াছেন। আমার মনে

এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যখন কোটি কোটি গরীব হৃদয় খুলিয়া দান দিবেন তখন বড়লোকদেরও দান দিতে হইবে। বড়লোকের উপর গরীবের দানের প্রভাব পড়িয়াছে ইহা দেখিতেছি।" হইয়াছেও তাহাই। হাজারিবাগ জেলায় ও পালামৌ জেলায় যখন হাজার হাজার দরিদ্র কৃষক জমিদান দিলেন, তখনই বড়লোকেরা ও বড় বড় জমিদারেরা হাজার হাজার—লক্ষ একর পর্যন্ত দান দিলেন। এরূপে দরিদ্র চাষীরা তাঁহাদের অকুণ্ঠ দানের দ্বারা অহিংস সৈনিকের কার্য সাধন করিতেছেন। ইহা একরূপ সত্যাগ্রহ। আন্দোলন যতই অগ্রসর হইবে দরিদ্র কৃষকগণ ততই অধিকাধিকভাবে ইহাতে সহযোগিতা দান করিবে আশা করা যায়।

এক্ষণে ভূমিহীন কৃষকের কথা। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আমি যে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছি তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ভূমিহীনদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে আমার কথা বুঝান। ভ্রমণের সময় আমি জমির মালিকদের সহিত কথা বলি ও কথা বলিতে চাহি কিন্তু ভূমিহীনদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে উৎসাহ, সাহস ও ধর্মের ভাব সৃষ্টি করা আমার পাদপরিক্রমার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি ইহা কেবলমাত্র বড় জমিদারদিগের সহিত কথাবার্তা বলার হইত তবে তাহার জন্য পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিতাম না, কারণ বড় জমিদারগণ শহরে বাস করেন।" তিনি চান যে ভূমিহীনেরা এখন তাঁহাদের ভূমি-ক্ষুধার কথা নিজেরাই বলুন। তাই তিনি মনে করেন যে, এখন ভূমিহীনগণকে জাগ্রত করিবার সময় আসিয়াছে। তাই তিনি বলেন—"আমি চৌদ্দ মাস বিহারে ভ্রমণ করিয়াছি। এতটা কাজ এখানে হইয়াছে। এখন সময় আসিয়াছে যখন গরীবদিগকে তাঁহাদের নিজেদের ক্ষুধার কথা নিজেদেরকে বলিতে হইবে। আমি তো তাঁহাদের ক্ষুধার কথা বলিতেছি কিন্তু এখন তাঁহাদেরই আগাইয়া আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কোন কোন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি দরিদ্রদিগকে জাগ্রত করিতে চাহেন না কি?' আমি বলি—এইজন্যই তো আমি পাদপরিক্রমা করিতেছি। বিহারে তের লক্ষ একর ভূমি পাওয়া গিয়াছে। প্রতি মাসে এক লক্ষ একর করিয়া জমি পাওয়া গিয়াছে। তাহার মূল্য আমি বিশেষ কিছু মনে করি না। কিন্তু ভূমিহীন দরিদ্র জাগ্রত হইয়াছে ও বুঝিতে পারিয়াছে যে, জমির উপর তাহাদের অধিকার আছে, শুধু অধিকার নয়—ঐ

জমি আবাদ করা তাহাদের কর্তব্য—ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক বলিয়া আমি মনে করি।" বিনোবাজী চাহেন যে, ভূমি পাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে ভূমিহীন-দিগকে দাবি তুলিতে হইবে। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"শিশু কাঁদিয়াই তাহার দাবি জানায়। মা ও শিশুর মধ্যে কতই না প্রেমের সম্বন্ধ! তথাপি শিশু কাঁদিলে তবে তখন মা তাহার দিকে মন দেন এবং তাহাকে দুধ পান করান। সেইজন্য ভূমিহীনদের পক্ষ হইতেও দাবি উত্থাপন করা প্রয়োজন। আমি তো তাহাদের হইয়া চাহিতেছি। তথাপি তাহাদেরও গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া ভূমি পাওয়ার দাবি জানান উচিত। তবেই তাহাদের জমি মিলিবে। অধিকার বোধ হইতে এই দাবি করিতে হইবে, ভালবাসার সহিত করিতে হইবে এবং জোরের সহিত করিতে হইবে। দরিদ্রের বলিতে হইবে যে ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে দেশরক্ষার জন্য দরিদ্রেরা প্রাণ দিবে এরূপ আশা করা হয়। যদি তাহা হয় তবে সেই দেশমাতৃকার ভূমির সেবা করিবার অধিকার তাহার থাকিবে না ইহা কিরূপ ন্যায় বিচার? এইজন্য গরীবের দাবি পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এই দাবি দরিদ্রগণের নিজেদের উত্থাপন করিতে হইবে।"

আজ ভূমিহীন দরিদ্র এই আন্দোলনে নিষ্ক্রিয় দর্শক বা নির্বাক দান-গ্রহীতা নহেন। তাঁহারাও সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে জড়িত হইতেছেন। এই আন্দোলনের মূল বিচার-ক্রান্তি। ভূমিতে যে সকলের সমান অধিকার এবং ভূমি যে তাঁহাদের সমানভাবে প্রাপ্য এই বোধ তাঁহাদের মধ্যে জাগ্রত হইতেছে। যেখানে পূর্বে জড়তাপ্রসূত শ্মশানের শান্তি বিরাজ করিত আজ সেখানে সে জড়তা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তাই বহু ধনী এই আন্দোলনের মধ্যে বিপদের ও অশান্তির আশংকা করিতেছেন। যাঁহাদের কখনও ভূমি-দান দিবার অভিপ্রায় নাই, তাঁহাদের পক্ষে বিপদের আশংকা করা অস্বাভাবিক নহে। যেসব স্থানে এই আন্দোলন সক্রিয়ভাবে চলিতেছে সেখানে ক্রমশঃ ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে এইরূপ ধারণা হইতেছে যে, জমি তাহাদের কিন্তু সেই জমি হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা ধনীর জমি চাষ করিবে না। ধনীদের প্রগাঢ় উদাসীনতা দেখিয়া বিনোবাজী এক স্থানে বলিয়াছেন—"আমি চাহি যে, আমরা গরীবদিগকে শিখাইয়া দিব যেন তাহারা নিজেদের শোষণে সহযোগিতা না করে। আজ আমরা এই শিক্ষা না

দিলেও তাহারা ইহা মনে করিয়া লইয়াছে যে, জমিতে তাহাদেরই অধিকার এবং তাহাদেরই জমি ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। তাহারা অন্যের জমি আবাদ করিবে না—এরূপ মনোভাব সৃষ্টি হইতেছে। ইহা হিংসক নহে। যদি গরীব নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে অসহযোগ করে তবে উহাকে অহিংসক বলিয়া মানিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, "কৃষিমজুরকে ভূমি দান করা হইলে নিজেদের জমি কাহার দ্বারা আবাদ করাইব?' কিন্তু তাঁহাদিগকে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, তাঁহারা জমি দেন বা না দেন যদি শ্রমিকেরা তাঁহাদের জমি চাষ করিতে অস্বীকার করে তবে তাঁহাদের জমিতে কিরূপে আবাদ হইবে? কেবলমাত্র ট্রাক্টর দিয়া জমি চাষ করা কি সম্ভব হইবে? এইজন্য ইহাতে আমি ভয় পাই না।" অতএব সমাজ পরিবর্তনের কাজে ভূমিহীন দরিদ্ররা নিষ্ক্রিয় নহে।

উপরন্ত যাঁহাদের ভূমি নাই অথবা ধনদৌলত নাই কিন্তু যাঁহাদের শারীরিক সামর্থ্য ও কর্মক্ষমতা আছে তাঁহারা যাহাতে এই ক্রান্তিকারক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন তজ্জন্য শ্রমদান যজ্ঞের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ভূমিহীন দরিদ্রগণ যতদিন ভূমি না পান অথবা পাইলেও, ভূদানযজ্ঞে প্রাপ্ত অনাবাদী ভূমি আবাদযোগ্য করিবার জন্য ঐ সব ভূমিতে কাজ করিয়া শ্রমদান করিতে পারেন।

ভূদানযজ্ঞে দরিদ্রদের কর্তব্য সম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন—"প্রথম কথা হইল, দরিদ্রকে আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যে সকল ব্যসন আছে তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। তবেই তাহাদের শক্তি বর্ধিত হইবে, নতুবা নয়। মনে করুন, কাল দরিদ্রদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করা হইল। যাহাদের ভূমি দেওয়া হইবে তাহারা যদি মদ্যপায়ী হয় তবে তো তাহারা জমি নিজের হাতে রাখিতে পারিবে না। এইজন্য শহর হইতে যে ব্যসন গ্রামের মধ্যে আসিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। এই আত্মশুদ্ধির কাজ দরিদ্রদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা, আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে। আমার এই কথা শুনিয়া আপনারা হয়ত আশ্চর্যান্বিত হইবেন। আপনারা বলিবেন, দরিদ্রেরা তো সব সময়েই পরিশ্রম করে। আমি বলিব, তাহারা পরিশ্রম করে সত্য কিন্তু

তাহারা বাধ্য হইয়া তাহা করে। যেটুকু কাজ তাহারা করে তাহাতেও তাহাদের আলস্য থাকে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহারা যে কাজ করে সে সম্পর্কে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে সকালে ক্ষেতে যাওয়া এবং সন্ধ্যায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসা ইহার মধ্যে ৮ ঘণ্টা কাজ করা ব্যতীত বাকি সকল সময়ই তাহারা আলস্যে কাটাইয়া দেয়। আলস্য এক মহা রোগ। ধনীদের মধ্যে তো আছেই, উপরন্তু দরিদ্রদের মধ্যেও ইহা আসিয়া গিয়াছে। এইজন্য তাহাদিগকে আলস্য ত্যাগ করিয়া সর্বদা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

তৃতীয় কথা, গ্রামে বিচার-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষে মিটাইতে হইবে। বিবাদে শক্তি ক্ষয় হয়। এইজন্য আমাদের মধ্যে যাহাতে ঝগড়া-বিবাদ না হয় তাহা দেখিতে হইবে। অবশ্য মতভেদ হইলে নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু সেগুলি গ্রামের সৎ-লোকের দ্বারা সমাধান করাইয়া লইতে হইবে। আপোষে যে ঝগড়া মিটান যায় তাহা বাহিরের লোকের নিকট লইয়া যাওয়া কেন? ঘরের বিবাদ বাহিরের লোকের নিকট লইয়া যাওয়া কি বিশ্রী ব্যাপার! প্রত্যেক গ্রামেই কোন না কোন প্রভাবশালী সৎলোক থাকেনই। অতএব তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার বিচারই মানিয়া লওয়া উচিত।”

আমরা যদি ভূদানযজ্ঞের কল্পনা ঠিকভাবে অনুধাবন করিয়া থাকি তবে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ভূদানপ্রাপ্তি ও ভূমি বিতরণ ভূদানযজ্ঞের কাজের সমস্ত বা প্রধান অংশ নহে। উহার প্রয়োজনীয় কার্য বিতরণের সময় হইতে আরম্ভ হইবে। দরিদ্র ভূমিহীনদের মধ্যে আলস্য, মাদকতা প্রভৃতি যেসব দোষ আছে তাহা সংশোধন করাইতে হইবে। ইহা উপরে বলা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকভাবে ও উন্নত পদ্ধতিতে জমি আবাদ করিবার প্রেরণা ও শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সহযোগের আদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে। যে ভূমিহীনদিগকে ভূমি দেওয়া হইল তাহাদের মধ্যে খাদি, গ্রাম্যশিল্প, নয়ী তালিম প্রভৃতি রচনাত্মক কার্য করিয়া গ্রাম-রাজ্য বা সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সুতরাং এই আন্দোলনের প্রতি স্তরে ভূমিহীন কৃষকের সজীব ও সক্রিয় হওয়ার সুযোগ ও আবশ্যকতা রহিয়াছে।

অতএব স্বল্প ভূমিসম্পন্ন কৃষক বা ভূমিহীন কৃষকের পক্ষে এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ নাই—এরূপ আপত্তি অমূলক।

**সাম্যবাদ ও ভূদানযজ্ঞ**

এরূপ আপত্তি করা হয় যে, সাম্যবাদীদের আন্দোলন নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন সফল হইলে হিংস্র বিপ্লব নিবারিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন প্রবর্তিত হয় নাই। ইহা এক স্বতন্ত্র বিচার। ইহা বিধায়ক (positive) মাত্র, নিষেধাত্মক (negative) নহে। যদি এমন হইত যে, সাম্যবাদীরা যে পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা ভারতের ভূমি সমস্যা সমাধানের কোন ভাল পন্থা নাই এবং থাকিলেও ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের দ্বারা সেই পথে ভূমিসমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া মাত্র হিংস্র বিপ্লব ঠেকাইবার চেষ্টা করা হইতেছে তবে তাহা কাপুরুষতা হইত। কিন্তু সাম্যবাদীরা সংঘর্ষ, অশান্তি ও রক্তের পথে যাহা সাধন করিতে চায়, ভূদানযজ্ঞ শান্তি ও প্রেমের পথে তাহা সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। হিংস্র বিপ্লবের দ্বারা মাত্র বাহ্য পরিবর্তন সাধিত হয়; কিন্তু অহিংস বিপ্লবে আন্তরিক ও বাহ্য উভয় বিপ্লব সৃষ্ট হয়। হিংস্র বিপ্লবে ভূমির বাঁটোয়ারা হইলে লক্ষ্মী লাভ হইতে পারে, কিন্তু সমাজের অন্তরে বিচার-বিপ্লব আসিবে না বা প্রেমের শক্তি সৃষ্ট হইবে না। অহিংস-বিপ্লবে অন্তরে চিন্তা-বিপ্লব ও বিচার-বিপ্লব আসিবে। সব ভূমি গোপালের, ভূমিতে সকলের সমান অধিকার—এই বোধ সমাজের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং সেই বিচারবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া ভূস্বামীগণ তাঁহাদের কৃত অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে স্বেচ্ছায় তাঁহাদের মালিকত্ব বিসর্জন দিবেন এবং তাহাতে সমাজরচনায় বিপ্লব আসিবে। ডাঃ রাধাকিষণ ইহাকে revolution by consent (সম্মতিক্রমে সাধিত ক্রান্তি) আখ্যা দিয়াছেন। বিরাট সমস্যার তুলনায় অত্যল্প হইলেও আড়াই বৎসরে এযাবৎ ৩৩ লক্ষ একরের অধিক ভূমি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ দেশের প্রায় সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে উত্তরোত্তর বর্ধিত

হইতেছে। দেশের হাওয়া পরিবর্তিত হইতেছে। উপরন্তু কেবল মাত্র ভূমি সমস্যার সমাধানে এই আন্দোলনের পরিণতি ঘটিবে না। ভূমি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান অহিংস সমাজ রচনার ভিত্তি পত্তন করিবে এবং উহা অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠায় পরিণতি লাভ করিবে। যদি এই পবিত্র পন্থায় ভারতের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় তবে ভারত কোন খারাপ উপায় অবলম্বন করিবে না। বিনোবাজী বলেন—"কাহারও পিপাসা লাগিয়াছে, যদি তাহার পরিস্কার জল মিলে তবে সে অপরিস্কার জল পান করিবে না। কিন্তু নির্মল জল না পাইলে সে ময়লা জল পান করিতে পারে। ভারতে ভাল পথে গরীবের সমস্যার সমাধান হইলে খারাপ পথ আসিবে না।" মোট কথা যেখানে দারিদ্র্য থাকিয়া যাইবে সেখানে সাম্যবাদ আসিতে পারে। ভারতেও আসিতে পারে—পৃথিবীর অন্যত্রও আসিতে পারে, উহাতে বাহিরের আক্রমনের আবশ্যকতা নাই।

সাম্যবাদীরা এরূপ আপত্তি করেন যে, ভূদানযজ্ঞ ধীরে ধীরে চলিবার রাস্তা। তাহাতে বিনোবাজী বলেন—"কিন্তু যে-স্থলে আজ পর্যন্ত লওয়ারই অভ্যাস ছিল, সেই স্থলে আমি তো সমাজকে দান দেওয়ার অভ্যাস শিক্ষা দিতেছি। অভ্যাস সৃষ্টির কাজ ধীরে ধীরেই হইয়া থাকে। আমার আকাঙ্ক্ষা তো সারা পৃথিবীর ভূমি পুনর্বণ্টন করা। আজ পৃথিবীর ছোট-বড় সব রাষ্ট্রই ভয়গ্রস্ত। এই ভয় হইতে মুক্তি পাইবার উপায় কাহারও জানা নাই। মুক্ত হইবার উপায় বাহিরের নয়—অন্তরের হওয়া চাই। ঐ পথ আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। কিন্তু লোকে বলে যে, আমার অহিংসার রাস্তা বড় লম্বা। যদি তাঁহারা তাড়াতাড়ি পেঁাছিবার রাস্তা চাহেন তবে ইহা ভুলিলে চলিবে না যে উহা মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইবে।"

বিহারে সাম্যবাদীরা ও ফরওয়ার্ড ব্লকের লোকেরা বিনোবাজীর কার্য-ক্রম সম্পর্কে সতর্ক হইবার জন্য জনসাধারণকে বলিয়াছিলেন। সেই বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া বিনোবাজী বলেন—"ইঁহারা বলেন যে, সংঘর্ষই জীবনের বুনিয়াদ। তাঁহাদের কাছে সারা জীবন সংঘর্ষময়। মাতা পুত্রকে স্তন্য পান করান। তাহা হইলে তাহা কি মাতার স্তনের সহিত বালকের সংঘর্ষ বলিতে হইবে? সারা দুনিয়া সংঘর্ষে চলে না; প্রেমেই চলে। মুমুক্ষুঃ

মৃত্যুর সময় নিজের প্রিয়জনকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে শান্তিতে তাহার মৃত্যু হয়, তবে উহা কি তাহার আঁখির সহিত প্রিয়জনের সংঘর্ষ? কিন্তু ইঁহারা ঠিকমত চিন্তাও করেন না। এই জন্য তাঁহাদের সব কাজই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়।

"তাঁহারা বলিয়াছেন যে, লোকেরা যেন আমার মোহজালে না পড়েন। কিন্তু তাঁহারা লোককে কি বলিতে চাহেন? যাঁহারা জমি পাইয়াছেন বা পাইবেন তাঁহাদিগকে কি এই বুঝাইবেন যে, সেই জমি যেন তাঁহারা গ্রহণ না করেন কিংবা ভূমিদান যিনি করিতে চান তিনি যেন তাহা না করেন? ইঁহারা এযাবৎ বরাবর শুভ সুযোগ নষ্টই করিয়াছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামেও সাম্যবাদীরা সহযোগিতা করেন নাই এবং তাহাতে এক বড় ভারী সুযোগ হারাইয়াছিলেন। এই জন্য আমি তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ দান করিতেছি—তাঁহারা এইবারের সুযোগ নষ্ট না করিয়া আমার আন্দোলনে সহযোগ করুন। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে তো দরজা সর্বদা খুলিয়া রাখা চাই।"

## কমিউনিষ্টগণের আপত্তির খণ্ডন

১৯৫৩ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে বিহারের মুঙেগর জেলার বীহট গ্রামে কমিউনিষ্ট কর্মীদের পক্ষ হইতে বিনোবাজীর নিকট প্রেরিত এক পত্রে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল। বিনোবাজী তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে উহার উত্তর প্রদান করেন। মার্কসপন্থীদের পক্ষ হইতে ভূদানযজ্ঞের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে সব আপত্তি উত্থাপন করা হইয়া থাকে বিনোবাজীর উক্ত জবাবে সে সমস্ত খণ্ডিত হইয়াছে। উত্তরদান প্রসঙেগ বিনোবাজী বলেন—"প্রথমে কমিউনিষ্টরা ভূদানযজ্ঞকে কেবল ভুলই মনে করিতেন না, উপরন্তু তাঁহারা বলিতেন যে এই আন্দোলন তাঁহাদের বিরুদ্ধে করা হইতেছে। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে, যেমন যেমন ভূদানযজ্ঞের ভাবধারা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, উক্ত ভাবধারার বিকাশ হইয়াছে, দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, ভারতে জাগৃতি আসিয়াছে এবং উহার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইয়াছে, তেমন তেমন কমিউনিষ্টের মধ্য হইতেও কিছু

কিছু লোক আগাইয়া আসিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে সহ-যোগিতা পাইয়াছি। কয়েকটি স্থানে তাঁহারা আমাকে দানপত্র দিয়াছেন এবং মানপত্রও দিয়াছেন। আর এখন তো একজন বড় কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীগোপালন ঘোষণা করিয়াছেন যে, 'যদিও ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন হইতে বিনোবাজী যতটা আশা করেন আমরা তাহা করি না এবং আমরা মনে করি যে আইন ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান হইবে না, তথাপি এই আন্দোলন একটি ভাল আন্দোলন বলিয়া মনে করি।' আমি মনে করি যে, শ্রীগোপালনের এই উক্তি তাঁহাদের হৃদয় পরিবর্তনের পরিচায়ক। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন যে, কাহারও হৃদয় পরিবর্তন হইতে পারে না। তাঁহাদের সেইরূপ মনে করা ঠিক নয়। যিনি স্বীকার করেন যে, হৃদয় পরিবর্তন হওয়া সম্ভব তিনি গৌরবের পাত্র। যিনি নিজের হৃদয়কে অপরিবর্তনশীল বলিয়া মনে করেন তিনি জড়। কারণ এইরূপ ভাবা জড়ের লক্ষণ—চেতনের নহে। আমি জানি যে, কমিউনিষ্টরা চেতন—জড় নয়। তাই তাঁহাদের কিছু হৃদয় পরি-বর্তন হইয়াছে। প্রথমে তাঁহারা এই আন্দোলনকে কেবলমাত্র অকার্যকর বলিয়া মনে করিতেন না। উপরন্তু ইহাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন। আজ তাঁহারা ইহাকে অকার্যকর বলিয়া মনে করিলেও ইহাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করেন না।"

কমিউনিষ্টদের আপত্তির একটি কারণ এই যে, ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন সফল হইলে ভূমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে ও তাহাতে ভারতের ক্ষতি হইবে। পুঁজিপতিরাও ঐরূপ মনে করেন এবং এই বিষয়ে তাঁহারা কমিউনিষ্টদের সহিত একমত। বিনোবাজী বলেন "কমিউনিষ্ট ও পুঁজি-পতি উভয়েই চান যে, উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হউক। কিন্তু বণ্টনের বিষয়ে উভয়ের মধ্যেই পার্থক্য রহিয়াছে। পুঁজিপতিরা বলেন যে দক্ষতা অনুসারে বণ্টন হউক আর কমিউনিষ্টরা সমবণ্টন চান উহাদের মধ্যে এইটুকুই প্রভেদ। কিন্তু আমরা চাই যে উৎপাদনও বিকেন্দ্রীকৃত হউক। এই বিষয়ে আমাদের সহিত বিরোধে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া যান। এইরূপে যাঁহারা পরস্পর-বিরোধী তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে এক হইয়া যাইতে পারেন।" এখানে কমিউনিষ্ট ও পুঁজিপতি উভয়েই উৎপাদনব্যবস্থা কেন্দ্রীকৃত করিতে

চান। তাই ভূমির খণ্ড বৃহৎ হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু ভূমির বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমির খণ্ড ছোট হইলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিলে এবং উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা থাকিলে ও সার দিলে উৎপাদনের হার কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম হয় না; বরং অনেক স্থলে বেশী হয়।

কমিউনিষ্টরা তাঁহাদের পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আপনার আন্দোলনে কয়েকটি ত্রুটি আছে। এজন্য উহা আমরা বিশ্বাস করি না।" তাহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"ইহার অর্থ এই যে, যদি ত্রুটি না থাকে তবে তাঁহারা এই আন্দোলনে বিশ্বাস করিবেন।"

কমিউনিষ্টরা এই অভিযোগ করেন যে, বিনোবাজী দরিদ্রদের সংগঠনকে হিংসা করেন। তাহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমার সম্বন্ধে তাঁহাদের এই ধারণা ভুল। বরং আমি এই দাবি করিব যে, আমাদের এই দুই বৎসরের আন্দোলনে ভূমিহীনদের মধ্যে যে জাগরণ আসিয়াছে তাহা অন্য কোন আন্দোলনে হয় নাই। আমার কাছে ভূমিহীনরা হাজারে হাজারে আসে। তাহারা স্বীকার করে যে, তাহাদের পক্ষ হইয়া আমি দাবি করিতেছি।"

বিনোবাজী ভূমি ভিক্ষা চাহিয়া ভূমিহীনদের অধিকার ক্ষুন্ন করিতেছেন—কমিউনিষ্টদের এই আপত্তির উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমি অধিকারই চাহিতেছি, ভিক্ষা নয়। আমি ষষ্ঠাংশ দাবি করিয়া থাকি। ইহাতে যদি কাজ সফল না হয় তবে অধিক চাহিব। ভিক্ষুক কখন বলিতে পারে না যে, আমাকে অতটা দাও। ভিক্ষুক যাহা পায় তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে। যদি আমরা আশ্রমের জন্য ভূমি প্রার্থনা করিতাম এবং যদি কেহ সামান্য কিছু ভূমি দিত তবে আমরা তাহার উপকার স্বীকার করিতাম এবং আমরা আশ্রমের কার্য বিবরণীতে তাহার দানের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতাম যে, আমরা তাহার কাছে ঋণী। কিন্তু এই ব্যাপার অন্যরূপ। কেহ যদি এক হাজার একর ভূমিদান করেন এবং তাঁহার তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশী ভূমি থাকে তবে এক হাজার বিঘা ভূমি লইতেও আমি অস্বীকার করি। আমি বলি যে ইহা ভিক্ষা দেওয়া হইল। আমি ভিক্ষা লইতে আসি নাই—আমি দীক্ষা দিতে আসিয়াছি।"

কমিউনিষ্টরা অনুযোগ করেন যে, ধনবানেরা বিনোবাজীকে কেবলমাত্র আবাদের অযোগ্য পতিত ভূমি দিয়াছেন। তাহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমি হনুমানের কাজ করিতেছি। সমগ্র পর্বতই আমি রামের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিব। তাহার মধ্য হইতে প্রয়োজনমত বনস্পতি বাছিয়া লওয়া যাইবে। আমি ধনবানদিগকে বলিয়াছি যে তাঁহাদের নিকট হইতে ৩২ লক্ষ একর ভাল জমি পাইতে চাই। তাহা ছাড়া পাহাড় দিলে তাহাও লইব। কারণ উহাও আমাদের মাতৃভূমির অংশ। আমরা তাহাকে ভালবাসি। উপরন্তু খারাপ জমি দিলেও তিনি তো কিছু ছাড়িতেছেন। যাহাই দিন না কেন, যখন কেহ কিছু দেন তখন তাঁহার অঙ্গনে আমাদের প্রবেশ ঘটে। অতঃপর আমরা এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহার রন্ধনশালায় পৌঁছিব এবং বলিব যে আপনার পুত্র আসিয়াছে, তাহাকে খাইতে দিন। তখন তিনি খাওয়াইতে বাধ্য হইবেন।"

ভূদানযজ্ঞের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কমিউনিষ্টগণের যে আপত্তি ছিল তাহার উত্তরদান প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন যে, ধনবানদের মধ্যে যাঁহারা সজ্জন ও উদারচিত্ত তাঁহাদিগকে তিনি দান দিবার ও মালিকত্ব ত্যাগ করিবার প্রেরণা দান করিয়া ও তাঁহাদের নিকট হইতে দানগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার ভাবধারায় দীক্ষিত করিতেছেন এবং ধনবানদের মধ্যে যাঁহারা কৃপণ ও সঙ্কীর্ণ-হৃদয় তাঁহাদের নিকট হইতে উক্ত সজ্জনদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। কমিউনিষ্টগণ ধনবানদিগকে দরিদ্রের শত্রু বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের সহিত দরিদ্রের সংঘর্ষ ও লড়াই বাধাইতে চান। তাই কমিউনিষ্টগণ ভেদ, বিরোধ ও লড়াই-এর ভাষা ব্যবহার করেন। তাই ঐরূপ ভাষার মাধ্যমে তাঁহা-দিগকে বুঝান সহজ হয়। এইজন্য বিনোবাজী অভেদবাদী হইয়াও ভেদের ভাষা ও লড়াইএর ভাষা ব্যবহার করিয়া বলেন, "আমি দরিদ্রের শত্রুদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইতেছি। কমিউনিষ্টরা দরিদ্রের সকল শত্রুকে এক মনে করেন। ইহাতে সজ্জন ও দুর্জন এক হইয়া যায়। আর তাহাতে শক্তি বৃদ্ধি হয়। ধনবানদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা দশজন তো ভাল লোক আছেন। যদি সেই দশজনকে পাওয়া যায় তবে তাঁহাদের পুণ্যের ফল বাকি নব্বইজনের মিলিবে। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সজ্জন তাঁহাদিগকে আমি অহিংস

উপায়ে ভাঙগাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছি। ভেদনীতির এই প্রয়োগ-কৌশল যিনি বুঝেন না তিনি রাজনীতি বুঝেন না, নীতিশাস্ত্রও জানেন না।” তিনি আরও বলেন যে, কুস্তি লড়িবার সময় সামনের লোকের সহিত হাত মিলাইতে হয়—জয় যাহারই হউক না কেন এবং সেইজন্য তিনি বড় বড় জমিদার ও রাজাদের সহিত কুস্তি লড়িবার জন্য হাত মিলাইয়াছেন। যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে তবে কমিউনিষ্টদের এই মতই প্রমাণিত হইবে যে, ধনবান-দের মধ্যে শতকরা একশ' জনই দুর্জন আর তাঁহার জয় হইলে দরিদ্রের মঙ্গল সাধিত হইবে। সুতরাং তিনি যে হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন তাহাতে কমিউ-নিষ্টদের কোন ক্ষতি নাই।

বর্তমান অবস্থায় আইনের দ্বারা ভূমি সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব কিনা এই সম্পর্কে তিনি বলেন—“প্রভাব তিন প্রকারের হয়। প্রথম—হত্যা করিয়া, 'ভূমি দাও নহিলে গুলি চলিবে'। দ্বিতীয়—আইনের প্রভাব, তৃতীয় —নীতির দ্বারা জনমতের প্রভাব। আমরা নৈতিক প্রভাব চাই। নৈতিক চাপ ব্যতীত হৃদয় পরিবর্তন করিতে পারিব এইরূপ দাবি আমি করি নাই। ইহার পরই আইন তৈয়ারী করা যাইতে পারে। আপনারা আইনে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আইনে শক্তি আসে কোথা হইতে? আইনে হয় জনতা না হয় সৈন্য হইতে শক্তি আসিবে। যদি ২৫ একরের 'সিলিং' (ব্যক্তিগত মালিকানায় ভূমির উচ্চতম পরিমাণ) নির্ধারিত হয় তাহা হইলে হাজার হাজার মধ্যবিত্তের নিকট হইতে ভূমি লইতে হইবে। দুনিয়ায় মধ্যবিত্তরাই রাজত্ব করিতেছে। তাঁহারা শিক্ষিত। খবরের কাগজ তাঁহারাই পরিচালনা করেন। এইজন্য মধ্যবিত্তদের নিকট হইতে আইনের বলে বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লওয়া যাইতে পারে না। তাঁহাদের নিকট হইতে যদি ভূমি লইতে হয় তবে রক্তাক্ত বিপ্লবের দ্বারাই লইতে হইবে। রক্তাক্ত বিপ্লব এখানে অসম্ভব। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, যখন 'সিলিং'এর কথা উঠে তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভূমি ভাগ করিয়া লয়। এইজন্য আইনের দ্বারা সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভবপর হইবে যখন বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লওয়ার জন্য অন্য কোন উপায় বাহির হইবে। উহাও মধ্যবিত্তদের সম্মতি অনুসারে করিতে হইবে। ভারতবর্ষের সংবিধানেও ক্ষতিপূরণের কথা আছে। উহাও কোন অনুচিত কথা নয়, কারণ আইন

জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে। কমিউনিষ্টদের বক্তব্য হইল 'উহা ভুল তৈয়ারী হইয়াছে'। কিন্তু যে ভুল জনমত করে তাহাকে ভুল বলা উচিত নয়। এইজন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আইন তৈয়ারী করিয়াও ভূমি পাওয়া যাইবে না। লোকেরা নিজেদের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া লইবে এবং যে যৎসামান্য ভূমি পাওয়া যাইবে তাহাও খারাপ হইবে। আমি খারাপ ভূমি লওয়ার সাথে সাথে ভাল ভূমিও লোকদের নিকট চাই।"

মানব হৃদয়ের মৌলিক সততা ও অন্তিমে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সংঘটন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"কমিউনিষ্ট ভাইরা সজ্জনতার উপর বিশ্বাস না রাখিলে তাঁহাদের গুরু যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সফল হইতে পারে না। তাঁহাদের গুরু কার্ল মার্ক্স বলিয়াছেন যে, প্রথমে দরিদ্রের রাষ্ট্র হইবে এবং তাহার পর রাষ্ট্র আর থাকিবে না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কাহারও হাতে কোনরূপ ক্ষমতা না থাকিলেও রাষ্ট্র চলিতে পারে। যদি ইহা বিশ্বাস করা যায় তবে জনসাধারণের উপরও বিশ্বাস রাখিতেই হইবে। তাঁহারা ইহা বলেন যে, অবশেষে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি হইবে। কোনরূপ অধিকারের প্রয়োজন থাকিবে না। আর জনগণ সৎভাবে জীবনযাপন করিতে থাকিবে। তাহা হইলে সজ্জনতার উপর বিশ্বাস রাখিতে হয়। মার্কস যে কথা বলিয়াছেন তাহা দশ লক্ষ বৎসর পরে ঘটিবে এরূপ নয়। তাহা এখনই ঘটিবার কথা। যদি সজ্জনতার উপর বিশ্বাস না থাকে তবে রাষ্ট্রকে কায়েম রাখিতেই হইবে এবং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে state will wither away অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে—এই কথাটি ভুল। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করেন—এমন লোক কেবল কমিউনিষ্টদের মধ্যে নয় উপরন্তু কংগ্রেস এবং সর্বোদয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যেও আছেন। এই ভাবধারা সম্পর্কে তিনটি বিভিন্ন মত আছে। (১) কমিউনিষ্টরা মনে করেন যে, অবশেষে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিবে না কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্র অত্যন্ত পাকা এবং মজবুত হওয়া প্রয়োজন। তাই এখন সমস্ত অধিকার কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন। উহাকে তাঁহারা Dictatorship of Proletariate (সর্বহারার একনায়কত্ব) বলেন। তাঁহারা মনে করেন যে, বর্তমানে একনায়কত্ব হইলেও অবশেষে ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া

যাইবে। (২) দ্বিতীয় মত হইল আমাদের। আমরা মনে করি যে, রাষ্ট্র থাকিবে না এবং এখন হইতেই উহাকে ক্ষীণ করিবার কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। ধীরে ধীরে অধিকার বিকেন্দ্রীকৃত হওয়া প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত অধিকার বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব। (৩) এই কথা স্বীকার করেন এইরূপ লোক পৃথিবীতে অনেক আছেন। কংগ্রেস ও প্রজা-সোশ্যালিস্টদের মধ্যেও অনেকে এই কথা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য হইল এই যে, কোন না কোনরূপে রাষ্ট্র সর্বদাই থাকিবে। এইজন্য আমি কমিউনিষ্টদের বলি যে, তাঁহাদের এবং আমাদের ভাবধারায় একস্থানে মিল আছে। তাহা হইল এই যে অবশেষে রাষ্ট্র থাকিবে না। যদি তাঁহারা উহা জানেন ও এই বিষয়কে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে উহা কোন্ সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া? এই সিদ্ধান্তের উপর নয় কি যে, মানুষের হৃদয়ে সজ্জনতা আছে আর এইজন্য অবশেষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনই থাকিবে না? এইরূপ অবস্থায় মানুষের সজ্জনতার উপর বিশ্বাস রাখা উচিত।"

**সাম্যযোগ**

একথা পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সকল মনুষ্যের সম্যক ও সমান বিকাশ সাধন করা সর্বোদয়ের কাম্য। কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যকের সর্বাপেক্ষা অধিক হিত সাধিত হইলেই চলিবে না। কারণ তাহার অর্থ হইতেছে যে অবশিষ্ট যাহারা থাকে তাহাদের বিলোপ হয় হউক, তাহাদের নাশ হয় হউক তাহাতে উদ্বেগ বা চিন্তার কোন কারণ নাই। বরং অধিকাংশের সম্যক বিকাশের পথ সহজ করিবার জন্য তাহাদের বিলোপ সাধন আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে। ইহা তো মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ আমি কি, ইহা যদি আমরা গভীরভাবে মনন করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে আমি যাহা, অন্যেও তাহা। আমি অন্যের মধ্যে ও অন্যে আমার মধ্যে সমানভাবে আছে। আমার বিকাশ বা অভ্যুদয় পূর্ণ হইতে পারে না, যদি না ও যতক্ষণ না অন্যের বিকাশ বা অভ্যুদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, সকল মানুষের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান। এই আত্মা অনন্ত গুণসম্পন্ন

এবং অনন্ত ভাবেই বিকাশশীল। সকলের মধ্যে একই আত্মা। অতএব সকলের সমান বিকাশ হইতে পারে—যদিও একই জীবনে তাহা সম্ভব হয় না। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। জীবনকে বিভক্ত করিয়া দেখা যায় না তাই আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই এই সমদর্শন হওয়া চাই ও সমতা সাধন করা চাই। আজ যদি আমরা ব্যক্তিগত জীবন তথা সামাজিক ও জাগতিক জীবনপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। আজ জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এত দ্বেষ, হিংসা ও দ্বন্দ্ব কেন? এক দেশ অন্য দেশের ভয়ে ভীত কেন? ইহার মূলে এই রহিয়াছে যে, এক দেশ নিজেকে অন্য দেশ অপেক্ষা বড় মনে করে ও তাহাকে বাদ দিয়া নিজে উন্নতি ও সুখ ভোগ করিতে চায়। কারণ ঐ দেশ মনে করে যে, অন্যের উন্নতি তাহার নিজের উন্নতির পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইবে। এই ভ্রমাত্মক মনোবৃত্তি হইতে হিংসা ও দ্বেষের উদ্ভব হয় এবং তাহার নিজের ধ্বংসকে ডাকিয়া আনে। সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, মানুষ যেখানে জন্মের জন্য নিজেকে উচ্চ মনে করিয়া অন্যের সংস্পর্শকে দূরে সরাইয়া রাখে সেখানে সে নিজেই সংকীর্ণ হইয়া যায় এবং ঐ মনোবৃত্তি তাহাকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সংকুচিত করিয়া ফেলে। আমি যাহাকে নীচে বাঁধিবার বা দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিব সেও আমাকে নীচে টানিয়া নামাইবে। যদি আমাদের আশেপাশের সকলে নৈতিক দিক দিয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে তবে তাহার প্রতিক্রিয়া আমার নৈতিক জীবনে কিছু-না-কিছু না আসিয়া থাকিতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির মানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান এই মূল বিশ্বাস থাকিলে তবে নিজেকে সকলের মধ্যে এবং সকলকে নিজের মধ্যে দেখার দৃষ্টি লাভ করা যায় এবং তাহা হইতে সুখে দুঃখে সকলকে নিজের সহিত সমান করিয়া দেখার শিক্ষা লাভ হয়। বিনোবাজী ইহাকে "সাম্যযোগ" আখ্যা দিয়াছেন। সাম্যযোগই ভূদানযজ্ঞের মূল বিচারধারা। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৯—৩২ এই চারিটি শ্লোকে 'সাম্যযোগ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহা এই :—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥—২৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥—৩০
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥—৩১
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥—৩২

'যোগে সমাহিত চিত্ত, সর্বত্র সমদর্শী সেই যোগী নিজেকে সর্বভূতের মধ্যে এবং সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখিয়া থাকেন।'—২৯

'যিনি আমাকে (আত্মাকে) সর্বভূতে দর্শন করেন এবং সর্বভূতকে আমাতে দেখিতে পান তিনি আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হন না এবং আমিও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হই না।'—৩০

'যিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে (আত্মাকে) নিজের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া সাধনা করেন সেই যোগী যে কোন অবস্থায় অবস্থান করুন না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থান করেন।'—৩১

'হে অর্জুন, যিনি সুখে বা দুঃখে সকল জীবকে নিজের সহিত সমান করিয়া দেখেন সেই (সর্বভূতানুকম্পী) যোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহা আমার অভিমত।'—৩২

ইহা সাম্যের সমগ্র দৃষ্টি। বিনোবাজী যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী। তাই তাঁহার প্রাথমিক দৃষ্টি আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে তাঁহার সাম্যের প্রাথমিক দৃষ্টি ছিল—সাম্যযোগ বা সাম্যের সমগ্র দৃষ্টি। তাঁহার এই মৌলিক আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। তাঁহার সমদৃষ্টি সামান্য হইতে বিশেষে, সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে সংক্রমিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতার সমগ্রতা অর্থাৎ আত্মার একত্ব বোধ হইতে জীবনের বিশেষ বিশেষ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই একত্ব বোধ পৌঁছিয়াছে। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী রাস্কিনের 'অন্ টু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থ হইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবনের এক বিশেষ ক্ষেত্রে সমদৃষ্টির

প্রেরণা লাভ করেন। ক্রমশঃ ঐ সমদৃষ্টি জীবনের অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় এবং অবশেষে উহা সাম্যযোগে বা সাম্যের সমগ্র দৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করে। তাই মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দর্শনের প্রগতির প্রণালী inductive (আরোহ) এবং বিনোবাজীর জীবন-দৃষ্টির প্রগতির প্রণালী deductive (অবরোহ)। তাঁহাদের নিজ নিজ জীবন-প্রারম্ভের বৈশিষ্ট্য হইতে দৃষ্টি-প্রগতির প্রণালীর এই পার্থক্য সংঘটিত হয়।

**সাম্যবাদ ও সাম্যযোগ**

বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের মূল বিচারধারার নাম দিয়াছেন—সাম্যযোগ। এ-বিষয় উপরে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। সাম্যযোগের ভিত্তির উপর সর্বোদয় সমাজ গঠন করিতে হইবে। আজ জগতে যেসব বিচারপ্রবাহ চলিতেছে তাহার সহিত তুলনামূলকভাবে সাম্যযোগের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে সাম্যযোগের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ অনুধাবন করা সহজ হইবে। উপরন্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্যযোগ কিরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে তাহাও বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা হইলে সর্বোদয়ের স্বরূপ আমরা সহজে বুঝিতে সক্ষম হইব।

পৃথিবীতে আজ তিনটি প্রধান বিচারপ্রবাহ চলিতেছে—(১) পুঁজি-বাদ, (২) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও (৩) সাম্যবাদ। ইহার মধ্যে পুঁজিবাদ সব চাইতে পুরাতন। যোগ্যতা বা কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করাই পুঁজিবাদের কাম্য। বিনোবাজী বলেন—"পুঁজিবাদ কেবলমাত্র কার্যদক্ষতাকেই স্বীকার করে। পুঁজিবাদ বলে যে কিছু লোকের কার্যদক্ষতা কম, সুতরাং তাহা-দিগকে কম করিয়া দিতে হইবে। আর কিছু লোকের কার্যদক্ষতা বেশী, তাই তাহাদিগকে বেশী করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কার্যদক্ষতা অনুসারে পারিশ্রমিক দিয়া পুঁজিবাদ সমাজে যোগ্যতা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়াসী। পুঁজিবাদ প্রচলিত থাকার ফলে কিছু লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতম স্তর পর্যন্ত উঠিয়াছে সত্য কিন্তু তাহার ফলে বহুতর লোকের জীবন অবনতির অধঃস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। পুঁজিবাদের কাছে ইহার কোন প্রতিকার নাই। পুঁজিবাদ সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছে যে, যাহারা কার্যদক্ষ নহে তাহারা

অবনতই থাকিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর যিনি যোগ্যতা-সম্পন্ন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার অধিকার কেবলমাত্র তাঁহারই—ইহা অনিবার্য। এই কারণে আজ সারা জগৎ দুঃখার্ত এবং এই জন্যই পুঁজি-বাদের সমর্থকও আজ নিতান্ত কম। আজ হউক আর কাল হউক, ইহার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।"

সার্বজনীন ভোটাধিকার গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমাজ কল্যাণ সাধনের একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু ভোটের বলে কাজ চলিলে বহু ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। তাহার প্রতিকার গণতান্ত্রিক সমাজবাদে নাই। তাই বিনোবাজী বলেন—"গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির এক ভোট। এখানে ভোটের বলে কাজ চলিয়া থাকে। তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠেরই কল্যাণ সাধিত হয়। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ দাবি করে যে উহাতে সকলের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিকতার জন্য যে সব দোষ ঘটিয়া থাকে তাহা দূর করিবার উপায় সমাজবাদের হাতে নাই। যতদিন পর্যন্ত বহুসংখ্যকের রায়ের দ্বারা সংখ্যাল্পের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা হইবে ততদিন পর্যন্ত পূর্ণ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে না।"

এখন সাম্যবাদের কথা আলোচনা করা যাউক। বিনোবাজী বলেন—"সাম্যবাদ বলে যে উচ্চশ্রেণীর বিলোপ না করিলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। শ্রেণী-সংঘর্ষ ব্যতীত এবং আজ যাহার হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে তাঁহার বিলোপ সাধন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এতদূর পর্যন্ত হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক এবং উহাই হইতেছে ধর্ম। ইহা সুবিদিত যে ইহার দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ হিংসা হইতে প্রতিহিংসারই উদ্ভব হয়, যদিও হিংসার সাহায্যে তাহাকে কিছুদিন দাবাইয়া রাখা সম্ভব হয়। কেবলমাত্র তাহাই নহে। এই কারণে মনুষ্যত্বের মূল্যও ক্ষুণ্ণ হইতেছে এবং মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইতেছে।"

তাই সাম্যযোগের বিচারধারা সকলের গভীরভাবে বুঝা আবশ্যক। সাম্যযোগ কি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"সাম্যযোগ বলে যে সকল মানুষের মধ্যে একই আত্মা সমানভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদ আছে তাহা সাম্যযোগ স্বীকার করে না। উপরন্তু

মানুষের আত্মা এবং প্রাণীমাত্রের আত্মার মধ্যে কোন মৌলিক ভেদ নাই। তবে উহা এই পর্যন্ত স্বীকার করে যে, মানুষের আত্মার যে বিকাশ হওয়া সম্ভব অন্য প্রাণীদের আত্মার সে বিকাশ সাধন করা সম্ভব নয়। যদিও অনুশীলনের দ্বারা মানুষের আত্মার বিকাশ সাধন করা যায় তথাপি মানুষের মধ্যে সকলের বিকাশ সমানভাবে হয় না। প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা অধিষ্ঠিত। তাই যতদূর সম্ভব প্রাণীদিগকে রক্ষার জন্য প্রযত্ন করা কর্তব্য।

"সাম্যবাদ ও সাম্যযোগের পার্থক্য এই যে সাম্যবাদ আত্মার অভিন্নতা বিশ্বাস করে না কিন্তু সাম্যযোগ তাহা করে। সাম্যযোগ কেবলমাত্র আত্মার অভিন্নতা বিশ্বাস করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহা এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া আরও গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে। তাহার ফলে নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকে।

"যখন আমরা কোন মৌলিক, আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন তাহা জীবনের অনেক শাখায় অনুপ্রবেশ করিয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। আমাদের নিজেদের বুদ্ধিশক্তির মালিক আমরা নহি, তাহার মালিক একমাত্র ভগবান। আমরা যে সব গুণের অধিকারী তাহা সমাজেরই জন্য। অতএব আমরা যে সব শক্তি লাভ করিয়াছি তাহা সমাজের সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। আমরা ত নিজেদের শরীরের মালিক নহি। আমরা উহার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। যা কিছু সম্পত্তি আমাদের কাছে আছে তাহার মালিক আমরা নহি, তাহার মালিক ভগবান। ট্রাস্টীশিপ বা তত্ত্বাবধায়কতার বিচারধারা গ্রহণ করিলে পূর্ণ বিচার-ক্রান্তি আসিয়া যায়। আমাদের যাহা কিছু সবই সমাজকে সেবা করিবার জন্য। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমাজের চরণে অর্পণ করিয়া দেওয়া। সাম্যযোগ ও সাম্যবাদের মধ্যে এই বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।"

সাম্যযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাহা আর্থিক ক্ষেত্রে কিরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি করে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন— "যে ব্যক্তি নিজের সাধ্যমত পুরামাত্রায় সমাজের কাজ করিবে সেই ব্যক্তি তাহার জীবন নির্বাহের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা পাওয়ার অধিকারী হইবে। যে ব্যক্তির চক্ষু নাই যদি সে ব্যক্তি তাহার চক্ষু না থাকা সত্ত্বেও তাহার শক্তিকে

যতটুকু কুলায় ততটুকু কাজ করিয়া যায় তবে তাহার ভরণপোষণ পূর্ণভাবে পাওয়ার অধিকার আছে। যে ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তিহীন সে ব্যক্তি তাহার সাধ্যমত পূর্ণভাবে কাজ করিলেও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা তাহার কাজের পরিমাণ কম হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া কাজ করিবার শক্তি ও তারতম্য অনুসারে পোষণের ব্যবস্থায় তারতম্য করা অন্যায়। পোষণ ভৌতিক বস্তু এবং সেবা নৈতিক বস্তু। নৈতিক বস্তুর মূল্য ভৌতিক বস্তুর মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে না। নিমজ্জমান ব্যক্তিকে যে উদ্ধার করিয়াছে তাহার সেই দশ মিনিটের সেবার মূল্য মজুরীর হিসাবে পরিমাপ করা যায় কি? মা সন্তানকে সেবা করে, পুত্র পিতাকে সেবা করে, শিষ্য গুরুকে সেবা করে, মন্ত্রী সমাজকে সেবা করে কিন্তু এই সব সেবাকার্যের মূল্য পয়সার হিসাবে নির্ধারণ করা যায় না। যে সেবায় হৃদয় ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল্য কেমন করিয়া পয়সার দ্বারা নিরূপন করা সম্ভব হইবে। পুত্র মাতাকে যাহা কিছু দিয়াছে, বিদ্যার্থী গুরুকে যাহা কিছু দিয়াছে, কিষাণ সমাজকে যাহা কিছু দিয়াছে তাহা অমূল্য। নৈতিক মূল্যের মত আর্থিক ক্ষেত্রেও শ্রমের মূল্য সমান হওয়া চাই। কিন্তু আজ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। শারীরিক কাজ অপেক্ষা বুদ্ধির কাজের মূল্য বেশী দেওয়া হইতেছে, উহার প্রতিষ্ঠাও বেশী কিন্তু ঐ প্রকারের বৈষম্য একেবারে ভিত্তিহীন। সাম্যযোগের বিচারধারা আত্মার সমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই উহাতে আর্থিকক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য স্বীকার করা হয় না। তবে সেবকের ভূমিকা অনুসারে সেবার প্রকার ভেদ হইতে পারে। যে সেবা মা করিতে পারেন তাহা পুত্রের দ্বারা সম্ভব নয়, আবার যে সেবা পুত্র করিয়া থাকেন তাহা মা করিতে পারেন না। যে সেবা প্রভু করিতে পারেন তাহা ভৃত্যের দ্বারা সম্ভব নয়, আবার ভৃত্য যে সেবা করেন তাহা প্রভু করিতে পারেন না। ভাই যে সেবা করেন ভগ্নী তাহা করিতে পারেন না। আবার ভগ্নীর কাজ ভাই করিতে পারেন না। এরূপে ব্যক্তির পার্থক্য ও শক্তির পার্থক্য অনুসারে সেবার পার্থক্য খুবই হইতে পারে। কিন্তু সকলের জন্য সমানভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

"অঙ্গুলীসমূহ কম বেশী কাজ দেয় কিন্তু তাহারা সবই সমান। একটির দ্বারা যে কাজ হয় অন্যটির দ্বারা সে কাজ পাওয়া যায় না।

এরূপভাবে বুঝা আবশ্যক যে, সমাজে একের সেবা অন্যের সেবা হইতে ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু তাহার আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই।

"আমরা বুঝিয়াছি যে, সাম্যযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে যখন নৈতিক মূল্যের কোন পার্থক্য হয় না তখন আর্থিকক্ষেত্রেও পার্থক্য হওয়া উচিত নয়। বিকাশের জন্য প্রত্যেকের সমান সুযোগ পাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে পাওয়া আবশ্যক। বিদ্যার্থী তাহার গ্রহণশক্তি অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করিবে একথা সত্য কিন্তু তাহাতে পারিশ্রমিকের পরিমাণ কম বেশী করিলে সকলের উন্নতি ঠিকভাবে হইবে না। তাহাতে ক্ষেত্র পরিবর্তন করিয়া অন্যক্ষেত্রে যাইবার জন্য আকর্ষণ আসিয়া থাকে; আজকাল যেমন হইতেছে। সমান বেতনের ব্যবস্থা করিলে এই মনোবৃত্তি দমিত হইবে।

"আর্থিক ক্ষেত্রে সাম্যযোগের পরিণাম এই হইবে যে, প্রত্যেক গ্রাম সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। শস্য, বস্ত্র, দুধ, ঘি প্রভৃতি যে সব জিনিসের মৌলিক প্রয়োজন তাহা প্রত্যেক গ্রামে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইবে এবং তাহাতে গ্রাম স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। এই গ্রাম স্বাবলম্বী হইবে আবার ওই গ্রামও স্বাবলম্বী হইবে। এইভাবে উভয়েই স্বাবলম্বী হইলে সাম্যের উদ্ভব হইবে। যদি এই গ্রাম অপূর্ণ থাকে এবং ওই গ্রাম অপূর্ণ থাকে তবে উভয়ের অপূর্ণতার জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। যে জিনিসের মৌলিক প্রয়োজন আছে সেই সব জিনিস গ্রামে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। ভগবান সকলকে পরিপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধি ও শক্তি কম বেশী আছে কিন্তু ভগবানের ব্যবস্থা এমন বিকেন্দ্রিত যে তাহাতে সকলের বিকাশ হইতে পারে। এরূপ বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা আর্থিকক্ষেত্রেও হওয়া প্রয়োজন।"

রাজনৈতিকক্ষেত্রে সাম্যযোগের ফল ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন "সাম্যযোগের ফলে রাজনৈতিকক্ষেত্রেও বর্তমান মূল্যের পরিবর্তন হইবে। আমরা মাত্র শোষণহীন সমাজ চাই না, আমরা শাসনহীন সমাজ চাই। সাম্য-যোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে শাসন ক্ষমতা গ্রামে গ্রামে বণ্টন করা হইবে। অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে নিজেরই রাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মোক্ষকেন্দ্রে নামে মাত্র ক্ষমতা থাকিবে এরূপ হইতে হইতে শাসনহীন সমাজ গড়িয়া উঠিবে।"

সাম্যযোগ সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিপ্লবাত্মক পরিণাম সৃষ্টি করিবে তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"সামাজিকক্ষেত্রেও জাতিভেদ বা উচ্চনীচ ভেদাভেদ থাকিবে না। যদি কাহারও ব্রাহ্মণের গুণ থাকে তবে তাহাকে তদনুরূপ কাজ দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অন্যের অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া গণ্য করা হইবে না। এরূপভাবে মেথর, মুচি প্রভৃতিকে নীচ বলিয়া গণ্য করা চলিবে না। কারণ তাহাদের না হইলে সমাজ চলিতে পারে না।"

প্রকৃত ক্রান্তি বা বিপ্লব একমাত্র সাম্যযোগেরই দ্বারা আসিতে পারে। ইহা দাবি করিয়া বিনোবাজী বলেন—"এইভাবে নৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় উক্তরূপ পরিবর্তন আনয়ন করা সাম্যযোগের কাম্য। ইহাকে ক্রান্তি বলা হয়। আজকাল হিংসাকেই বিপ্লব বা ক্রান্তি বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু যেখানে মৌলিক বিষয়ে ক্রান্তি হয় না সেখানে মাত্র উপরে উপরে পরিবর্তন আসিলে তাহাকে বিপ্লব বলা ভুল। বিপ্লব তখনই হইবে যখন আমরা নৈতিক জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হইব। আমরা এই দাবি করি যে সাম্যযোগ নৈতিক মূল্যে পরিবর্তন সাধন করে। কারণ সাম্যযোগের ভিত্তি আধ্যাত্মিক এবং উহা জীবনের সমস্ত শাখা প্রশাখায় ক্রান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে।" অর্থাৎ আত্মার একত্ব মান্য করিলে তবেই নৈতিকক্ষেত্রে সমতার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইতে পারে—নচেৎ নয়। যেখানে নৈতিকক্ষেত্রে সমতা-বৃত্তির অভাব সেখানে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মৌলিক সমতা সৃষ্টি করা সম্ভব নহে।

সাম্যযোগের ব্যাপক দৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"সাম্যযোগের বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমে মোহ মমতা হইতে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ভূদানযজ্ঞ মোহ মমতা মুক্ত হওয়ার উপায়স্বরূপ। কিরূপে মুক্ত হওয়া যাইবে? জমির মালিকত্ব বিসর্জন দিয়া এই মুক্তি সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে। ভূমিদান দেওয়া কাহারও প্রতি কৃপা করা নহে। আরও অগ্রসর হইয়া আমি বলিব যে কোন প্রদেশে যদি জমি কম ও লোকসংখ্যা বেশী থাকে তবে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে গিয়া বসবাস করিতে পারিবে। তদ্রূপ এক দেশ হইতে অন্য দেশেও লোক গিয়া বসবাস করিতে পারিবে।

পৃথিবী মাতার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। তিনি যেখানে থাকিতে চান তিনি সেখানে থাকিতে পারিবেন। এইভাবে আমরা জগতের নাগরিক হইতে চাই এবং সর্বপ্রকার আর্থিক, সামাজিক তথা রাজনৈতিক ভেদ দূর করিতে চাই জমি অল্প হউক, ছোট টুকরা হউক কিংবা বড় হউক, তৎ সমস্তই পরমেশ্বরের দান। আমরা তাহার মালিক হইতে পারি না। ভারতবর্ষের অধিবাসী ভারতবর্ষের মালিক, জার্মাণীর অধিবাসী জার্মাণীর মালিক এ ধারণা ভুল। পৃথিবীতে যত বায়ু আছে, যত জল আছে, যত আলোক আছে, যত ভূমি আছে, উহা সকলেরই সম্পত্তি—ইহা সাম্যযোগের ব্যাপক দৃষ্টি।"

**আজ সখ্য-ভক্তির যুগ**

অনাদি কাল হইতে মানব-সমাজের বিকাশ হইয়া আসিতেছে। আত্মা অনন্ত-গুণসম্পন্ন। এক এক যুগের প্রয়োজন অনুসারে আত্মার এক এক গুণের বিকাশের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তখন সেই গুণের বিকাশ হয় এবং সেই সময়ে সমাজে সেই গুণের চিন্তন ও মনন হইতে থাকে। এরূপে সমাজে এক সময়ে পরিচ্ছন্নতা গুণের বিকাশের আবশ্যকতা হইয়াছিল। সেই যুগে সমাজে পরিচ্ছন্নতাকে ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হইত। আর এক যুগে কাম-নিয়মনের প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন কাম-নিয়মনের প্রচেষ্টায় বিবাহ প্রথার সৃষ্টি করা হইল। গুণ মাত্রকেই লোকে আদর করে সত্য, কিন্তু যুগের প্রয়োজন অনুসারে ও পরিস্থিতির পরিণতির ফল স্বরূপে সমাজে যে গুণের বিকাশের প্রয়োজন হয় সেই গুণকে প্রয়োগ করিবার জন্য সমাজ উৎসুক হইয়া উঠে। পরিচ্ছন্নতাকে আজ মানুষ আদর করে। কাম-নিয়মনকে মানুষ নিশ্চয়ই আদর করে। কিন্তু আজ আর উহার বিকাশের জন্য সমাজ উৎসুক হইয়া নাই। যে গুণের প্রয়োগ ও বিকাশের জন্য সমাজ আজ উৎসুক হইয়াছে তাহা কি বা কি কি? বিনোবাজী বলেন যে, আজ তিনটি গুণের আবশ্যকতার উদ্ভব হইয়াছে—(১) নির্ভয়তা, (২) সমতা ও (৩) সমাজ-নিষ্ঠা। সমতার বিষয় আমরা এখানে আলোচনা করিব। এক যুগে ভাল উদ্দেশ্য লইয়া শ্রেণী সৃষ্টি করা হইয়াছিল। বিনোবাজী এ সম্পর্কে বলেন—"এরূপ ব্যবস্থা ছিল যে প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষা

গ্রহণ করিতে পারে। সেই যুগে মানুষের যোগ্যতা দেখা হইত। সেই যুগের লোকে মনে করিতেন যে, যাহার বুদ্ধি কম তাহার লেখাপড়ার আবশ্যকতা কি? তাহাকে শ্রমের কাজে লাগাইলে ভাল কাজ হইবে আর যদি তাহাকে বুদ্ধির কাজে লাগান হয় তবে তাহার দ্বারা বুদ্ধির কাজও হইবে না আর পরিশ্রমের কাজও হইবে না।" এজন্য শ্রেণী বা বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কাহারও উপর রাজ্যভার ও দেশ রক্ষার ভার দেওয়া হইল। কাহারও উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারার্পণ করা হইল। আর কাহারও উপর দৈহিক শ্রমের কাজ করিবার ভার দেওয়া হইল। অন্যান্য বর্ণের সেবা করার কাজ আর এক শ্রেণীর উপর অর্পিত হইল। এখন আমাদের মনে হইতে পারে যে, শ্রেণী সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল না। ইহা ঠিক নয়। কোন খারাপ উদ্দেশ্য লইয়া শ্রেণী বা বর্ণ সৃষ্টি করা হয় নাই। বিনোবাজী বলেন—"পরে অসমতা বৃদ্ধি পাইল এবং লোকেরা মনে করিল যে প্রত্যেকেরই যোগ্যতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যে যুগে বিজ্ঞান ছিল না সেই যুগে শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের বিকাশ হইতে লাগিল তখন হইতে মনে হইতে লাগিল যে, বিজ্ঞানের সহায়তায় সকল মানুষের সমান বিকাশ হইতে পারে। অতএব শ্রেণীর আর কোন প্রয়োজন নাই।" সমাজের অন্যান্য অসমতামূলক বা সমতার পরিপন্থী যে সব ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল বা যাহা সৃষ্টি করা হইয়াছিল তৎসম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ আজ বিজ্ঞানের যুগে ঐ সব অসম ব্যবস্থা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই আজ সমাজে সমতার তীব্র বুভুক্ষা জাগিয়াছে। সমতা বিরোধী কোন কথা সমাজের ভাল লাগে না। সমাজে সমতা আনিবার যে কোন আন্দোলনই জনগণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কারণ আজ তাহা যুগের প্রয়োজন।

আজ সমতার যুগ আসিয়াছে। তাই সমাজে শ্রেণী শ্রেণীর মধ্যে, ব্যক্তি ব্যক্তির মধ্যে যে প্রেম, শ্রদ্ধা বা ভক্তি বিদ্যমান ছিল তাহার ভূমিকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিতে বাধ্য। পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন হয় পারস্পরিক প্রেমে ভক্তি বা শ্রদ্ধার প্রকারও তেমনি হইবে। পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হইতেছে। তাই প্রেম, শ্রদ্ধা বা ভক্তির প্রকৃতিতে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিতেছে। সমতার যুগে ভক্তির প্রকার হইতেছে—'সখ্য-ভক্তি'। শাস্ত্রে পাঁচপ্রকার প্রেমভাব বা ভক্তিভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলে যে, প্রেমভাব বা ভক্তিভাব পাঁচপ্রকার। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। শান্তভাব হইতেছে ঋষিদের ভাব। "স্বানন্দ-ভাবে পরিতুষ্ট"। "আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ।" মায়ের সন্তানের প্রতি যে ভাব তাহা হইতেছে বাৎসল্য ভাব। ননীগোপালের প্রতি যশোদার ভাব। মধুর ভাব হইতেছে শ্রীমতীর ভাব, গোপিনীর ভাব। দাস্য ভাব হইতেছে স্বামীর প্রতি সেবকের ভাব। রামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভাব হইতেছে দাস্য ভাব। আর সখ্য ভাব হইতেছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, সখার প্রতি সখার ভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের যে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রেমের ভাব তাহা হইতেছে—সখ্য-ভক্তি। যে ব্যক্তি অন্যকে যেমন দেখে বা ভাবে সেই ব্যক্তির তাহার প্রতি ভাবও তেমন হয়। যে যেমন দেখে তাহার ভাবও তেমনি। আবার যাহার যেমন ভাব সেও তেমনি। "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেই প্রকার হয়। আজ সমতার যুগ। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন যে, আজ সখ্যভক্তির যুগ। ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন—"অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সখ্যভক্তির ভূমিকা ছিল। একে অন্যের সমান এই ভাব লইয়া উভয়ে কাজ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল। অর্জুনের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার শক্তি পরিমিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অসীম ছিল। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সখ্যতা ছিল, উভয়ের মধ্যে সমতার সম্পর্ক ছিল। ভগবানের প্রতি অর্জুনের মনে আদর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু উহার মূল ছিল সমতায়। উহার পূর্বে এক যুগ ছিল যাহা দাস্য-ভক্তির যুগ। ঐ যুগে স্বামী-সেবকের ভাব ছিল। স্বামী এবং সেবকের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ছিল। কিন্তু স্বামী সেবকের পালন-পোষণ করিতেন এবং সেবক স্বামীকে ভক্তি করিতেন। উহা হনুমানের যুগ ছিল। হনুমান রামকে যে ভক্তি করিতেন তাহা ছিল দাস্য ভক্তি। আজ পৃথিবীতে সখ্যভক্তির ক্ষুধা খুব বেশী। ইহার অর্থ এই নহে যে যিনি পূজ্য পুরুষ তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকিবে না। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে এখন সমতার সম্বন্ধ থাকিবে। যখন যুদ্ধ আসিল তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা

করিলেন—'আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন কি? আপনি আমার সারথি হউন এবং আমার অশ্বগুলির দেখাশুনা করুন।' এইরূপে অর্জুন তাঁহার পরম পূজ্য ব্যক্তিকে অশ্বসেবার কাজ দিয়াছিলেন। মিত্রতার সম্বন্ধ ছিল বলিয়া এরূপ করিয়াছিলেন।

"হনুমানের আমলে সমাজের গঠন এরূপ ছিল যে, শক্তিশালী ব্যক্তি প্রভু হইতেন এবং সেবাপরায়ণ ব্যক্তি দাস হইতেন। প্রভু এবং দাসের মধ্যে প্রেম ও আদর থাকিত, কোনরূপ বিবাদ থাকিত না; কিন্তু সেই যুগে বিকাশের সীমা নির্দিষ্ট ছিল।

"রামচন্দ্র রাজারাম ছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ রাজা-কৃষ্ণ ছিলেন না। তিনি গোপাল কৃষ্ণ ছিলেন, বন্ধুই ছিলেন। বর্তমান যুগে পরস্পরের মধ্যে যতই প্রেম থাকুক না কেন প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক উপযোগী বলিয়া মনে করা হয় না। মধ্যে এমন সময় আসিয়াছিল যখন স্বামী অত্যাচারী হইয়াছিল এবং সেবকের মনে স্বামীর প্রতি কোন শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। আজ স্বামী-সেবকের সম্বন্ধ ভাল হইতে পারে কিন্তু আজ যুগের দাবি হইতেছে সখ্যভক্তি। স্বামী-সেবকের সম্বন্ধ এই যুগে পর্যাপ্ত নহে।

"এই জন্য আমরা যখন দান চাহি ইহা বলি না যে, 'আপনি শ্রেষ্ঠ, আপনি স্বামী, আপনি মালিক, আমাদিগকে দান দিন। আমরা আপনার সেবা করিব। আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।' আমরা তো ইহা বলি যে, সকলে ভাই ভাই। আমি সম অংশীদার। আমাকে আমার অংশ দিন। দানের অর্থ সম বিভাজন, সমান বণ্টন। ইহা শঙ্করাচার্যের অর্থ। এইজন্য যখন কেহ আমাকে একশত একরের মধ্য হইতে দুই একর দান দেন তখন আমি তাহা গ্রহণ করি না। যদি আমি দাসের মনোভাব লইয়া চাহিতাম তবে দুই একরও গ্রহণ করিতাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করিতাম, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতাম, তাঁহার উপকার মানিতাম কিন্তু আজ আমরা সখার সম্বন্ধের ভিত্তিতে চাহিতেছি। আজকার সমাজ গঠন সখ্যভাবকে মানিয়া লইবে। আজ গুরু-শিষ্য একে অন্যের মিত্র হইবে। একে অন্যের প্রতি প্রেম থাকিবে। গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন এবং শিষ্য গুরুকেও শিক্ষা দিবেন। যাহার কাছে যাহা আছে তাহা অন্যকে দিবেন। উভয়ে

উভয়ের উপকার স্বীকার করিবেন। এইভাবে সমতার সম্পর্ক স্বীকার করিয়া গুরু-শিষ্য থাকিবেন, মালিক-শ্রমিক থাকিবেন, স্বামী-সেবক থাকিবেন।

"এক সময় ছিল যখন পত্নী পতিকে পতিদেব বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজেকে দাসী বলিতেন। সে সময় খারাপ ছিল না। কিন্তু আজ আমরা একপদ অগ্রসর হইয়াছি। বর্তমান যুগের পত্নী পতিব্রতা হইবেন এবং পতি পত্নীব্রতী হইবেন। একে অন্যকে দেবতা মনে করিবেন। যাঁহার যোগ্যতা বেশী তিনি আদরণীয় হইবেন। যদি পতির যোগ্যতা বেশী হয় তবে পত্নী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন এবং পত্নীর যোগ্যতা অধিক হইলে পতি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের সম্পর্ক সমানতার সম্পর্ক থাকিবে। ইহাকে আমি সখ্যভক্তির যুগ বলিতেছি।"

বর্তমান যুগের এই পরিবর্তনের লক্ষণ আরও দুই-একটি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে। পূর্বে বাঙগালী পরিবারে ভ্রাতৃবধূকে কন্যাস্থানীয়া মনে করা হইত এবং ভ্রাতৃবধূ স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃসম জ্ঞান করিতেন আর সেইমত পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিতেন। আজকাল আধুনিক রুচিসম্পন্ন বাঙগালী পরিবারে ভ্রাতৃবধূ স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদরকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদরও ভ্রাতৃবধূকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা বা ভক্তির অভাব হয় নাই, তবে আজ তাহা সখ্যভক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। আধুনিক রুচিসম্পন্ন গুজরাটী পরিবারে পুত্র বিশেষতঃ বালক-বালিকা পিতাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। যথা—পিতার নাম 'মনুভাই'। পুত্র পিতাকে সম্বোধন করে 'মনুভাই'। এখানে পিতা-পুত্রের মধ্যে প্রেমভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যুগের পরিবর্তনে উহার প্রকার ভেদ হইয়াছে মাত্র।

বিনোবাজী আরও বলেন—"যুগের দাবি অনুসারে আমাদিগকে সমাজ গঠন করিতে হইবে। আজ তো ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক যে, পুরাতন যুগের যে মূল্য ছিল তাহা ঠিক তেমনিভাবে আজ টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। তুলসী-রামায়ণের সময়ে যাহার যে মূল্য ছিল, আজকার যুগে সেই মূল্য আর থাকিবে না। সেই যুগে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন কিন্তু আজকার

যুগের রামায়ণে—কেবল ব্রাহ্মণই যে শ্রেষ্ঠ ইহা মানা হইবে না। যিনি ভাল হইবেন তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন (কিন্তু সমতার সম্বন্ধ থাকিবে)।

"বর্তমান যুগে কারখানার মালিক এবং শ্রমিক থাকিবেন। একজনের বুদ্ধি অধিক। অন্যের শারীরিক শক্তি অধিক। শ্রমিক ইহা বলিবেন না যে, 'আপনি মালিক এবং আমি আপনার চাকর'। এই সম্পর্ক আর চলিবে না। এখন তো উভয়েই অংশীদার হইবেন। কারখানার মালিকের তাঁহার বুদ্ধির জন্য যে পারিশ্রমিক মিলিবে, শারীরিক শক্তির জন্য শ্রমিকেরও সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক মিলিবে। পারিশ্রমিক সমান হইবে কিন্তু যাহার যোগ্যতা বেশী তিনি আদরণীয় হইবেন। একে অন্যের মিত্র হইবেন, সাথী হইবেন।

"আজকার যুগে ভাই ভাইএর, গুরু শিষ্যের, পতি পত্নীর সম্বন্ধ নূতন ঢঙে গঠিত হইবে। উহাতে এক নূতন রুচি আসিবে। পুরাতন যুগেও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বাদ ছিল কিন্তু এখন উহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। পতি মহারাজ বিগড়াইয়া গিয়াছেন; তথাপি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করা হইয়াছে। এবং পত্নী সাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার আদর নাই। যেখানে সম্বন্ধই খারাপ হইয়াছে সেখানে নূতন যুগের দাবি সামনে আসিয়াছে।

"আজ যদি স্বয়ং রামচন্দ্রও পৃথিবীতে আসিয়া রাজারাম হইতে চাহেন আমরা তাহা স্বীকার করিব না। মহাত্মা গান্ধীও যদি আসেন আমরা তাঁহাকে রাজা গান্ধী করিব না। তিনি মহাত্মা গান্ধী রহিবেন। পুরাকালে ভাল রাজা ছিলেন কিন্তু উহা অপেক্ষা অনেক বেশী খারাপ রাজা ছিলেন। পূর্বে প্রজার বিকাশ সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু আজ সময় আগাইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি সময়ের পরিবর্তন অনুসারে চলিতে শিখে না সে ব্যক্তি হারও খায়, মারও খায়। প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া যদি মানুষ সাঁতারও না দেয় তথাপি প্রবাহ তাহাকে আগে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি সে প্রবাহের বিপরীত দিকে যাইবার চেষ্টা করে তবে তাহার কিছু ব্যায়াম হইবে সত্য কিন্তু সে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

"মানুষ যতই বড় হউক না কেন তাহার পুরান প্রতিষ্ঠা ও আড়ম্বর আজ আর চলিবে না। আমাদের কাছে ইহার এক উদাহরণ আছে। পরশুরাম কত বড় মহান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিরাট খ্যাতিও ছিল। তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তিনি অবতার ছিলেন। কিন্তু যখন রামচন্দ্রের নূতন অবতার হইল তখন তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া আবশ্যক ছিল যে এখন নূতন অবতার আসিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহা চিনিলেন না এবং রামচন্দ্রের সহিত লড়াই করিতে অগ্রসর হইলেন। উহাতে তিনি পরাজিত হইলেন। পরশুরামের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ যুগের বিরুদ্ধে যাইয়া যখন টিকিতে পারিলেন না তখন অন্য কেহ টিকিবে কিরূপে? পুরান রীতি যতই ভাল হউক না কেন তাহা নূতন যুগে ভাল প্রতিপন্ন হইবে না।

"আজ যখন কর্মীদের সহিত আমার কথা হইয়াছিল তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি যে আমার এক-ষষ্ঠাংশ চাই, যেন ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে। আমি তো বিচার বুঝাইতেছি যে, জমি সম্পত্তি ও উৎপাদনের সাধনের উপর এখন সকলের সমান অধিকার। যুগের দাবির কথা যে ব্যক্তি বলিয়া থাকে তাহাকে লোকে উদ্ধত বলে। যদি উহাকে উদ্ধত বলিয়া মনে করা হয় তবে সে উদ্ধত হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি যুগের ক্ষুধাকে চিনিয়া লওয়া হয় তবে যাহারা চাহিতে আসিবে তাহারা নম্র হইয়া থাকিবে এবং ছোট বড়কে শ্রদ্ধা করিবে।"

পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"লোকে বলে যে আজকাল সন্তানেরা মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করে না। সন্তান তো বাল্যাবস্থা হইতেই মায়ের উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়া চলিয়া থাকে। মা যদি বলেন যে উহা চাঁদ তবে ছেলে তাহা মানিয়া লয়। ছেলে তখন ইহা বলে না যে থাম, আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখি—সত্যসত্যই চাঁদ কি না। এত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও লোকে বলে যে সন্তানেরা মা-বাপকে মানে না। আমি তো ইহা বলিব যে মাতাপিতা যুগের প্রকৃতি বুঝেন না। মাতাপিতা সন্তানের সহিত সমানতার সম্বন্ধ রাখিয়া চলুন এবং সমতার ভিত্তিতে তাহাদিগকে স্নেহ করুন। তাহাদিগকে যেন মাতাপিতা হুকুম

না দেন, পরামর্শ দেন। আজ্ঞা না দেন; প্রহারও করিবেন না। পূর্বে মাতাপিতা প্রহার করিতেন কিন্তু ভালবাসার ভাব লইয়াই প্রহার করিতেন। এ যুগে উহা আর চলিবে না। এই যুগে মাতা বলিবেন যে আমি তোমাকে শাস্তি দিব না, আমি নিজেকে দণ্ড দিব, আমি উপবাসী থাকিব।

"সকলেরই আপন আপন বিশেষত্ব আছে। শ্রমিকের বুদ্ধি কম কিন্তু তাহার হৃদয়বত্তা অধিক হইতে পারে। কাহারও জন্য সে মরণ বরণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের বুদ্ধি অধিক হইতে পারে কিন্তু আমাদের দৈহিক দুর্বলতা আছে। প্রত্যেকেরই মধ্যে কিছু-না-কিছু দুর্বলতা আছে কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। এইজন্য সমতার সম্বন্ধের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে প্রেম থাকা চাই।"

এই দৃষ্টিতে যদি ভূদানযজ্ঞকে দেখা যায়—তবে ইহা যে এই যুগের দাবি তাহা সহজে বুঝা যাইবে। যদি ইহা যুগের দাবি না হইত তবে গরীবেরা পর্যন্ত দান দিতেন না এবং ধনী লোকেরা বিনোবাজীকে বাধা দান করিতেন। তাই বিনোবাজী এ সম্পর্কে বলেন—"এই নব বিচার আমি আমার থলীর মধ্য হইতে বাহির করি নাই। যুগ-প্রবাহ হইতে আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছি। এই বিচারধারাকে প্রসার করিবার দৃষ্টি লইয়া কাজ করুন—কেবলমাত্র কোটা পূর্ণ করিবার দৃষ্টিতে নহে। কেবলমাত্র কোটা পূর্ণ করিলে কাজ চলিবে না। যখন আপনারা জনগণকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন যে সখ্য ভক্তির যুগ আসিয়া গিয়াছে তখনই আপনাদের কার্যে সফলতা লাভ হইল বলিয়া মনে করিবেন।"

### সাম্যের স্বরূপ

বর্তমানের সমাজ-সংগঠন নিতান্ত বিকারগ্রস্ত। বিনোবাজী বলেন, উহা সংগঠন নহে; উহা বিধ্বংস। উহার সব চাইতে বড় ত্রুটি—বিরাট বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সাম্য কিরূপ হইবে? বিনোবাজী বলেন,—"আমাদিগকে নূতন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের হাতের পাঁচ অঙ্গুলীর নিকট হইতে আমাদিগকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই অঙ্গুলীগুলি পুরাপুরি

সমান নহে; আবার একেবারে অসমানও নহে। প্রত্যেক অঙ্গুলীর নিজের স্বাধীনতা আছে। উপরন্তু অন্য অঙ্গুলীর সহযোগিতা লইয়া প্রত্যেকে কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ঐ ভিত্তিতে আমাদিগকেও সমাজ রচনা করিতে হইবে—যাহাতে সেই নূতন সমাজে অত্যন্ত অসাম্য না থাকে অথচ অত্যন্ত সমানতাও না হয়। সেই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্ব থাকিবে এবং প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে এবং প্রত্যেকেই অন্যের সহযোগিতায় কাজ করিবে। ইহা বুঝাইবার জন্য আমি দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আমাদিগকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতে হইবে। তাহা হইলে আমরা হাতের পঞ্চ অঙ্গুলীর শিক্ষা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব। বিনোবাজী এক উদাহরণ দিয়া উহা বুঝাইয়াছেন। মাতা তাঁহার সন্তানদিগকে গণিতের হিসাবে সমান খাদ্য খাইতে দেন না। সব চাইতে ছোটকে শুধু দুধ খাইতে দেন। তার চাইতে বড়কে কিছু দুধ ও কিছু রুটি দেন এবং বড়কে শুধু রুটি দেন। ইহাই বিবেকযুক্ত সমতা। অহিংসার পথে সমতা আসিলে এই প্রকার সমতা আসিবে। কিন্তু অন্য দেশে হিংসার পথে যে সমতা আনয়নের চেষ্টা হইয়াছে সে সমতা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিনোবাজী বলেন—"ঐ প্রকারে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষুধা ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তি দেখিয়া উহার খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে হিংসার দ্বারা সমতা স্থাপন করা হইয়াছে সেখানে সকলকেই এক ছাঁচে ঢালা হইয়া থাকে। আমরা এই রকমভাবে সকলকে এক ছাঁচে ঢালা কখনও পছন্দ করিব না। আমরা বিবেকের দ্বারা সমতা আনিতে চাহিতেছি। আধ্যাত্মিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য।" আধ্যাত্মিক সমতার ভিত্তি হইতেছে—মালিকত্বের মোহ ত্যাগ। এ জমি আমার, এ গৃহ আমার, এ কৃষিক্ষেত্র আমার—এরূপ মোহ বিসর্জন দিতে হইবে। এই সব যাহা আমার তাহা সবই সকলের সেবার জন্য—আমি উহার রক্ষক মাত্র। আমি ট্রাষ্ট্রী মাত্র। এরূপ বিচার-বোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবেই সাম্যের আদর্শ সার্থক হইতে পারিবে। সম্পদ যাহা আছে তাহাতে যদি সকলের সঙ্কুলান না হয় তবে সকলেই কিছু কিছু কম করিয়া ভোগ করিবে। একখানি রুটিতে পেট ভরে। আট জন লোক। কিন্তু

মোট ছয়খানি রুটি। একজনের হাতে তিনখানি, আর একজনের হাতে দুইখানি; বাকি ছয়জনের হাতে মাত্র একখানি রুটি আছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সকলেই কিছু কম করিয়া খাইতে স্বীকৃত হয় এবং কেহ পৌনে একখানির বেশী না খায়। এরূপ সমতাত্মক মনোবৃত্তির এক দৃষ্টান্ত বিনোবাজী দিয়াছেন। "এক তামিল সাধু ছোট কুঁড়ে ঘরের বাহিরে শুইয়া রাত্রি যাপন করিতেন। এক রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় তিনি উঠিয়া ভিতরে গিয়া শুইলেন। তখন বাহির হইতে একজন দরজায় ধাক্কা দিল। সাধু বলিলেন—'ভাই এসো, ঘরে একজন শুইতে পারে কিন্তু দুইজন বসিয়া থাকিতে পারে।' তিনি তাঁহাকে ভিতরে লইলেন এবং উভয়ে বসিয়া রহিলেন। ইহার পর এক তৃতীয় ব্যক্তি বাহির হইতে দরজায় খট্ খট্ করিল। সাধু বলিলেন—'একজন শুইতে পারে, দুইজন বসিতে পারে কিন্তু তিনজন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। অতএব এসো, আমরা তিনজনেই দাঁড়াইয়া থাকিব।' তাঁহাকেও তিনি ভিতরে আসিতে দিয়া তিনজনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।" ভারতে সাম্যের এই আদর্শ গড়িয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে রুমীর মসনবীর এক গল্পের কথা মনে পড়ে।* "এক ছিল সুফী। সে তার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া দরজায় আঘাত করিল। বন্ধু বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—'Who is there? (কে?) সুফী বন্ধু বলিল, 'I am' (আমি তোমার বন্ধু)। বন্ধুটি তখন উত্তর দিল—'Begone: at my table there is no place for the two' (ফিরিয়া যাও বন্ধু, আমার টেবিলে দুইজনের স্থান হইবে না)। সুফী বন্ধু তখন মনে দুঃখ লইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু বিরহের আগুনে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল। তাই সে ভয় ও শ্রদ্ধা লইয়া ফিরিল। আবার তাহার বন্ধুর দরজায় আঘাত করিল। ভিতর হইতে আগের মতই শব্দ আসিল, 'Who is there?' (কে?) সুফী উত্তর দিল 'Thou beloved thou.' (হে প্রিয়তম, তুমি।) তখন দরজা খুলিয়া গেল ও বন্ধু বলিল-'Since thou art I, come in, there is no

* 'বিশ্ববাণী'—কার্তিক, ১৩৫৯। পৃষ্ঠা ৩৯৫—"মন ও মানুষ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

room for two I's in this room.' (তুমি যখন আমার সঙ্গে এক হইয়াছ, তোমার আমিত্ব যখন ঘুচিয়া গিয়াছে তখন ভিতরে আইস। কেননা আমার ঘরে দুইজন 'আমি'র স্থান নাই)।

### শ্মশানের শান্তি

এক স্থানে এরূপ আপত্তি করা হইয়াছিল যে, সেখানে শান্তি বিরাজ করিতেছিল কিন্তু বিনোবাজীর আন্দোলনের ফলে স্থানীয় লোকের মনে ভূমিক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে ও তাহাতেই অশান্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তাহাতে বিনোবাজী বলেন যে, সে শান্তি হইতেছে 'শ্মশানের শান্তি' এবং এরূপ শান্তির পরিবর্তে কোনরূপ অশান্তি ঘটিলে তাহা তিনি সহ্য করিয়া লইবেন।

### বিফলতার প্রতিক্রিয়া

যদি ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন পূর্ণভাবে সফল না হয় তবে কিরূপ পরিণতির সম্ভাবনা আছে তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের বিকাশ ও তত্ত্ব সম্পর্কে যেসব আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে তাহাতে উহা বিফল হইলে নিম্নলিখিত কয়টি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যায় :—

(১) যদি এই আন্দোলন আংশিকভাবেও সফল হয় (আংশিক সাফল্য যে সুনিশ্চিত এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই) তথাপি বিনা ক্ষতিপূরণে জমি সমবিভাজনের পক্ষে এরূপ আবহাওয়া সৃষ্ট হইবে যাহাতে সরকার বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমিবণ্টনের জন্য সংবিধান পরিবর্তন ও আবশ্যকীয় আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইবে। নচেৎ সরকারের পরিবর্তন অনিবার্য—একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু সহজে আইনের বা সংবিধানের এই পরিবর্তন হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমির পুনর্বণ্টন করিতে যাইলে মধ্যবিত্তদের স্বার্থে গুরুতর আঘাত পড়িবে। আজ কার্যতঃ ও মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের পরিচালনা তাঁহাদের হাতে। সংবাদপত্র তাঁহাদের হাতে।

তাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছু হইলে এত তুমুল আন্দোলন হয় যে সহজে কিছু করা সম্ভব হয় না।

(২) মালিকত্বের মোহ আজ ভূমির পুঁজিবাদকে রক্ষা করিতেছে। ছোট মালিকও নিজেকে জমির মালিক মনে করে। তাই বড়-ছোট-নির্বিশেষে জমির মালিকদের মধ্যে এক অলক্ষ্য জোট রহিয়াছে। উপরন্তু মালিকত্বের কোন স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখা দিলে বড় মালিকেরা ছোট মালিকদের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করিয়া থাকে যে বড় জোত চলিয়া যাইলে ছোট জোতের মালিকত্বও চলিয়া যাইবে। সেজন্য ছোট-বড় মালিক সকলে একতাবদ্ধ হইয়া এই আন্দোলনে বাধা দিতে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু সে সম্ভাবনা আর থাকিতেছে বলিয়া মনে হয় না। হাজার হাজার গরীব মালিক ভূমিদান দিয়াছে ও দিতেছে। তাহার প্রভাব বড় মালিকদের উপর পড়িয়াছে। বড় বড় জমিদার ও রাজারা হাজার হাজার একর—লক্ষাধিক একরও ভূমিদান দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহাদের অনেকে শুধু ভূমিদান দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন। বিহারের রাঁচি জেলার পালকোটের রাজা সাহেব যথেষ্ট ভূমিদান তো দিয়াছেনই উপরন্তু তিনি জেলা ভূদান সমিতির সংযোজক হইয়া কাজ করিতেছেন এবং পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ভূমি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার শুধু হৃদয় পরিবর্তন হয় নাই—তাঁহার জীবন-পরিবর্তনও হইয়াছে। এই আন্দোলনে বাধা প্রাপ্ত হইবার যে আশংকা ছিল তাহা আর থাকিতেছে না। এই অবস্থায় যদি আন্দোলন পূর্ণভাবে সফল না হয় তবে সত্যাগ্রহের পথ পরিষ্কার হইবে। তখন বিনোবাজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন সফলভাবে চলিতে পারিবে। কিন্তু বিনোবাজী মনে করেন যে, সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হইবে না এবং যদি বা কোন সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হয় তবে তিনি কোনরূপ উগ্র সত্যাগ্রহের কথা চিন্তা করেন না। এই আন্দোলন পূর্ণভাবে সফল না হইলে তিনি যেরূপ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে চান তাহার স্বরূপ কি তাহা তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৩) যে সব স্থানে ভূমিহীন দরিদ্রগণ জড়তাগ্রস্ত হইয়া থাকিত—যাহাকে বিনোবাজী শ্মশানের শান্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—ভূদানযজ্ঞের

প্রচারের ফলে তাহাদের মধ্যে জাগরণ আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে ভূমি-ক্ষুধার সৃষ্টি হইতেছে ও চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। যাহাদের মধ্যে কিছু জাগৃতি ছিল তাহারা সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। যে সব ছোট মালিক দরিদ্র কৃষক ভূমিদান দিতেছে তাহারাও নিষ্ক্রিয় থাকিতেছে না। এই আন্দোলনের অসফলতায় বিনোবাজী বা সর্ব-সেবা-সঙ্ঘের নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন না হইলেও দরিদ্র ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক এক যোগ হইয়া বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে নিজেরা অসহযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এমন আবহাওয়ার লক্ষণ এখনই কোন কোন স্থানে দেখা যাইতেছে। কয়েকটি স্থানে ভূমিহীন কৃষকেরা জোতদারের জমি চাষ করিতে চাহিতেছে না। তাহারা বলিতেছে—জমি তো আমাদের। আমাদের জমি আমাদিগকে না দিলে আমরা ঐ জমি চাষ করিব না। ভূমির মালিকগণ যদি তাঁহাদের হৃদয়ের দ্বার পূর্ণ-ভাবে উন্মুক্ত না করেন, তবে ভূমিহীন দরিদ্রদের মধ্যে ঐরূপ মনোভাব ক্রমশঃ ব্যাপক ও তীব্র হইতে থাকিবে এবং ভূদানযজ্ঞের বিফলতায় উহা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব-নিরপেক্ষভাবে পৃথক পৃথক স্থানীয় অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ঐ সুযোগে যাঁহারা হিংস্র বিপ্লবে বিশ্বাসী তাঁহারা অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিয়া ঐ সব স্বতন্ত্র আন্দোলনকারী দলকে তাঁহাদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিবেন। সেক্ষেত্রে ঐসব খণ্ড আন্দোলনসমূহ অহিংসার পথ হইতে যাহাতে বিচ্যুত না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দিবার প্রয়োজন হইবে।

(৪) সেই অবস্থায় হিংস্র আন্দোলন প্রবলতর রূপ ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। এই আন্দোলনের বিফলতাপ্রসূত পরিস্থিতিকে গণ-আক্রোশে রূপদান করিয়া ব্যাপক হিংস্র আন্দোলন সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনে যে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্ট হইতেছে তাহাতে হিংস্র আন্দোলন তখন নূতন আকারে কিছু হইলেও উহা আঞ্চলিক বা স্থানীয়ভাবে হইতে থাকিবে। অশান্তি কিছু কিছু অঞ্চলে ঘটিতে পারে কিন্তু তাহা কার্যকরী হইবার সম্ভাবনা কম। ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য ভূমি একজনের হাত হইতে লইয়া অন্যকে দেওয়া মাত্র নহে। উহার দ্বারা সর্বো-দয়ের ভিত্তি পত্তন হইবে। ব্যাপকতর অর্থে উহা সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা। এই

সমগ্র দৃষ্টি লইয়া কর্মীরা যদি কাজ করিয়া যান তবে অশান্তির আশঙ্কা থাকিবে না।

(৫) ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের বিফলতায় বিনোবাজী যেরূপ সত্যাগ্রহ অবলম্বনের কথা চিন্তা করেন তাহা তিনি যে করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেক্ষেত্রে উপরে যে চারিটি সম্ভাব্য পরিণতির কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিকে বিনোবাজীর সত্যাগ্রহ গভীরভাবে প্রভাবিত করিবে।

এমনও হইতে পারে যে উপরোক্ত সব কয়টি সম্ভাব্য পরিণতি এক-সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উদ্যত হইতে পারে। সেক্ষেত্রে শেষ পরিণতি কি সংঘটিত হইবে তাহা অনুমান করা সহজ নহে। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, বিনোবাজীর অবলম্বিত সত্যাগ্রহ অন্য সব পরিণতিকে নিষ্প্রভ করিয়া দিবে। এক দিক দিয়া এই আলোচনার বিশেষ কোন মূল্য নাই। একাগ্র ও অনন্যচিন্ত হইয়া কোন ক্রান্তিকারক কাজে আত্মনিয়োগ না করিলে তাহাতে ফলোদয় হয় না।

যাহা হউক, ভূদানযজ্ঞের বিফলতায় বিনোবাজী যে সত্যাগ্রহ করিবার কথা বলেন তাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ঐ সত্যাগ্রহ কিরূপ হইবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"যদি ধনীদের হৃদয় না খুলে তবে আমি আরও এক পদ অগ্রসর হইব। আজ যাহা করিতেছি ইহা হইতে এক পাও অগ্রসর হইব না—এরূপ বন্ধন বা সীমারেখা আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখি নাই। আমার এরূপ বন্ধনের প্রতি বিশ্বাস নাই। আমাদের প্রেমের শক্তি থাকা চাই। মা তাঁহার সন্তানদের জন্য কতই না ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, তাঁহার সন্তান খারাপ পথে যাইতেছে এবং তাঁহার তাহাতে দুঃখ হয় তখন তিনি কি করেন? তিনি তো তখন সত্যাগ্রহ করেন। তিনি উপবাসী থাকেন ও নিজেই সন্তানকে বুঝাইতে থাকেন। অন্যকে দুঃখ না দিয়া নিজে দুঃখবরণ করা ও বুঝাইতে থাকা—ইহারই নাম সত্যাগ্রহ।" কিন্তু আজকাল চারিদিকে যে কোন ছোটখাটো ব্যাপারেই সত্যাগ্রহের নামে যাহা করা হইয়া থাকে তাহা সেই 'সত্যাগ্রহ' নহে। সত্যাগ্রহের কথা শুনিয়া লোকের মনে যেন সে ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়। তাহার প্রতিক্রিয়া আদৌ ভাল হয় না

—তাহাতে যাহাদের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ করা হয় তাহাদের মনে প্রেমভাবের উদ্রেক হওয়ার পরিবর্তে বিরোধের ভাব বরং বৃদ্ধি পায়। এই সম্পর্কে সতর্ক করাইয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"সত্যাগ্রহের কথা তুলিয়া আমি ভীতি প্রদর্শন করিতেছি না। আমি জানি যে, সত্যাগ্রহের 'দুরূপয়োগ' হইয়া থাকে এবং আজকাল সচরাচর এরূপ হইতেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, আগ্রহপূর্বক সত্যের আচরণ করা চাই, যাহাতে আশেপাশের সকলের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ইহার জন্য যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়া সত্যাগ্রহ। এবং আমি ইহাও বিশ্বাস করি, যদি পৃথিবীতে একজন খাঁটি সত্যাগ্রহী থাকেন তবে তাঁহার প্রভাব সমগ্র পৃথিবীর উপর পড়িবে ও সারা পৃথিবীর হৃদয় দ্রবীভূত হইবে। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সারা জগতের প্রতি প্রেম থাকা চাই।"

যেখানে উপবাসের ফলে সকলের হৃদয়ে প্রেমভাব জন্মে উহাই খাঁটি উপবাস; কিন্তু যাহাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়—দ্বেষভাব ও বিরোধভাব আসে সে উপবাস ভুল। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে উপবাস করা হয় তাঁহাদের এরূপ লাগা চাই যে, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। অতএব সত্যাগ্রহের কথা শুনিয়া কাহারও ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন যে—"আমি আমার বিচারধারাকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য সত্যাগ্রহের কথা উঠাইয়া থাকি। আর আমি ইহা মনে করি যে দুই বৎসর যাবৎ যে কাজ চলিতেছে তাহা এক রকমের সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। তাই সত্যাগ্রহ কি তাহা আমি কিছু বুঝি। সত্যাগ্রহের অর্থ ইহা নহে যে, কোন এক ব্যাপারে কাহারও বিরুদ্ধে কিছু করা। মাত্র ইহাই যে সত্যাগ্রহ—তাহাও নহে। তাই যে সব কাজ চলিয়া আসিতেছে, যথা—পদব্রজে ভ্রমণ করা, গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে বিচার বুঝাইয়া দেওয়া, জমি চাওয়া—এই সমস্তও সত্যাগ্রহ।" কিন্তু বিনোবাজী মনে করেন যে সত্যাগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইবে না। তিনি বলেন—"আমার বিশ্বাস এই যে, আমার সেনা এরূপ শক্তিশালী বলিয়া বিবেচিত হইবে যাহাতে উহার লড়াই করিবার প্রয়োজনই হইবে না। কেবল ধনুকের টঙ্কার শুনিয়া সামনের সকলে খতম হইয়া যাইবে এরূপ বলা হইয়া থাকে। সেরূপ সেনার হুঙ্কারেই কাজ হইয়া যাইবে। যখন লক্ষ লক্ষ গরীব লোক দান দিতে থাকিবে তখন বিনা লড়াইএ কাজ

হাসিল হইবে। হাজারীবাগে সাড়ে চার লক্ষ একর জমি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি বলিয়াছি আমার ইহাতে সন্তোষ হয় নাই। এইজন্য ওখানকার লোককে ৬০ হাজার দানপত্র আনিতে বলিয়াছি। তাঁহারা তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা আমি কি করিতেছি? ভগবান যখন গোবর্ধন উঠাইতে চাহিলেন তখন তিনি সকলকে বলিলেন—আপন আপন লাঠি উহার নীচে প্রবেশ করাইয়া দাও। উহা এক জনশক্তি নির্মাণ করিবার ব্যাপার। এই জন্যই আমি গরীবদের নিকট হইতে দান লইতেছি।"

## উগ্র সত্যাগ্রহ

কেহ কেহ মনে করেন যে, ভূমিসমস্যা সমাধানের জন্য যদি অহিংস আন্দোলনের আশ্রয় লইতে হয় তবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যেরূপ সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল সেরূপ সত্যাগ্রহ ভূমির মালিকদের বিরুদ্ধে অবলম্বিত হয় নাই কেন? সুতরাং এরূপ ভিক্ষামূলক আন্দোলনে ক্রান্তি আসা সম্ভব নহে। তাঁহাদের এই কথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে যে সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা উগ্র সত্যাগ্রহ ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, বাহ্য বলপ্রয়োগ না করিয়া কাহারও বিরুদ্ধে কিছু করাই যে একমাত্র সত্যাগ্রহ—এমন নহে। অন্যান্য প্রকারেও সত্যাগ্রহ করা চলে। কোন্ ব্যাপারে ও কোন্ অবস্থায় কিরূপ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা বিধেয় তাহাই বিচার্য বিষয়। স্বরাজ্য বা স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল। গান্ধীজীর পূর্বে স্বরাজ্য বা স্বাধীনতা কংগ্রেসের কাম্য ছিল। পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে এবং স্বাধীনতা লাভ করা চাই—এই বিচার লোকের নিকট নূতন ছিল না। সুতরাং কোন চিন্তাবিপ্লবের আবশ্যকতা সেখানে ছিল না। কেবলমাত্র প্রশ্ন এই ছিল যে কোন্ কার্যপন্থা অবলম্বন করিলে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে। তাই সেই ক্ষেত্রে ঐরূপ সত্যাগ্রহ যে উপযোগী ছিল ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভারতের ভূমিসমস্যার সমাধানের জন্য এক অভিনব বিচারবোধ সমাজে জাগ্রত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির

বোধের উপর বর্তমান সমাজ অধিষ্ঠিত। ইহার বিপরীত এক বিচার সমাজ-মানসে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ভূমি ভগবানের। ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। শুধু তাহা নহে, আমাদের যাহাকিছু—জগতের যাহাকিছু সবই ভগবানের। তাই সবই ভগবানকে অর্থাৎ সমাজকে অর্পণ করিয়া উদ্বৃত্ত কিঞ্চিৎ প্রসাদস্বরূপ ভোগ করিতে হইবে। এরূপ ক্রান্তিকারক বিচারবোধ প্রতিষ্ঠার পক্ষে কোনরূপ উগ্র সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ নিষ্ফল। সুতরাং যদি প্রথমেই জমির মালিকদের বিরুদ্ধে বা ধনীদের বিরুদ্ধে উগ্র সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা হইত তাহা হইলে উহা জবরদস্তি মাত্র হইত ও উহাতে বিচার প্রচার বা বিচার প্রতিষ্ঠা করা তো সম্ভব হইত না। উপরন্তু উহাতে সমাজে এক বিপর্যয় সৃষ্টি হইত মাত্র; অন্য কোন ফলোদয় হইত না। বর্তমানে যে পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে উহাও একপ্রকারের সত্যাগ্রহ। যদি বর্তমানের অবলম্বিত পন্থা পূর্ণভাবে সফল নাও হয় তবে উক্ত ক্রান্তিকারক বিচার যে সমাজে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বিচার সমাজমানসে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উক্ত বিচারমূলক কার্যে পূর্ণতার জন্য অন্য প্রকারের সত্যাগ্রহ অবলম্বিত হইতে পারিবে। কিন্তু বিনোবাজী আশা করেন যে, এই আন্দোলনে ভূদানযজ্ঞ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে; অন্য প্রকারের সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হইবে না। সে যাহা-হউক, বর্তমান অবস্থায় ভূমির মালিকদের বিরুদ্ধে উগ্র সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা সমীচীন নহে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

**একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস**

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিচারধারার সমগ্রতার সুস্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য বিনোবাজী সত্যাগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই সত্যাগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইবে। সকলের মনে—বিশেষত কর্মীদের মনে অনুরূপ বিশ্বাস থাকা চাই এবং এই বিশ্বাস অন্তরে সদা জাগ্রত রাখিয়া তাঁহাদের কাজে অগ্রসর হওয়া চাই। সম্ভাবিত সত্যাগ্রহের কথা মনে রাখিলে তাঁহাদের একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইবে এবং এই আন্দোলনের ক্ষতি হইবে। সন্তানের অসুখ হইলে মা মনে করেন যে তাঁহার সন্তান নিশ্চয় বাঁচিবে ও সেই মনে করিয়া তিনি চলিতে থাকেন।

সন্তানের অবস্থা যতই খারাপ হউক তাঁহার সে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহাতেই তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা সুষ্ঠুভাবে হয়। সন্তান বিপথে যাইলে মা মনে করেন যে, তাঁহার সন্তান নিশ্চয় একদিন না একদিন সংশোধিত হইবে এবং বার বার বিফলতায় তাঁহার সে বিশ্বাস টলে না এবং তিনি তাহাকে অবিরত বুঝাইতে থাকেন। বৃদ্ধ পিতার অসুখ হইয়াছে। পুত্র তাঁহার সেবাশুশ্রূষা ও ঔষধাদি খাওয়াইবার ভার লইয়াছে। যদি সে মনে করে বাবার বৃদ্ধ বয়স—বাবা না বাঁচিতে পারেন, এবং বাবার মৃত্যু হইলে খাটিয়া ও কাঠের প্রয়োজন হইবে বলিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হয় তবে বাবাকে ঔষধ ও পথ্য দিতে তাহার আগ্রহ কম হইবে। নিয়মিত ঔষধ খাওয়াইতে পুত্রের সব সময়ে খেয়াল থাকিবে না এবং তাহাতে বাবার মৃত্যুও আগাইয়া আসিবে। এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ। বিশেষতঃ অহিংসার কাজে এই রীতি হওয়া চাই। নচেৎ তাহাতে সফলতার আশা করা দুরাশা।

**সম্পত্তিদান যজ্ঞ**

ভূদানযজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিদানযজ্ঞ প্রবর্তনের কথা বিনোবাজী বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূমিসমস্যা হইতেছে বুনিয়াদী সমস্যা। ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য তখনই কিছু না করিলে এক বিপৎপাতের আশঙ্কা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভূমি ভগবানের সাক্ষাৎ দান। ভূমি উৎপাদনের মৌলিক সাধন। এই জন্যই গরীবের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা প্রথমে ভূমি সমস্যায় সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। অন্যদিকে ইহাও তাঁহার মনে হয় যে, সম্পত্তিদান ব্যতীত ভূমিদান সফল হইবে না। ভূদানযজ্ঞের সংকল্প পূর্ণ করা এক কথা আর উহাকে সফল করা অন্য কথা। যাহারা জমি পাইবে তাহারা যখন সর্বোদয়-বৃত্তি গ্রহণ করিবে এবং আমাদের কর্মী হইয়া উঠিবে তখনই ভূদানযজ্ঞ সফল হইবে। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"পরন্তু আমি ভাবিলাম যে, প্রথম হইতে দুইটি ব্যাপার একসঙ্গে উঠানো ঠিক নহে। এবং উভয় কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করিবার ইঙ্গিতও আমি পাই নাই। যদি বিনা ইঙ্গিতে কোন কাজ হাতে লই তবে উহা অহঙ্কার হইবে। উহা হইতে কোন ফল হইবে না এবং আমার যে শক্তি আছে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

সেই সময়ে কেবলমাত্র ভূদানের ইংগিত আমি পাইয়াছিলাম।" কিন্তু ভূদান-যজ্ঞের কাজ যখন অগ্রসর হইতে থাকিল তখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল যে, ভূমির সংগে সংগে অর্থের অংশ না চাহিলে আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যখন তিনি বিহারে পদার্পণ করিলেন তখন সম্পত্তিদান যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন এবং যে সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের বিচারকে রূপদান করিয়াছিলেন তাঁহারই পাটলীপুত্র শহরে ১৯৫২ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে বিনোবাজী সম্পত্তিদানযজ্ঞ ঘোষণা করিলেন ও আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। নিজের পরিশ্রমের দ্বারা ধন-অর্থ উপার্জন করা হইলেও উহা মাত্র নিজের জন্য নহে পরন্তু সকলের ভোগের জন্য ভগবান উহা অর্পণ করিয়াছেন। যে বুদ্ধি, শক্তি ও পুরুষার্থের সাহায্যে ঐ ধন উপার্জন করা হইয়াছে তাহা পরমেশ্বরেরই দান—ধন-অর্থ চাওয়ার পশ্চাতে এই ভাবধারা রহিয়াছে।

'সম্পত্তিদানযজ্ঞে' সম্পত্তি শব্দের অর্থ কি তাহা জানা প্রয়োজন। এখানে 'সম্পত্তি' শব্দ হিন্দী শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় 'সম্পত্তি' বলিতে ভূমিসমেত অন্যান্য সমস্ত ধন-সম্পত্তি বুঝায়। হিন্দীতে 'সম্পত্তি' শব্দের মানে ধনদৌলত বা অর্থ কিন্তু ভূমি নহে। অতএব সম্পত্তি-দানের অর্থ—ধনদান, অর্থদান, আয়দান ইত্যাদি। সম্পত্তিদানযজ্ঞে আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ চাওয়া হইয়াছে। এই যজ্ঞের মারফৎ কোন এক ধনভাণ্ডার সংগ্রহ করিবার কল্পনা নাই। কিরূপ মনোভাব লইয়া সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দেওয়া কর্তব্য ও উহা কি পদ্ধতিতে পরিচালনা করা উচিত তাহা বুঝাইয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি নিত্য জীবনের বিচার উপলব্ধি করিয়া সম্পত্তিদান করিবেন—তাঁহারই সম্পত্তির ব্যবহার আমরা করিতে চাই। কাহারও উৎসাহের বশে সম্পত্তিদান করিবার কথা নহে, পরন্তু উহা চিন্তা করিয়া বিচার করিয়া করিবার কথা। বর্তমান বর্ষে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সীমা-বদ্ধ রাখিবার কথা আমি ভাবিয়াছি। যিনি সম্পত্তিদানকে নিত্য-ধর্মস্বরূপ মনে করিবেন তাঁহারই দান স্থায়ী হইবে। উহা সহজ ধর্ম হওয়া চাই। ইহাতে ভারবোধ যেন না হয়। আমাদের শরীরের ওজন যদি ঠিক পরিমাণ

মত হয় তবে উহার বোঝা অনুভূত হয় না। সেইরূপ সম্পত্তিদানযজ্ঞে সহজ দান হওয়া চাই। ঘরে শিশু জন্মিলে সে পান-আহার করে কিন্তু তাহার বোঝা অনুভূত হয় না। গার্হস্থ্য জীবনের উহা সর্বশ্রেষ্ঠ অংগ বলিয়া মনে করা হয়। তাহাতে সকলের আনন্দ হয়। সেইরূপ সম্পত্তি-দানযজ্ঞে যিনি দান দিবেন তাঁহার আনন্দ হওয়া চাই। এইজন্য সম্পত্তিদান-যজ্ঞ ব্যক্তিগতভাব চালাইবার কাজ—অন্ততঃ এই বৎসর পর্যন্ত। আগামী বৎসরের কথা পরে চিন্তা করা যাইবে।" তিনি বলেন—"যিনি দিবেন তিনি যেন সারা জীবনের জন্য দেন। একবার দান দিলে সারা জীবনের জন্য দিতে হইবে—এই বিচারের মর্ম অনেকে উপলব্ধি করেন না। কিন্তু তাঁহারা একথা চিন্তা করেন না যে, একবার বিবাহ করিলে তাহার দ্বারা সারা জীবনের বন্ধন হইয়া যায়।" সম্পত্তিদানযজ্ঞ কেন প্রথম হইতে আরম্ভ করা হয় নাই ও কেন উহার উপর এখনও জোর দেওয়া হয় নাই, সে সম্পর্কে বিনোবাজী অন্যত্র বলিয়াছেন—"গংগার চাইতে যমুনা ছোট কিন্তু যমুনা গংগায় মিলিত হইয়াছে। তেমনি আজ সম্পত্তিদানযজ্ঞ যমুনার মত। ভূমি যেমন উৎ-পাদনের অনিবার্য সাধন, টাকা-পয়সা সেরূপ উৎপাদনের অনিবার্য সাধন নহে। টাকা-পয়সা তো মোহময় সাধন। টাকা-পয়সার কোন মূল্যই নাই। উহা তো নাসিকের প্রেসে তৈয়ারী হয়। কিন্তু কোন প্রেস ভূমি তৈয়ারী করিতে পারে না। এইজন্য ভূমির সংগে টাকা-পয়সার তুলনা হইতে পারে না। অর্থশালীদের অর্থকে আমরা মূল্যহীন করিয়া দিতে পারি। তাই ভূমির তুলনায় ধন-দৌলত বহুগুণ গৌণ। ভূমি বুনিয়াদী। এই চিন্তা করিয়া আমরা ভূমিসমস্যার প্রথমে হাত দিয়াছি। সম্পত্তিদানযজ্ঞের উপর আমি এখন এই কারণে বেশী জোর দিতেছি না যে, উহা এমন একটি চারা গাছ যাহার শীঘ্র উদ্ভেদ হয় কিন্তু যাহা আবার শীঘ্র শুকাইয়া যায়।"

বিনোবাজী অর্থ গ্রহণ করেন না। অথচ এখন তিনি অর্থ চাহিতে-ছেন। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কিভাবে করা যায়? বিনোবাজী দাতার নিকট হইতে অর্থ নিজের হাতে লইবেন না। উহা দাতারই নিকট থাকিবে এবং দাতা বিনোবাজীর নির্দেশ অনুসারে উহা ব্যয় করিয়া তাহার হিসাব বিনোবাজীকে দিবেন। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার আবেদনে বলিয়াছেন—

"আমি ঐ অর্থ নিজের হাতে লইব না এবং উহা রাখিবার দায়িত্বও আমি লইব না। উহা খরচ করিবার বা উহার হিসাব রাখিবার দায়িত্বও আমি গ্রহণ করিব না। এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিব। জনসাধারণের উপকারার্থে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য সাধারণতঃ ট্রাষ্ট সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। আমি সেরূপ ট্রাষ্ট গঠন করিবার কল্পনাও করিতেছি না। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ফান্ড ও এই সম্পত্তিদানযজ্ঞের মধ্যে আরও একটি গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে, আয়ের একটি অংশ প্রতি বৎসর এই যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে। এজন্য আমি স্থির করিয়াছি যে, দাতার কাছে এই অর্থ রাখা হইবে। তিনি আমার নির্দেশ অনুসারে উহা ব্যয় করিবেন এবং তাহার হিসাব প্রতি বৎসর আমার কাছে পাঠাইবেন। ইহার অর্থ এই যে, দাতা কেবলমাত্র তাঁহার ধন-অর্থের একাংশ দিয়া মুক্তি পাইবেন না। পরন্তু ব্যয়ের ব্যাপারেও তাঁহার বুদ্ধি খাটাইতে হইবে। ইহা সত্য যে আমার অভিপ্রায় অনুসারে দাতাকে তাঁহার প্রদত্ত অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় কি তাহা তিনি আমাকে জানাইতে পারেন।"

এই ব্যাপারে দাতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। সমালোচকেরা এই ব্যবস্থায় দোষ দেখিতে পারেন। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন—"কিন্তু বিশ্বাসই ধর্ম প্রেরণার আধার। মানুষকে বিশ্বাস করিলে তাহার সততা সম্বন্ধে যতটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কোনরূপ আইনের বন্ধনের দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। এই দৃষ্টিতে সম্পত্তিদানের এই রীতি আমি স্থির করিয়াছি।"

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর 'ট্রাষ্টীশিপ থিয়োরী'র কথা মনে উদিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ধনীদিগের উদ্দেশ্যে বলিতেন—'দেখ ধনিক, তোমার হাতে যে ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছে তাহার মালিক তুমি নহ। তাহা সকলের। তাহা দরিদ্রের। দরিদ্রের ধন ভগবান তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। তুমি দরিদ্রের ট্রাষ্টী। অতএব তুমি তোমার ধন-সম্পত্তি দরিদ্রদের হিতার্থে বিনিয়োগ কর।' মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করিতেন যে, একদিন ধনীরা এই শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি দরিদ্রের

কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ করিবেন। উহা মহাত্মা গান্ধীর ট্রাষ্টীশিপ থিওরী (বিশ্বস্ত বৃত্তি) বলিয়া আখ্যাত হয়। উহার মধ্যেই ভূদানযজ্ঞ ও সম্পত্তি-দানযজ্ঞের বীজ নিহিত ছিল। সম্পত্তিদানযজ্ঞ ও ভূদানযজ্ঞের দ্বারা গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপ থিওরী (বিশ্বস্ত বৃত্তি)র প্রয়োগ করা হইতেছে। ট্রাষ্টীকে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রশ্নই উঠে না। যিনি ট্রাষ্টী, ট্রাষ্ট সম্পত্তি তো তাঁহার বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। উহা নিজের করিয়া রাখা চলে না। ট্রাষ্টীও আমাদের ভাই। তাঁহার জীবন নির্বাহের জন্য কিছু পাওয়াও চাই। তাই ভূদানযজ্ঞ বা সম্পত্তিদানযজ্ঞে পুরা ভূমি চাওয়া হয় না। দরিদ্রনারায়ণের ভাগই চাওয়া হইয়া থাকে। তখন লোকে ট্রাষ্টীশিপ থিওরীর কথায় উপহাস করিত। আজ তাহার সফলতা মানুষ প্রত্যক্ষ করিবে। বিনোবাজী 'ট্রাষ্টীশিপ্' শব্দ ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী নন। তবে ট্রাষ্টীশিপের ভাব-ধারা যাহা সম্পত্তিদানযজ্ঞে নিহিত রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"ভূমি দানের মত একবার দান দেওয়ার ব্যাপার ইহা (সম্পত্তিদান) নহে। ইহাতে প্রতি বৎসর আয়ের এক অংশ দিতে হইবে। অতএব উহার জন্য জীবনকে নৈষ্ঠিক করিয়া তোলা প্রয়োজন। ইহাতে অন্তরের নিষ্ঠার বিকাশ হওয়া চাই। যখন ভরত রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন তখন তাঁহার অন্তর এই ভাবে পূর্ণ ছিল যে কখন রামের সহিত মিলিত হইবেন। কিন্তু তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্য থামিলেন। রাজ্যের তত্ত্বাবধায়কগণকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, 'আমি রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। এইজন্য সে অবধি আপনারা রাজ্য ঠিক-মত পরিচালনা করুন।' তুলসীদাস লিখিতেছেন যে, ভরত এত উদারচেতা হইয়াও ইহা করিলেন—কেননা সকল সম্পত্তি রামের। এইজন্য তাহার ঠিক-মত তত্ত্বাবধান করা ভরতের কর্তব্য। যেমন গান্ধীজী বলিতেন যে, নিজেদের সম্পত্তির ট্রাষ্টী হইয়া আমাদের থাকা উচিত। ট্রাষ্টী কথাটি আধুনিক। উহার বহু অপপ্রয়োগ হইয়াছে। এইজন্য আমি ট্রাষ্টী শব্দ ব্যবহার করি নাই। কিন্তু গান্ধীজী ট্রাষ্টী শব্দ ব্যবহার করিতেন, কেননা তিনি আইনজ্ঞ ছিলেন। এইজন্য ঐ শব্দের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল। অতটা আকর্ষণ আমার নাই। আমি এই বিচার উপনিষদের ভাষায় প্রকাশ করিতে চাই।

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—যাহা ভোগ করিতে হইবে তাহা ত্যাগ করিয়াই ভোগ করা চাই। তুলসীদাসজীও বলিয়াছেন যে, সব সম্পত্তি রঘুবরের। অতএব এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়া গৌণ। নিজের সমস্তই সমাজকে দেওয়া প্রয়োজন এবং নিজের শরীরের প্রয়োজনের জন্য তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারা যায়। কিন্তু এখন সমাজের মধ্যে এই প্রকারের ব্যবস্থা নাই এবং শীঘ্রও তাহা করা যাইবে না। এইজন্য এখন এক-ষষ্ঠাংশ দিতে হইবে এবং বাকি যাহা থাকিবে তাহা হইতে আরও কিছু দেওয়ার জন্য ভাবিতে হইবে। ষষ্ঠাংশ দান দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, সারা জীবনের মত নিশ্চয় করিয়া উহা দিতে হইবে। যদি অতটুকু অংশ না দেওয়া যায় তবে আমরা পাপী বিবেচিত হইব এবং আমাদের জীবনও পাপময় হইয়া উঠিবে। এইজন্য সম্পত্তিদান দেওয়া কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।"

যাঁহারা সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান করিতে চান তাঁহারা যেন তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং এই বিষয়ে সকলের সন্তোষ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে দান করেন। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"এখন এখানে যেসব ভাই বসিয়া আছেন তাঁহাদের অন্তরে যদি ধর্ম-ভাব আসিয়া থাকে তবে তাঁহারা নিজেদের ঘরের সকলের সংগে—মাতা, পত্নী এবং সন্তানদের সংগে কথা বলিয়া সম্পত্তিদান দিতে পারেন। এই কাজের দ্বারা তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলের অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হওয়া চাই। তাঁহাদের এইরূপ লাগা চাই যে, তাঁহার যেন আজ মিষ্ট আম ভক্ষণ করিয়াছেন এবং উহার মধুরত্বের আস্বাদ পাইয়াছেন। সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়াতে তাঁহাদের খুবই আনন্দ হওয়া চাই। তাঁহাদের হৃদয় নৃত্য করিতে থাকিবে। কোন প্রকারের চাপে পড়িয়া দেওয়া অথবা লজ্জায় অথবা ভয়ে দেওয়া উচিত নয়। কেননা সারা জীবন ধরিয়া পঞ্চমাংশ বা ষষ্ঠাংশ ত্যাগ করিতে হইবে।"

ভূদানযজ্ঞে ভূমিদান লওয়া হয় এবং সেই ভূমি ভূমিহীনকে দেওয়া হয়। ভূমি কোন ভোগ্য দ্রব্য নহে। উহা উৎপাদনের সাধন (উপায়) এবং মৌলিক সাধন। উহাতে হাড়-ভাংগা পরিশ্রম করিলে তবে ভোগ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। আবার দানপ্রাপ্ত ভূমি ভূমিহীনকে যে দেওয়া হয়, তাহা যে কোনও ভূমিহীনকে দেওয়া হয় না। যে ভূমিহীন দরিদ্র চাষ করিতে জানে ও চাষ

করিয়া জীবিকা উপার্জন করিবে এবং যাহার অন্য কোন জীবিকা নাই মাত্র তাহাকেই ঐ ভূমি দেওয়া হয়। ভূদানযজ্ঞে যে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে চায় তাহার নিকট হইতে নগদ অর্থ লওয়া হয় না। তাহাকে চাষের যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি খরিদ করিয়া দিতে হয়। সুতরাং ভূদানযজ্ঞের মূলগত উদ্দেশ্য—উৎপাদনের সাধন (উপায়) উৎপাদকের হাতে আনিয়া দেওয়া, অর্থের প্রতিষ্ঠার বিলোপ সাধন করা ও উৎপাদক শ্রমের প্রতিষ্ঠা সৃজন করা। কিন্তু সম্পত্তিদানযজ্ঞে এরূপ কোন ক্রান্তিকারক উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। সম্পত্তিদানযজ্ঞে অর্থ দান লওয়া হয়—যদিও ঐ অর্থ দাতার হাতে থাকিয়া যায়। অর্থ উৎপাদনের সাধন নহে। উহা উপভোগ্য দ্রব্যাদি খরিদ করিবার মাধ্যম। উপরন্তু একজন বড় কারখানার মালিক যিনি শ্রমিকদিগকে শোষণ করিয়া অর্থ উপার্জন করেন তিনি তাঁহার এক-ষষ্ঠাংশ আয় সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান করিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রমিক-শোষণ ও উক্ত কলকারখানা সমানভাবে চলিতে থাকিল। এরূপ দান গ্রহণ করা হইলে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষে পরোক্ষভাবে সম্মতিদান করা হয়। এক নর্তকী, এক বেশ্যা, এক মাদকদ্রব্য বিক্রেতা—তাহাদের উপার্জনের এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া দান করিল; কিন্তু তাহাদের উপার্জনের পথ তাহারা ত্যাগ করিল না। ইহাতেও তাহাদের উপার্জনের পন্থায় পরোক্ষ সম্মতি দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বিনোবাজীর এই নূতন আন্দোলনের অর্থ কি? সর্বোদয় পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদাদা ধর্মাধিকারী তাঁহার সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কীয় এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি উহার সদুত্তরও প্রদান করিয়াছেন। দানকৃত অর্থের বিনিয়োগ বিনোবাজীর নির্দেশ অনুসারে দাতাকে করিতে হইবে। ইহার মধ্যেই সম্পত্তিদানযজ্ঞের ক্রান্তিকারক গতি নিহিত রহিয়াছে। কারখানার মালিক যদি দাতা হন তবে বিনোবাজী তাঁহাকে নির্দেশ দিতে পারেন যে উক্ত অর্থের দ্বারা কারখানার শ্রমিকদের অধিকাধিক স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে এই উপদেশও দিতে পারেন যে, তিনি এমনভাবে চলিবেন যাহাতে ক্রমে ক্রমে ঐ কারখানা বিনোবাজীর হাতে সঁপিয়া দিতে পারেন। কোন মহাজন-দাতাকে এই নির্দশ দিতে পারেন যাহাতে দাতা

চাষের বা অন্যরূপ উৎপাদনের সরঞ্জামাদি ঐ অর্থে খরিদ করিয়া উৎপাদককে দান করেন। সেই সংগে বিনোবাজী দাতাকে ইহাও বলিতে পারেন— 'আপনার এই উপার্জন পাপময়। এই উপার্জন ক্রমে ক্রমে বন্ধ করিবার চেষ্টা করুন।' যে কোন অনুৎপাদক দাতাকে ঐভাবে উৎপাদনের সহায়ক-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিয়া তাঁহার অনুৎপাদক ব্যবসায় বিসর্জন দিবার জন্য প্রেরণা দান করিতে পারেন। এইভাবে বিনোবাজী যখন দানকৃত অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ দান করিতে থাকিবেন তখন হইতে এই নূতন আন্দোলনের উদ্দেশ্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে থাকিবে।

অপরিগ্রহ ও অস্তেয়ের অনুসরণ ব্যতীত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংস বিপ্লব অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। তাই সম্পত্তিদান-যজ্ঞের মূল বিচারধারা অপরিগ্রহ ও অস্তেয়ের ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"'অস্তেয়' ও 'অপরিগ্রহ' উভয়ে মিলিত হইলে অর্থ-শুচিত্ব পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নহে। সত্য ও অহিংসা তো মূল, কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রে এই দুইয়ের আবির্ভাব কেবলমাত্র অস্তেয় ও অপরি-গ্রহের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। আর আর্থিক ক্ষেত্র জীবনের খুব বড় অংশ। এইজন্য ধর্মশাস্ত্র উহাকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই; পরন্তু উহা নিয়মন ও নিয়োজন করিবার দায়িত্ব ধর্মবিচারের উপর আসিয়া পড়ে। তাই মনু বিশদ্‌ভাবে বলিয়াছেন—"যঃ অর্থশুচিঃ স শুচিঃ"। অর্থাৎ যাঁহার জীবনে আর্থিক শুচিতা সাধিত হইয়াছে তাঁহার জীবনে শুচি আসিয়াছে। "

"অস্তেয়, অর্থ-প্রাপ্তির পদ্ধতির নিয়মন করিয়া থাকে এবং অপরিগ্রহ উহার মাত্রার নিয়মন করে। অস্তেয় বলে যে, প্রধানতঃ শরীর-শ্রমের দ্বারা অর্থাৎ উৎপাদক-শ্রমের দ্বারা শরীর নির্বাহ হওয়া চাই। শরীর শ্রম ব্যতীত যদি আমরা অন্ন গ্রহণ করি তবে আমরা এক বিপদ সৃষ্টি করিয়া থাকি। শরীর শ্রম করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি কোনরূপ শরীর-শ্রম করিতে না পায় তবে অন্যদিকে তাহার খুব কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। তবেই সেই বিপদ্‌ দূর হইবে। ঐ পরিশ্রম এরূপ শক্ত হইবে অর্থাৎ উহা এতই তপস্যায় ভরা হইবে যে উহার তুলনায় শরীর শ্রম কম কষ্টসাধ্য হইত

অর্থাৎ সাধারণ লোকের পক্ষে অস্তেয় পালন তখনই সম্ভব হইবে যখন যাহার শরীর-ক্ষুধা আছে সে শরীর-শ্রম করিবে। পৃথিবীতে আজিকার বহুতর বৈষম্য, বহুতর দুঃখ-কষ্ট ও বহুতর পাপের হেতু হইতেছে শরীর-শ্রম না করিবার অভিলাষ। শরীর-শ্রম হইতে বিরত থাকা যাহার সংকল্প সে ব্যক্তির গুপ্ত অথবা প্রকাশ্যভাবে চুরি করা হয়।

"শরীর-শ্রমের দ্বারা যে উৎপাদন হইবে কেবলমাত্র তাহাই ব্যবহার করিবে—এই নিয়ম যদি আমরা মানিয়া চলি তবে তদ্দ্বারা অপরিগ্রহ বহু পরিমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ শরীর-শ্রমের দ্বারা এত অত্যধিক উৎপাদন হইতে পারে না যাহার দ্বারা মানুষ বহু সংগ্রহ করিতে পারিবে। তথাপি অস্তেয় হইতে পৃথকভাবে অপরিগ্রহের নিয়মনের প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যায়। কারণ যদিও শরীর-শ্রমের দ্বারা উৎপাদন অত্যধিক হইতে পারে না তথাপি উৎপাদন অধিক হওয়া সম্ভব। এবং যদি সেই অধিক উৎপাদনের ব্যবহার অপরিগ্রহের দ্বারা করা না হয় তবে বিপদ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় না। বাল্যকাল হইতে আমরা অনেকের উপকার গ্রহণ করিয়াছি। ঐ উপকারের ঋণ পরিশোধের জন্য শরীর-শ্রমের মান্য পন্থায় যাহা আমরা উপার্জন করিয়াছি উহার অংশ সমাজকে প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। উহাতে সম্যক বিভাজনের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। তাই যদিও উহা একরূপ ঋণমুক্তি তথাপি উহাতে দানের স্বরূপ রহিয়াছে।"

সম্পত্তিদানযজ্ঞে আয়ের (বা ব্যয়ের) এক-ষষ্ঠাংশ চাওয়া হয়। তাহা হইলে পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ যাহা থাকে তাহা মানিয়া লওয়া হয় না কি? উহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে উহা মান্য করিবার প্রশ্নই আসে না। দাতা তো ছয়-ষষ্ঠাংশেরই সংগ্রহ মানিতেছিলেন। এক-ষষ্ঠাংশ চাহিয়া তাঁহার সেই মানাকে ধাক্কা দেওয়া হইতেছে। বিচার বুঝিবার জন্য তাহাকে প্রেরণা দান করা হইতেছে। ভক্ত বলেন যে যিনি একবার হরিনাম করিয়াছেন তিনি মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যিনি এক-ষষ্ঠাংশ সমাজকে যাবজ্জীবন অর্পণ করিবার নিয়ম এক জীবন-নিষ্ঠাস্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি, নিজের সারা জীবন, এমন কি নিজের শরীর নির্বাহ পর্যন্ত সমাজকে অর্পণ করিবার পথে পদার্পণ করিয়াছেন।

ইহা ধর্মনীতি। ধর্ম আসক্ত মানুষকে আসক্তি ত্যাগ করিবার দীক্ষা দান করিয়া একটু একটু করিয়া আসক্তি ত্যাগ করাইয়া তাহাকে মোক্ষের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। তাই ভোগ ও মোক্ষের মধ্যে ধর্ম সেতুস্বরূপ কাজ করে। ধর্ম-নীতির এই বিচারধারা হৃদয়ঙ্গম করিলে এক-ষষ্ঠাংশ চাহিবার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে পারা যায়। ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"শরীর ও আত্মার মধ্যে, অথবা ব্যবহার ও তত্ত্ববিচারের মধ্যে, অথবা বর্তমান স্থিতি ও প্রাপ্তব্য স্থিতির মধ্যে ধর্ম সেতুস্বরূপ কাজ করিয়া থাকে। সেতু নদীর একপারে খাড়া করা যায় না। পরন্তু উহা নদীর দুই পারেই খাড়া হইয়া থাকে। ভোগ এপারের, মোক্ষ ওপারের; আর ধর্ম উভয় পারের। সমাজের বর্তমান অবস্থায় উহাকে আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাওয়ার জন্য যে বিচার প্রস্তুত করা হইবে তাহা ধর্ম-বিচার হইবে। ঐ বিচার কেবল পরিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ গ্রহণ করিবে না; পরিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য উহা বাহনস্বরূপ হইবে। পথ ও ঘরের মধ্যে যে পার্থক্য ও সম্বন্ধ, ধর্ম ও মোক্ষের মধ্যে সেই সম্বন্ধ।"

যিনি সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিবেন তিনি সারা জীবন উহা দিয়া যাইবেন। সারা জীবন আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-অষ্টমাংশ কিংবা তাহার কম হইলেও তাহা দিয়া যাওয়ার সংকল্প অনেকের কাছে কঠিন বোধ হয়। বিনোবাজী তাঁহাদিগকে বলেন—"কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না যে একবার বিবাহ করিলে সারা জীবনের জন্য তাঁহারা নিজেদেরকে বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ করেন।" এ সম্পর্কে তিনি পরে আরও যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই মহৎ প্রেরণাদানকারী। তিনি বলিয়াছেন—"লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে 'আজীবন দান দিয়া যাওয়া সম্ভব কি?' আমি জিজ্ঞাসা করি আজীবন ভোজন করিয়া যাওয়া সম্ভব হয় কেমন করিয়া? আপনি এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন যে জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত ভোজন করিয়া যাইবেন। আজীবন ব্রত গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার। বেদ বলিয়াছেন—মরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাপূর্বক শ্বাস লইতে থাকিবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্রত কঠিন ব্রত। এই ব্রত গ্রহণ করার কথা এই উদ্দেশ্যে বেদ বলিয়াছেন যে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে রাম নাম করিতে হইবে। যেন বৃথা শ্বাস গ্রহণ করা না হয়। রামের

কাজের জন্য প্রতি ক্ষণ নিয়োজিত করা আবাশ্যক। ঐ প্রতিজ্ঞার এই অর্থ। আমাদের চক্ষু আজীবন দর্শন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের পদ-যুগল আজীবন চলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ঐ ব্রত তাহাদের কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উহা নৈসর্গিক এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। ঐরূপে ত্যাগের ব্রতও নৈসর্গিক এবং স্বাভাবিক। ঘরে ঘরে মাতা এই ব্রত প্রতি-পালন করিতেছেন। মাতা সন্তানকে কতই না আদর করেন। কিন্তু তাঁহার ঐ ধর্ম-ভাবকে ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া আমরা উহাকে প্রসারিত করিতে চাহিতেছি। আমরা বলি, মা, তুই মূর্তিমতী ধর্ম, তুই মূর্তিমতী ত্যাগ। তুই এত ত্যাগ করিতেছিস। আর একটু ত্যাগ কর। যাহার খাওয়ার কিছু নাই তাহার জন্য তুই কিছু ত্যাগ কর। ত্যাগের ব্রত কঠিন নহে। ত্যাগের দ্বারা ভোগ অধিকতর রুচিকর হইয়া থাকে।"

সম্পত্তিদান কে করিবে? সর্বাপেক্ষা অর্থশালী ব্যক্তি দান করিবেন। আবার অন্যদিকে দরিদ্রতম ব্যক্তিও দান দিবেন। এই ত্যাগ-ধর্ম পালন করিবার সুযোগ সকলেরই রহিয়াছে। বালক-বালিকারাও এই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতে এই ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হইতে পারে।

সম্পত্তিদানযজ্ঞের মধ্যে এক গভীর জীবন-বিচার নিহিত রহিয়াছে। উহা গার্হস্থ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। যিনি সম্পত্তি-দান দিবেন তাঁহার ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের অন্তরে পরম আনন্দের সঞ্চার হওয়া চাই। তাই প্রথম পর্যায়ে সম্পত্তিদানযজ্ঞকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়—যাহাতে উহা জীবনের গভীরদেশে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। তাই উহাকে প্রথমে সার্বজনিক আন্দোলনস্বরূপ ব্যাপক রূপ দেওয়া হয় নাই। বিহারে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন যখন আশাতীত অগ্রগতি লাভ করিল তখন গত ১৯৫৩ সালের শরৎকালে বিনোবাজী সম্পত্তিদানযজ্ঞকে সার্বজনিক আকার দান করিয়া সর্বসাধারণকে সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। তখন হইতে বিহারে সম্পত্তিদানযজ্ঞকে ব্যাপকভাবে চালাইবার প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। বুদ্ধগয়া সম্মেলনের সময় হইতে দেশের সর্বত্র উহা ব্যাপকভাবে চালাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

সম্পত্তিদানযজ্ঞের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়া বিনোবাজী লিখিয়াছেন—"আমি বিশ্বাস করি, যদি ভক্তজন বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা লইয়া এই যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন তবে এই কল্পনায় যে নূতন জীবন-বিচার উন্মুক্ত হইতেছে উহা দেশের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে এবং সাম্যযোগের অভিমুখে সমাজ সহজে অগ্রসর হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমি সজ্জন ও সাধু ব্যক্তিগণের সুবিবেচনার জন্য এই বিচারধারা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।"

যাঁহাদের নিকট ভূমিদান ও সম্পত্তিদান চাওয়া হয় তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বিনোবাজী ঋগ্বেদের এক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলেন—

"অদিৎসন্তং চিৎ আঘৃণে।
মনো দানায় চোদয়।
পণেশ্ চিৎ বি ম্রদা মনঃ।"

"অন্তর হইতে মানসিক তাপ, বাহির হইতে পরিস্থিতির তাপ—এই উভয়বিধ দহন-দানে শুদ্ধিদানকারী হে দেব! যিনি আজ দান দিতে চাহিতেছেন না, তাঁহার মনকে দান দিবার জন্য প্রেরিত কর। কৃপণের মনকেও মৃদু করিয়া দাও।"

**শ্রমদান যজ্ঞ**

সম্পত্তিদানযজ্ঞের পর বিনোবাজী শ্রমদানযজ্ঞ প্রবর্তন করেন। সম্পত্তিদানের ন্যায় শ্রমদানেও গভীর অর্থ নিহিত আছে। যাহার জমি নাই—অর্থও নাই, তাহার কি দিবার মত কিছুই নাই? তাহার কি আর কোন সম্পত্তি নাই? সে কি এতই নিঃস্ব, এতই কাঙ্গাল? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে, কেবলমাত্র ভূমিবান বা অর্থশালী লোকের দান দিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু যাহার জমি নাই বা অর্থ নাই অথচ শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্য আছে তাহার দানের শক্তি অপরিসীম। জমি বা অর্থ একেবারে সমস্তই দান করিয়া দেওয়া যায়। তাহার পর দেওয়ার মত তাহার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যাহার ভগবানের প্রদত্ত সুস্থ ও সবল দেহ আছে তাহার দান-শক্তি কখন নিঃশেষ হয় না। সারা জীবন প্রতিদিন তিনি

দান করিতে পারেন। বিনোবাজী বলেন—"তাহার তুল্য দান আর কে করিতে পারে? ভূদানযজ্ঞে ভূমি দান পাওয়া গেল। কিন্তু সে ভূমিতে পরিশ্রম না করিলে তাহা আবাদযোগ্য হইবে না। গ্রামের চরিত্রবান ও সম্মানিত ব্যক্তিরা একযোগে শোভাযাত্রা করিয়া ঐ জমিতে মাটি খুঁড়িতে গেলেন। শুধু তাহা নয়। ভূমি বিতরণ করা হইল। যাহাকে ভূমি দেওয়া হইল সে ব্যক্তি কোন আকস্মিক কারণে ভূমি ভালভাবে আবাদ করিতে পারিতেছে না। গ্রামের চরিত্রবান ও সেবাপরায়ণ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একযোগে ঐ জমিতে আবাদের কাজে সাহায্য করিতে গেলেন। ইহার ফলে সমস্ত গ্রামে এমন এক আব-হাওয়া সৃষ্টি হইবে যে, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রমদানের কাজে যোগদান করিতে গৌরব বোধ করিবে। লোকে বুঝিতে পারিবে যে, ইহা মাত্র রামের জমি লইয়া শ্যামকে দেওয়া নয়। কেন যে জমি দেওয়া হইতেছে সে সম্পর্কে গ্রামবাসীদের চিন্তন ও মনন হইতে থাকিবে। এরূপে শ্রমের লুপ্ত মর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ সুগম হইবে।" তাই বিনোবাজী তাঁহার দুর্বল ও অসুস্থ শরীরে ১০।১২ মাইল পাদ-পরিক্রমা করিয়া আসিয়াও ক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া সদলবলে এক ঘণ্টা কোদালী চালাইয়া শ্রমদানযজ্ঞ করিয়া সমাজকে শ্রমের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার মহান শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

মনুষ্যের পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে। সেরূপ মানুষ পঞ্চবিধ ধনেরও অধিকারী। যথা—হৃদয়, মস্তিষ্ক, দেহ, স্থাবর সম্পত্তি ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ প্রেম, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, শারীরিক শ্রম, ভূমি ও অর্থ। তবে একই ব্যক্তি সকল রকম ধনের অধিকারী না হইতে পারেন। কিন্তু এমন ব্যক্তি নাই যাঁহার কোন এক প্রকারেরও ধন নাই। নিঃস্ব ও সর্ব-প্রকারের অক্ষম ব্যক্তির তো হৃদয় থাকিবে। তাই বিনোবাজী পঞ্চ প্রকার যজ্ঞ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ভূদান, সম্পত্তিদান ও শ্রমদান যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। বাকি প্রেমদান ও বুদ্ধিদান যজ্ঞের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। যাঁহার আর কিছুই নাই তিনি নিজের প্রতিবেশীকে অন্তর হইতে নিজের মত করিয়া দেখিবেন ও তাহার প্রতি প্রেমভাব পোষণ করিবেন। তাঁহার নিজের আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইবে তাঁহার সাধনা। উহা হইবে—প্রেমদান যজ্ঞ। যাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে, তাঁহারা

প্রত্যহ কিছু সময় তাঁহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি নিঃস্বার্থ সেবায় নিয়োজিত করিয়া বুদ্ধিদান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। বিচারক আপোষে বিবাদ মীমাংসা করাইবেন। আইনজীবী কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া অত্যাচারিত দরিদ্রের পক্ষাবলম্বন করিবেন। চিকিৎসক দরিদ্রকে বিনা অর্থে চিকিৎসা করিবেন। শিক্ষক ও ছাত্র তাঁহাদের অবসর সময়ে দরিদ্রকে শিক্ষা-দান করিবেন। হিসাবনবীশ বিনা বেতনে কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে হিসাব সংক্রান্ত কাজ করিয়া দিবেন—ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া সেবকের জন্য এক মহত্তম যজ্ঞের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা হইতেছে —জীবনদান।

**জীবনদান**

বিপ্লবের এক লক্ষণ এই যে, উহা এক বিষয় লইয়া আরম্ভ হয় বটে; কিন্তু উহা অচিরে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় এবং অবশেষে উহা সর্বগ্রাসী হইয়া উঠে। জীবনের এক ক্ষেত্রে আরম্ভ হইয়া উহা তথায় নিবদ্ধ থাকিলে তাহা বিপ্লবই হইল না। আচার্য কৃপালানী বুদ্ধগয়া সর্বোদয় সম্মেলনে ভূদানযজ্ঞের বৈপ্লবিক প্রকৃতির কথা আলোচনা করিতে গিয়া বিপ্লবের এই লক্ষণের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বুদ্ধদেব নির্বাণের এক পথ আবিষ্কার করিলেন। উহা তো ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপার। কিন্তু উহা ছিল বৈপ্লবিক। তাই উহা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইল। নূতন রাজ্য সৃষ্টি হইল, নূতন সমাজ-ব্যবস্থা রচিত হইল, নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার কাজ সুরু করিলেন। দেশকে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি উহার ভিত্তিতে দেশকে সার্বজনিক মুক্তির পথ দেখাইলেন। এরূপে ভূমি সমস্যার সমাধানকল্পে ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ হয়। এখন উহার ভিত্তিতে দেশের কায়া পাল্টাইবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সর্বোদয়ের সমস্ত দিকই উহার রঙে রাঙিয়া উঠিতেছে। ভূমির মালিকত্ব ব্যক্তিগত হইতে পারে না। উহার মালিক ভগবান। ভূদানযজ্ঞের বিচারধারার ভিত্তিভূমি আধ্যাত্মিকতা—আত্মার একত্ব। জগতে যাহা কিছু সবই ভগবানের।

ভূমির মালিক আমরা নহি, ভগবান। তেমনি আমাদের বুদ্ধির মালিকও আমরা নহি। আমাদের সম্পত্তি ধন অর্থের মালিকও আমরা নহি। আমাদের শরীরের মালিকও আমরা নহি। আমাদের ভূমি, ধন-সম্পত্তি, বুদ্ধি, শরীর যাহা কিছু সবই সমাজ সেবার জন্য অর্পণ করা চাই। তাই ভূদানযজ্ঞের বৈপ্লবিক তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু এই পরম অভীষ্ট সাধন প্রসারিত হইল সম্পত্তি দানে, শ্রম দানে, বুদ্ধি দানে। এখানেও উহা নিবদ্ধ থাকিল না। আমাদের জীবন কি আমাদের? আমাদের জীবন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থেই যাপিত হইবে? জীবন তো আমাদের নয়—উহা ভগবানের; ভগবানের দান। তাঁহার কাজে, সমাজ সেবার কাজে উহা উৎসর্গ করা চাই। তাই যজ্ঞ সর্বগ্রাসী হইল। জীবন দানে উহার পরিণতি না হইয়া থাকিল না। বুদ্ধগয়া সর্বোদয় সম্মেলনের এক মহান অবদান—জীবনদান। কিন্তু বিনোবাজী এই জীবনদানের আভাস উহার কয়েকমাস পূর্বে তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"আজ নূতন মানুষ, নূতন সমাজ তৈয়ারি করিতে হইবে। এইজন্য ভূদান, সম্পত্তিদান, শ্রমদান প্রভৃতি আন্দোলন শুরু করা হইয়াছে। এই কাজের জন্য এমন বিচারধারা উৎপন্ন করিতে হইবে যাহাতে লোকে জীবন সমর্পণ করিতে অগ্রসর হয়।"

সর্বাঙ্গীন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে—দেশের আবহাওয়ায় বৈপ্লবিক তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু এই পরম অভীষ্ট সাধন করিবার মত উৎসর্গীকৃত-প্রাণ পর্যাপ্ত সংখ্যক সাধক কোথায়—সেবক কোথায়? বুদ্ধগয়া সর্বোদয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীজয়-প্রকাশ নারায়ণজী ভাষণ দিতে উঠিলেন। তিনি ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ। যদি এক-নিষ্ঠ কর্মী যথেষ্ট সংখ্যক থাকিত তবে বিহারে ৩২ লক্ষ একর ভাল ভূমিদান সংগ্রহ পূর্বেই হইয়া যাইত। সন্ত বিনোবাকে এতদিন বিহারে রাখিয়া কষ্ট দিতে হইত না। আন্দোলনে তীব্রতা আনাইবার প্রেরণা দান করিবার জন্য তিনি বলিলেন যে, আজকার যুগ এই আন্দোলনের জন্য অধিক সময় দিবে না। অহিংস ক্রান্তি হইবে এইজন্য ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপেক্ষা করিবে না। তিনি পূর্ব বৎসর ছাত্রগণকে এই আন্দোলনে এক বৎসর

সময় দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসরের কথা বলিলে এখন আর কাজ চলিবে না। এখন তো জীবন অর্পণ করিবার সময় আসিয়াছে। অতঃপর তিনি তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে আপনার জীবন-দান ঘোষণা করিলেন, সমগ্র সম্মেলন-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত হইল। বিনোবাজীর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ধীর, স্থির, গম্ভীর-ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমরা এইমাত্র এক ভাষণ শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় কথা বলিতেছিল। ইহাতে আমার রুক্মিণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। আজকাল পত্র-সাহিত্যকে সাহিত্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। রুক্মিণীর পত্র পত্র-সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঐ পত্রকে শুকযোগী কবিতাবন্ধ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রে রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লিখিয়াছিলেন —'আমার শতবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় তাহা করিব, প্রাণ পরিত্যাগ করিব, শরীর কৃশ হইতে কৃশতর করিয়া জীবনধারণ করিব; কিন্তু তথাপি তোমাকেই বরণ করিব।'* এইরূপ শুভ সংকল্পের কথা শুনিলে হৃদয়ে আনন্দ আসে। আমি মনে করি যে, এই যজ্ঞ সফল হইতে হইতে আমাদের জীবনকেও সফল করিবে।" এইখানেই ইহার শেষ হইল না—হইবারও কথা নয়। তখন হইতে

*রুক্মিণী দেবীর পত্রের অংশ :

* * * যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতি রিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ॥ ৪৩॥

উমাপতি ভগবান শংকরের ন্যায় মহাপুরুষগণও আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য আপনার চরণ কমলের ধূলিতে স্নান করিতে চাহেন। যদি আমি আপনার ওই প্রসাদ, আপনার ওই চরণধূলি লাভ করিতে না পারি তবে ব্রতের দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি উহার জন্য শত শত বার জন্ম লইতে হয় তবে তাহা লইব। কখন না কখন আপনার ওই প্রসাদ নিশ্চয় লাভ করিব।—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ৫২তম অধ্যায়।

বুদ্ধগয়া সম্মেলন ক্ষেত্রের হাওয়া বদলাইয়া গেল। সকলের হৃদয় শীতল হইয়া গেল। পরদিন ভোর হইতেই বিনোবাজী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ঐ বিষয়ে তাঁহার কিছু করা চাই। সুতরাং তিনি প্রত্যূষেই জয়প্রকাশ নারায়ণজীকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন যে, "ভূদানযজ্ঞমূলক, গ্রামোদ্যোগ প্রধান, অহিংসক ক্রান্তির জন্য আমার জীবন সমর্পণ।" অতঃপর সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনের প্রারম্ভেই বিনোবাজীর উক্ত পত্র পঠিত হইল। উহার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের সাধারণ কর্মী পর্যন্ত একে একে তাঁহাদের জীবন দানের সংকল্প লিখিতভাবে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। উহাতে প্রাতঃকালীন অধিবেশনের সমগ্র তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। জীবনদানকারীর সংখ্যা সাড়ে তিন শতেরও উপর উঠিল। উহার পরও জয়প্রকাশ নারায়ণজীর নিকটে জীবন দানের সংকল্প আসিতে থাকিল। এখন প্রশ্ন এই যে, এই জীবন দানের অর্থ কি? কায়, বাক্য, মন ও বুদ্ধি সবই এই মহান কার্যের জন্যই উৎসর্গ করা। ইহা ঠিক। কিন্তু শুধু কি তাই? জীবনদানকারীদের মধ্যে এমন কেহ কেহ থাকিতে পারেন —আছেনও, যাঁহারা পূর্বেই তাঁহাদের জীবন-দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুনরায় জীবন দানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? বিনোবাজী সম্মেলনের উপসংহারে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া বলিলেন। জীবন দানের তাৎপর্য কি তাহার আভাস কৃপালানীজী পূর্ব দিনের প্রার্থনা সভায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দিয়াছিলেন। বিনোবাজী সেই কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"উহার মধ্যে গভীর জিনিস রহিয়াছে যাহার আভাস কৃপালানীজী গতকল্য প্রার্থনা সভায় দিয়াছেন। তিনি এক বিশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁহার বলিবার ভঙ্গিও বিশিষ্ট। বলিতে গিয়া তিনি উপনিষদের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু সহজে বুঝা যায় না—তিনি কি বলিলেন। লোকের মনে হয় তিনি উপহাস বা বিদ্রূপ করিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে এবং আমি বলিব যে অহিংসভাবে বুঝাইয়াছেন—ভাই সব, জীবন তো দান করিতেছেন, কিন্তু কোন ময়লা জিনিস দান করিতেছেন না তো? এই খেয়াল যেন থাকে। শুদ্ধ বস্তু অর্পণ করিতে হয়। জীবন দানের বিচার ভাল। কিন্তু যিনি অন্তরে জীবন দানের সংকল্প করিবেন, তাঁহার এই

দিকে দৃষ্টি থাকা চাই যেন আবর্জনা দান না করা হয়। জীবন দানের সংকল্পের অর্থ জীবন শুদ্ধি এই কথা তিনি অত্যন্ত রুচিকরভাবে আমাদের সামনে রাখিয়াছেন। উহা কোনরূপ ঠাট্টা-তামাসা নহে। আজ যে আপনারা আমার সম্মুখে এবং আপনাদের নিজেদের সম্মুখে একে অন্যকে সাক্ষী রাখিয়া জীবন অর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন উহার সাথে সাথে জীবন শুদ্ধির সাধনা করা চাই। আমরা সার্বজনিক কাজ করিয়াছি। ইহার উপর ভূদানযজ্ঞের ন্যায় বুনিয়াদী কাজ, যাহার দ্বারা দেশের কায়া বদলাইবে, তাহার জন্য যদি জীবনদান করা হয় তবে এ যাবৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য যতটা প্রযত্ন করা হইত এখন তদপেক্ষা অধিক প্রযত্ন করিতে হইবে।"

ইহার কয়েক মাস পরে বিহারে জীবন-দান-শিবির উদ্ঘাটন করিবার সময় বিনোবাজী জীবন-দান যে আরও গভীর অর্থপূর্ণ এবং সেজন্য জীবন-দাতাকে যে উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া বলেন। আমরা কে? সারা জাগতিক ব্যাপার কে চালনা করিতেছেন? জাগতিক ব্যাপারের যোজনা কাহার এবং উহা কি? এই যোজনায় কি মনুষ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরই সমস্ত জাগতিক ব্যাপার চালনা করিতেছেন। সবই তাঁহারই যোজনা। আমরা কিছুই নহি। মনুষ্য তুচ্ছ। ঈশ্বর যদি তাঁহার কাজের জন্য কাহাকেও তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ বাছিয়া লন তবেই তাহার কিছু মূল্য হয়। কেবলমাত্র তখনই মনুষ্য তাঁহার যোজনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। নচেৎ মনুষ্য তুচ্ছ থাকিয়া যায়। কি করিলে বা কিরূপ হইলে তবে মনুষ্য ভগবানের হাতের যন্ত্র হইবার যোগ্য হয়? বীজ নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে তবেই বৃক্ষ জন্ম গ্রহণ করে। বীজের অস্তিত্ব থাকিতে বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। তদ্রূপ মনুষ্য আপনার 'আমিত্বের' বিনাশ সাধন করিয়া নবজীবন লাভ না করিলে ঈশ্বরের যোজনায় অংশগ্রহণ করিবার যোগ্য হয় না এবং ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করেন না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"যদি ঈশ্বরের যোজনায় যোগদান করিতে হয় তবে বীজের মত আপনাকে নিঃশেষ করিতে হইবে—খতম করিতে হইবে। বীজ খতম হইলে তবে বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এইজন্য বৌদ্ধগণ এক সিদ্ধান্তের কথা বলেন

যে, একটি বিনাশ হইতে একটি অস্তিত্বের জন্ম হয়। যদি আমরা নিজেদের রূপ বজায় রাখি তবে আমরা ঈশ্বরের কাজের যোগ্য হই না। কিন্তু লোককে প্রায়ই খালি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার অহম্-এর চারিদিকে কল্পনা-জাল, কর্তব্য-ক্ষেত্র এবং মমত্ব ঘিরিয়া থাকে। যদি কেহ উহাদিগকে কায়েম রাখিয়া ঈশ্বরের যোজনায় যোগদান করিতে চায় তবে ঈশ্বর বলেন যে, তুই আমার জন্য জায়গা খালি করিয়া রাখিস্ নাই। যদি তুই খালি হইয়া যাস তবেই না আমার জন্য স্থান হইবে! এই হইল জীবনদাতার স্বরূপ। যিনি খালি হইয়াছেন, যিনি নিজেকে শূন্য করিয়া ফেলিয়াছেন, যিনি নিজের জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছেন, কেবলমাত্র তিনিই জীবনদাতা হইতে পারেন। যিনি শূন্য হন নাই, তাহাতে তাঁহার নিজেরই চলিতে পারে; তাহাতে ঈশ্বরের চলিবে না। তুলসীদাসজী বলেন——বাবা, "অপনে করত মেরী ঘনী ঘটী ভঈ" আমি নিজে করায় আমার ইজ্জত নষ্ট হইয়াছে। এইজন্য এখন হইতে আপনিই করিবেন, আমি করিব না। আমাকে দিয়া করাইয়া লইবেন, আমি শূন্য হইয়াছি। যখন মন এই অবস্থায় উপনীত হয় তখনই মনুষ্য জীবনদাতা হয়। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলিলেন—"যথেচ্ছসি তথা কুরু" অর্থাৎ তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় সেরূপ কর। এই কথা বলিয়া ভগবান পরীক্ষা করিতে চাহিলেন যে, অর্জুনের ইচ্ছা বলিয়া কিছু অবশিষ্ট আছে কি না। যদি অর্জুন বলিতেন যে, আমার এই ইচ্ছা তবে ভগবান বলিতেন—তুমি অযোগ্য, তুমি আমার যোগ্য নহ। অর্জুন বলিলেন—আমার আবার ইচ্ছা কি? "নষ্টো মোহঃ" আমার মোহ দূরীভূত হইয়াছে। এইজন্য "করিষ্যে বচনং তব" অর্থাৎ তোমারই আজ্ঞা পালন করিব। গীতা-প্রবচনের শেষের দিকে দাদুর এক বচনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ছাগ "ম্যায়, ম্যায়" (আমি, আমি) করিয়া ডাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর যখন দেহের অংশ বিশেষ হইতে তাঁত তৈয়ারি হইয়া পিঞ্জনে লাগান হয় তখন উহা হইতে "তু-হী, তু-হী" (তুই, তুই) নির্গত হয়। অহঙ্কারের অন্ত হইবার পর 'তু, তু' (তুই, তুই) শুরু হয়। তখনই ভগবান ঐ ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার কাজ করাইয়া লন।"

এই জগৎ এক রঙ্গমঞ্চ। এখানে এক নাটকের অভিনয় চলিতেছে। প্রত্যেক মানুষ এক একজন অভিনেতা। অভিনয় করিবার সময় যদি অভিনেতা

মনে করিতে থাকে যে, সে প্রকৃতপক্ষে অমুক লোক, তবে তাহার অভিনয় সফল হয় না। সেরূপ ভগবানের কাজ করিবার সময় যদি আমরা আমাদের আমিত্বকে স্মরণ রাখি তবে ভগবানের কাজ আমরা করিতে পারিব না। তাই বিনোবাজী বলেন—"বিনোবা যদি কাল হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করে তবে সে সময় তাহার ইহা স্মরণ করা উচিত হইবে না যে সে বিনোবা।"

মানুষ নিঃশেষে তাহার অহঙ্কার বিসর্জন দিলে তবে জীবনদাতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার চরম প্রমাণ তো জীবন থাকিতে হইতে পারে না। মৃত্যুর পর ইহা নির্ণীত হইবে—কে তাহার জীবন সমর্পণ করিয়াছিল, আর কে করে নাই। তাই অমুক জীবনদাতা, একথা বলা যাইতে পারে না। অমুক জীবনদাতা হইবে—একথা একমাত্র অন্তর্যামী বলিতে পারেন। কেবলমাত্র মৃত্যুর পর বলা যাইতে পারে যে, অমুক জীবনদাতা ছিল। এই বিচার বুঝাইয়া বিনোবাজী বলেন—"যিনি বলিবেন 'আমি জীবনদাতা' 'ম্যাঁয় জীবনদানী হুঁ'। তাঁহার 'হুঁ' খতম হইবে এবং 'ম্যাঁয়' 'আমি' থাকিয়া যাইবে। এইজন্য ইহা বলা ঠিক নয় যে আমি জীবনদাতা। তাই জীবনদাতাগণের সভা স্বর্গে হইতে পারে। পৃথিবীতে আমাদের ন্যায় সামান্য মনুষ্যদেরই সভা হইবে। জীবনদাতাদের সম্মেলন স্বর্গে হইবে মৃত্যুর পরে, তাহার পূর্বে নয়।"

মনুষ্যের পূর্বেকার চরিত্র দেখিয়া বলা যাইতে পারে না যে, তিনি জীবনদানের সংকল্প গ্রহণ করিয়া জীবনদাতার যোগ্য অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন কি না। এমন হইতে পারে যে, একজন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকও জীবনদান করিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার অহং ত্যাগ না করিতে পারায় জীবনদানের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইলেন। আবার অন্যদিকে এক রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক শ্রদ্ধার সহিত জীবনদানের সংকল্প গ্রহণ করিবার পর তাঁহার এমন পরিবর্তন আসিয়া গেল যাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম হইল ও তিনি নিজেকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের হাতে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিয়া প্রকৃত জীবনদাতা হইলেন। অতএব জীবন-দাতাদের মধ্যে যাঁহারা রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয় তাঁহাদিগকে বাদ দিবার প্রশ্ন উঠে না। তাই বিনোবাজী বলেন—"কাহাকেও

বাদ দিবার আমি কে? আমারই মৃত্যুর পর আমি জীবনদাতা ছিলাম কি না সেই বিচার হইয়া তবেই আমার কোন্ স্থান পাওয়া উচিত তাহা নির্ণীত হইবে।" অতএব যিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি জীবনদান করিতেছেন, তিনিই জীবনদাতা ইহা মানিয়া লওয়া উচিত। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"আমরা শব্দ প্রমাণ মানিয়া থাকি। লোক গণনার সময়ে কে হিন্দু, কে মুসলমান তাহা লেখা হইয়া থাকে। মুখে যে যাহা বলে তাহাই সত্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। এ সম্পর্কে শাস্ত্রের প্রমাণ চাওয়া হয় না। লোকে বলে—আমি জানি অমুক কেমন লোক; সে বৃথা নাম দিয়াছে। অর্থাৎ আমরা যেন মানুষের অন্তর্যামী।" কাঠ পুড়িয়া ছাই হইবার পর বুঝিতে পারা যায় না উহা কি কাঠ ছিল। সেরূপ আজ যে যে-প্রকৃতির হউক না কেন, জীবনদান ঘোষণার পর যদি নিজেকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলে অর্থাৎ নিজেকে নিঃশেষে ভগবানের হাতে সমর্পণ করে তবে সেই অবস্থায় বুঝা যায় না (এবং তাহা জানিবার প্রয়োজন থাকে না) যে সেই ব্যক্তি পূর্বে কোন্ প্রকৃতির ছিল। এই বিচার বুঝাইয়া বিনোবাজী বলেন—"কাষ্ঠে অগ্নি প্রয়োগ করা হইল। কাষ্ঠ পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইল। তখন উহা বকুল বা আম থাকে না। দেখিয়া যদি কেহ বলিতে পারে যে উহা অমুক কাষ্ঠ ছিল তবে বুঝিতে হইবে—তাহা সম্পূর্ণ অঙ্গার হয় নাই। ভিতরের কাষ্ঠ এখনও পুড়িয়া ছাই হইতে বাকি আছে।"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যাঁহারা জীবনদান দিয়াছেন তাঁহাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি হইবে? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"ইহার উত্তর এই যে যিনি বিশ্বম্ভর তিনিই সেই ব্যবস্থা করিবেন। 'যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স ভক্তান্ কিং উপেক্ষতে?' ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিবেন না। তিনি বিশ্বম্ভর ইহা কখনও মিথ্যা প্রমানিত হয় নাই। যদি জীবনদাতাগণ ভক্ত হন তবে বিশ্বম্ভর তাঁহাদের চিন্তা করিবেন। ইংরাজী ভাষার অর্থে আমাদের এই কাজ 'সার্ভিস' নহে। ইহা পরিশুদ্ধ সেবা। অতএব জীবিকার ব্যবস্থার জন্য কোনরূপ গ্যারান্টি ইহাতে নাই। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; তাহা যে করা হইবে—ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে না। কাজের মাধ্যমে তাঁহার শিক্ষা হইবে।

জীবনদাতাগণের মিত্র-মণ্ডল যথেষ্ট বড়। ঐ মিত্র-মণ্ডলের দ্বারা তাঁহাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা হইয়া যাইতে পারে। ঐ মিত্র-মণ্ডল হইতেছে বিশাল জনতা। সুতরাং জীবনদাতাগণের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু ব্যবস্থা করিতেই হইবে এবং ঐ জন্য চিন্তা করিতে হইবে—এরূপ আমি মনে করি না। ভগবানের হাতে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা—ইহাই বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ। প্রথমেই আমি বলিয়াছি যে, যদি অহংকার থাকিয়া যায় তবে জীবনদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ভক্তিরই সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। ভক্তি লাভ হইবার পর যাহার যতটুকু শক্তি সেরূপ কাজ হইবে। কাজ করিতে করিতে শক্তি বৃদ্ধি হইবে। এই-রূপে যুক্তিরও বিকাশ হইবে। যাঁহারা জীবনদান করিয়াছেন তাঁহাদের শক্তি ও যুক্তি কম থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের ভক্তি যেন কম না থাকে।"

যাঁহারা জীবনদান করিযাছেন তাঁহাদের দ্বারা কিভাবে কাজ করাইয়া লওয়া যায়—এই সমস্যা আছে। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"যিনি জীবনদান দিয়াছেন তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে তিনি সেইক্ষণ হইতে এই কাজে লাগিয়া গিয়াছেন—এরূপ মনে করিয়া লইতে হইবে। অতএব আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ চান তবে আমি নিশ্চয়ই পরামর্শ দিব। যদি আমার সাহায্য চান তবে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য দিব। যিনি জীবনদান করিয়াছেন তিনি কোন ব্যক্তির হাতে তাঁহার জীবন সমর্পণ করেন নাই।" অতএব তাঁহাদের পরিচালক কেহ নাই বা থাকিবে না। বিনোবাজী বলেন যে, তাঁহারা ভেড়ার দল নহে, তাঁহারা প্রত্যেকেই ব্যাঘ্র। তাঁহারা নিজেদের শক্তিতে কাজ করিবেন। তাঁহাদের জন্য কোন মেষ-পালকের প্রয়োজন হইবে না। যাঁহারা জীবন দান করিয়াছেন তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া লইবেন। তাঁহাদের পরস্পরে উপদেশের ও পরামর্শের আদান-প্রদান হইবে। বিনোবাজী বলেন—"ইহা ভক্তের এক লক্ষণ। 'বোধয়ন্তি পরস্পরম্'। বোধ দিবার জন্য একজন কোন ধর্মাধিকারী থাকিবেন না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে উপদেশ দিবেন—পরামর্শ দিবেন।"

জীবনদান যে কেবলমাত্র পরিণত বয়সের ব্যক্তিরা করিবেন এমন নহে। বালক-বালিকাগণও জীবনদান করিতে পারেন।

বিনোবাজী আরও বলেন—"জীবনদানের অর্থ অন্তিম প্রবাস। ইহা অন্তিম কার্য। যিনি জীবনদান দিয়াছেন তিনি অখণ্ড পান্থিক হইয়া গিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইবেন। কখন পশ্চাদ্ধাবন করিবেন না। এই অন্তিম কার্যে কাহারও জন্য কেহ অপেক্ষা করিবেন না। কাহারও জন্য কেহ পিছাইয়া থাকিবেন না। চলিতে চলিতে যিনি পড়িয়া গেলেন, তিনি পড়িয়াই থাকিলেন। চলিতে চলিতে যিনি চলা বন্ধ করিলেন, তিনি থাকিয়াই গেলেন। কাহারও জন্য কেহ অপেক্ষা করিবে না।" এই সম্পর্কে তিনি পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী চলিতে লাগিলেন। ভীম পড়িয়া গেলেন এবং ধর্মরাজকে বলিলেন—সাহায্য করুন। ধর্মরাজ বলিলেন—ভাই, উঠিয়া দাঁড়াও। তবে কিছু সাহায্য করা সম্ভব। তিনি ভীমের জন্য থামিয়া গেলেন না। একে একে অন্য সকলেই এইভাবে পড়িয়া থাকিলেন। স্বর্গদ্বারে তাঁহার একজন মাত্র সংগী থাকিল। তাহা হইতেছে তাঁহার কুকুর। তাহাকে ছাড়িয়া তিনি স্বর্গের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। এ সম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলেন—"এই ব্যাপারে সকলেই মুক্ত। মুক্ত থাকিয়া সম্মুখে ঐ যে একমাত্র কার্য তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এরূপ বিচার অন্তরে গ্রহণ করিলে কাজ সহজ হইয়া যাইবে এবং এই কাজের কোন দুষ্পরিণামের আশংকা থাকিবে না। প্রত্যেকেরই পরীক্ষা হইবে। যে টিকিয়া গেল তো গেল। যে টিকিল না তো টিকিল না। যিনি আমাদের সংগে চলিতে চাহিবেন তাঁহার সংগে আমরা আছি। যিনি আমাদের সংগ ত্যাগ করিলেন তাঁহার ঐরূপ করিবার অধিকার আছে এবং আমাদের আগাইয়া চলিবারও অধিকার আছে।"

বুদ্ধগয়ায় জীবন দানের যে লহরী উঠিয়াছিল তাহা মন্দীভূত হয় নাই। অবিরতভাবে জীবন দানের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এ যাবৎ (জু ১৯৫৪) সাত শতের অধিক ব্যক্তি জীবনদানের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। জীবনদানকারীদিগকে চিত্তশুদ্ধির প্রেরণা দানের জন্য তথা তাঁহাদের পক্ষে যোগ্য জীবন-শৃংখলায় তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য শিবিরের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের যোগ্যতা ও মানসিক ঝুঁকি

অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তাহার জন্য প্রযত্ন করা হইতেছে। জীবনদানের প্রক্রিয়ায় এক দৈবী শক্তি নির্মিত হইতেছে এবং ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয় সাধনায় এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। সর্বোদয় প্রতিষ্ঠায় ইহাব সম্ভাবনা অপরিমেয়।

**পরম ধর্ম**

ভূদানযজ্ঞের কাজে জীবন দানের জন্য আহ্বান করা হইতেছে। কর্মীদের সমস্ত সময় ও শক্তি এই কাজে নিয়োগ করিবার জন্য বলা হইতেছে। এমন কিছু কর্মী আছেন যাঁহারা কয়েক বৎসর যাবৎ গঠনমূলক কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা যে সব কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা পুণ্যকার্য। যে কাজ তাঁহারা অনেক বৎসর যাবৎ করিয়া আসিতেছেন উহা করিয়া যাওয়া তাঁহাদের ধর্ম। এরূপ বলা হয় যে, ভূদানের কার্য শ্রেষ্ঠ কার্য। কিন্তু তাঁহারা যে সেবাকার্য করিয়া আসিতেছেন তাহা গীতার শিক্ষা অনুসারে তাঁহাদের পক্ষে 'স্বধর্ম'। স্বধর্ম গৌণ কার্য হইলেও উহা পরিত্যাজ্য নহে। উপরন্তু পরধর্ম শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা গ্রহণ করা উচিত নয়। এইজন্য শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠের বিচার এখানে উঠিতে পারে না। যে কার্য তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন এবং যাহা তাঁহাদের কর্তব্য উহা তাঁহাদের করিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বিনোবাজী বলেন—"ধর্ম বিচারেরও একটি সীমা আছে। শ্রীকৃষ্ণ সারা জীবন অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক সময় আসিল যখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে তিনি আর অস্ত্র ধারণ করিবেন না—নিঃশস্ত্র থাকিবেন। এইরূপে যিনি সতত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন তিনি আর কখনও অস্ত্র ধারণ করিবেন না—এই ঘোষণা করিলেও তাঁহার পক্ষে ধর্মযোগ ত্যাগ করা হয় নাই বরং তিনি ঐ কার্যের দ্বারা ধর্মকে এক স্তর উপরে উঠাইয়াছিলেন। যাহাকে আমরা পুণ্য কার্য বা ধর্ম-কার্য বলিয়া থাকি তাহা কতক দূর পর্যন্ত আত্ম-বিকাশের সহায়ক, কিন্তু তাহার পরে উহা বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছে—"ধর্মোপিহি মুমুক্ষুণাং পাপমুচ্যতে"। মুমুক্ষুর পক্ষে ধর্মও পাপে পরিণত হয়।"

কর্তব্যের ভাবনাও অনেক সময়ে বিঘ্নকারক হইয়া উঠে। তাই বিনোবাজী বলেন—"তুলসীদাস রামায়ণে লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণের সম্মুখে এরূপ এক সমস্যা আসিয়াছিল। রাম বন-গমন করিবার সময় লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন যে পিতা-মাতার সেবা করা তাহার কর্তব্য। লক্ষ্মণ যদি রামচন্দ্রের এই কথা মানিয়া লইতেন এবং বাল্মিকী এইরূপ লিখিতেন যে, লক্ষ্মণ পিতা-মাতার সেবা করিবার জন্য ঘরে থাকিয়া গিয়াছিলেন তবে এমন কে আছে যে ইহাতে দোষ দেখিত? আমরা তো ইহা বলিতাম যে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করার লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন এবং মাতা-পিতার সেবায় মগ্ন হইয়াছিলেন। এখানে স্বধর্মের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। তাই স্বধর্মের প্রশ্ন লক্ষ্মণের সম্মুখে ছিল কিন্তু তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন—'আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক। কিন্তু এত বড় বড় কথা আমি বুঝি না। আমি তো বালক এবং আপনার স্নেহে লালিত-পালিত। এইজন্য আপনি যেরূপ বলিতেছেন আমার দ্বারা সেরূপ স্বধর্মাচরণ হইতে পারে না।' এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিলেন। ছোট ছোট ধর্ম থাকে বটে কিন্তু পরম ধর্ম একই হইয়া থাকে। যেখানে উভয়ই সাধারণ ও ক্ষুদ্র ধর্ম সেখানে সেই উভয়ের মধ্যে তুলনা হইতে পারে। কিন্তু যেখানে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম এবং আর একটি পরমধর্ম সেখানে তুলনা হইতেই পারে না। যেখানে উভয়ই সাধারণ ধর্ম সেখানে স্বধর্মের প্রশ্ন আসে এবং সেই ক্ষেত্রে স্বধর্ম গৌণ, এবং পরধর্ম শ্রেষ্ঠ হইলেও স্বধর্মকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যেখানে পরমধর্ম ও স্বধর্ম দুই উপস্থিত হয় সেখানে ঐরূপ নির্ণয় করা যায় না। ঐ সময়ে পরম ধর্মকে মানিয়া লইতে হয়।"

পরম ধর্মের বিষয় আরও পরিষ্কার করিবার জন্য বিনোবাজী আরও বলেন—"পরম ধর্মের আচরণের জন্য নিজের স্বধর্মকে পরম ধর্মের ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। যদি উহাকে ঢালিয়া সাজান সম্ভবপর না হয় তবে স্বধর্মকে ত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চধর্ম অর্থাৎ পরম ধর্মের সম্মুখীন হইলে স্বধর্মকে ত্যাগ করিতেই হয়। সেই সময়ে স্বধর্মে লাগিয়া থাকা ঠিক নয়। অতএব আচরণের নিমিত্ত স্বধর্মকে পরমধর্মের ছাঁচে ঢালিয়া লও অথবা স্বধর্ম পরিত্যাগ কর—ইহাই ধর্ম-রহস্য।"

**ষষ্ঠাংশ দানের রহস্য**

ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে, জমিদার জোতদারেরা এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি দান করিয়া অবশিষ্ট পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ আরামে ও নিরাপদে ভোগ করিতে থাকিবে এবং তাঁহাদের জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিবে। ইহাতে সমাজের ক্রান্তি আসার সম্ভাবনা কম। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ভূদান-যজ্ঞ ভূমি ও সম্পত্তির স্বামিত্ব বিসর্জনের দীক্ষা দানের আন্দোলন। যিনি আজ এক-ষষ্ঠাংশ দান করিলেন তিনি কাল উহা অপেক্ষা অধিক দান করিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁহার সম্পত্তি বিসর্জন সম্পূর্ণ না হয় ততদিন তাঁহার দান চলিতে থাকিবে। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"রবারকে খুব বেশী টানিলে উহা ছিঁড়িয়া যায়; অতএব ধীরে ধীরে উহা টানা চাই। এই জন্য আমি এখন মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ চাহিতেছি। আজ তো সবটাই মালিক নিজের কাছে সঞ্চিত রাখিয়া থাকে। সমাজের এই রীতি চলিতেছে। তাই আমি প্রথমে এক-ষষ্ঠাংশ চাহিতেছি। পরে অধিক চাহিব। ব্যক্তির গুণ বিকাশ করিবার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া আবশ্যক।" সম্পত্তিদান সম্পর্কে বিনোবাজী এই কথা বলিয়াছেন। ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে ঐ কথাই প্রযোজ্য। তিনি সম্প্রতি রাঁচীতে বিহার প্রদেশের ভূদানকর্মীদের শিবিরে যে প্রবচন দিয়াছেন তাহাতে এই কথা আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"বিহারে আমরা অধিক গভীরতায় প্রবেশ করিতেছি। আমি এখানে কেবলমাত্র জমি ও দানপত্রের কোটা (quota) বৃদ্ধি করি নাই; পরন্তু গ্রামবাসীদিগকে ইহা বুঝাইতেছি যে, গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্রদিগকে ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা আপনা-দিগকে করিতে হইবে এবং সকলে মিলিয়া আপনাদের ইহা করা চাই। প্রথমে আমি বলিব প্রত্যেক গ্রাম হইতে ৫।১০ একর পাওয়া চাই। পরে আরও এক পা অগ্রসর হইব। গভীরতায় প্রবেশ করিতে হইলে ধীরে ধীরে যাইতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে দানপত্র লইতে হইবে। অতঃপর অন্তিম পদক্ষেপ লইব এবং লোককে বলিব—এখন মালিকত্ব একে-বারেই বিসর্জন দিতে হইবে। এরূপে কর্মীদের ভূদানযজ্ঞের পূর্ণ দর্শনের জ্ঞান থাকা চাই। আপনাদের সকলের মনে এই দৃষ্টি থাকা চাই এবং ক্রমে

ক্রমে এক এক পা অগ্রসর হওয়া চাই।" এ সম্পর্কে তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন—"লোকে জিজ্ঞাসা করে যে এক-ষষ্ঠাংশ দিলে পরে আবার চাহিবেন না তো? আমি বলি, ধর্ম-কার্য হইতে কি কখন মুক্তি পাইতে আছে? তাহাতে তো বন্ধন আসে? পরে তো সব কিছু দিয়া গরীবের সেবায় লাগিয়া যাওয়া চাই। বামনের তিনটি বিরাট পা। বামনের তৃতীয় পদক্ষেপে যেরূপ হইয়াছিল তদ্রূপ অবশেষে আমাদিগকে গরীব হইয়া যাইতে হইবে এবং জীবনকে সাদা-সীধা করিয়া তুলিতে হইবে।

সন্তানকে উঠাইবার সময় মাতাকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয়।' সেইরূপ গরীবকে উঠাইতে গিয়া আমাদের জীবন-যাত্রার মানকে কিছু নীচু করিতে হইবে। এক-ষষ্ঠাংশ দানের দ্বারা ইহার আরম্ভ হইয়াছে।"

সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কেও অনুরূপ আপত্তি উঠিয়া থাকে। বিনোবাজী উহা খণ্ডন করিয়াছেন। "আমি এক-ষষ্ঠাংশ চাহিতেছি বলিয়া কি আর পাঁচ ভাগ সংগ্রহ মানিয়া লইতেছি? কিন্তু আমার উহা মানিয়া লইবার প্রশ্নই উঠে না। যে লোক পুরা ছয় ভাগ সংগ্রহ রাখা ঠিক মনে করিতেছে তাহার সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ চাহিয়া লইয়া তাহার ঐ মনোভাবে আমি ধাক্কা দিতেছি। তাহার দ্বারা আমি তাহাকে বিচার করিবার প্রেরণা দান করিতেছি। ভক্তগণ বলিয়াছিলেন—যিনি একবার 'হরিনাম' লইতে পারিয়াছেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন। যিনি এক-ষষ্ঠাংশ জীবন-নিষ্ঠা স্বরূপে চিরদিন সমাজকে দিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন তিনি নিজের সমগ্র সম্পত্তি, নিজের সারা জীবন এমন কি নিজের শরীর-যাত্রা পর্যন্ত সমাজকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। সম্পত্তিদানযজ্ঞের প্রতি তাকাইবার পক্ষে ইহাই দূরদৃষ্টি।"

### ভূমি বিতরণ

ভূদানযজ্ঞের কর্মীদের শক্তি, সামর্থ্য ও সময় যাহাতে একনিষ্ঠভাবে ভূমিদান সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকে সেই উদ্দেশ্যে এতদিন সর্বত্র ভূমি বিতরণ কার্য আরম্ভ করা হয় নাই অথবা যেখানে ভূমি বিতরণ আরম্ভ করা হইয়াছিল সেখানেও উহা ত্বরান্বিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই।

বুদ্ধগয়া সম্মেলনের পর হইতে ভূমি বিতরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। ভূমি বিতরণের ফলে ভূদানযজ্ঞের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ স্বরূপ জনগণের নিকট প্রতিভাত হইবে। ভূমি সংগ্রহ অপেক্ষা ভূমি বিতরণের কাজ অধিকতর শ্রমসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ। ভূমি বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে। উপরন্তু বিনোবাজী বিতরণ সম্পর্কে যে সব নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা যথাযথ পালন করিতে হইবে। নচেৎ বিতরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। বিতরণ সম্পর্কীয় নিয়মাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ—(১) বিতরণ কার্য গ্রামের সার্বজনিক সভায় করিতে হইবে; (২) বিতরণের নির্দিষ্ট তারিখের সাত দিন পূর্বে একবার এবং একদিন পূর্বে আর একবার বিতরণের বিজ্ঞপ্তি ঢোলসহরৎ দ্বারা প্রচার করিতে হইবে। (৩) গ্রামের অধিবাসীদের সর্বসম্মতিক্রমে অন্যথায় ভূমি-হীনদের সর্বসম্মতিক্রমে বিতরণ করিতে হইবে। তাহাতে মতভেদ ঘটিলে লটারি করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সবই কার্য একই সভায় শেষ করিতে হইবে। (৪) ভূমি বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সভায় মাত্র সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত থাকিবেন, সেবকস্বরূপ থাকিবেন, নির্ণায়কস্বরূপ নহেন। এই ব্যাপারে যেন কিছুমাত্র পক্ষনিষ্ঠ দৃষ্টি না থাকে। (৫) যত-দূর সম্ভব দানপ্রাপ্ত ভূমির এক-তৃতীয়াংশ হরিজনদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। (৬) সাধারণতঃ যে গ্রামে ভূমিদান পাওয়া গিয়াছে সেই গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্রেরা ভূমি পাইবে। ভূমিহীনদের মধ্যে যে ব্যক্তির কখন জমি ছিল না তাহার দাবি সর্বাগ্রগণ্য হইবে। সেই গ্রামে বিতরণের পর ভূমি উদ্বৃত্ত থাকিলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভূমিহীনগণ ভূমি পাইতে পারে।

ভূমি বিতরণ ব্যাপারে একটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ভূমি-প্রাপকের মনে যেন এরূপ ধারণা না জন্মে যে, গরীব বলিয়া দয়া করিয়া তাহাকে ভূমি দেওয়া হইতেছে। গরীবকে যে অধিকার হইতে এতদিন বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল সেই অধিকার তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইতেছে। কর্মীদের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া এরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে লোকে মনে করিবে যে, আজ পর্যন্ত ভূমিহীনকে

ভূমি দিতে না পারায় সমাজের পক্ষে এক মস্তবড় অন্যায় করা হইতেছিল, ভূদানযজ্ঞের দ্বারা সেই ভুলের সংশোধন করা হইতেছে।

জমি যিনি নিজে চাষ করেন না এবং বিনা পরিশ্রমে জমির উৎপন্ন ফসল ভোগ করিতে চান তিনি জমির মালিক হইতে পারেন না। যিনি শ্রম করিতে পারেন তিনি আজ তাঁহার অধিকার ফিরিয়া পাইতেছেন বটে কিন্তু তাঁহার যেন স্মরণ থাকে যে, অধিকারের অপর দিক হইতেছে কর্তব্য। কর্তব্য যথাযথ পালন করিলে তবে অধিকার লাভ সার্থক হয়—ইহা ভূমি-প্রাপকের হৃদয়ে ভালভাবে অঙ্কিত করিতে হইবে। তাই জমি লইয়া যাহা খুসী তাহা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। জমি নষ্ট করিলে, জমিতে কম ফসল উৎপন্ন করিলে অথবা জমি পতিত রাখিলে তিনি ঈশ্বরের নিকট এবং সমাজের নিকট অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

সর্বোপরি ভূমি বিতরণের সময় হইতে ভূমি-প্রাপককে সর্বোদয়ের দীক্ষা দান করিতে হইবে, তাহাকে সর্বোদয়ের ভাবধারায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পরিবারকে 'সর্বোদয় পরিবার' স্বরূপে সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাই মাদকতা হইতে তাহাকে বিরত থাকিতে হইবে। জীবিকার পরিপূরক উপায় স্বরূপ তাহাকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। তজ্জন্য অবিলম্বে সুতাকাটা শিক্ষা করিয়া বস্ত্র-স্বাবলম্বনের জন্য নিয়মিত-ভাবে সুতা কাটিতে হইবে ও প্রতি বৎসর সুতাঞ্জলি অর্পণ করিতে হইবে। তাহাকে ঢেঁকিতে চাউল তৈয়ারি করিয়া লইতে ও চাকিতে গম পিষিয়া লইতে হইবে। গুড় বা হাতে প্রস্তুত চিনি এবং ঘানির তৈল তৈয়ারি করিয়া লইতে অথবা ব্যবহার করিতে হইবে। এরূপে ক্রমে ক্রমে সর্বোদয়ের পথে তাহাকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই ভূমিবিতরণের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

### ভূমির বিখণ্ডীকরণ

এরূপ আক্ষেপ করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞের দ্বারা ভূমি আরও টুক্‌রা হইয়া যাইতেছে, কারণ দু'-চার কাঠা পরিমাণ দানও উহাতে গ্রহণ করা হয়। ঐ আক্ষেপ দূর করিবার জন্য বিনোবাজী বলিয়াছেন—"কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আজ হৃদয় টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া আছে, ইহা কি আপনাদের ভাল লাগিতেছে? আজ

সকলের হৃদয় টুকরা টুকরা হইয়া রহিয়াছে। যদি হৃদয়ের টুকরা জুড়িয়া দেওয়া যায় তবে জমির টুকরাও সহজে জুড়িয়া দেওয়া যাইবে। গরীব-দিগকে জমি দেওয়া হইয়া যাইলে তাহাদিগকে সমবায়ের মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া কষ্ট সাধ্য হইবে না। প্রথম হইতেই যদি সমবায়ের সর্ত লাগানো যায় তবে উহা বাহিরের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইবে এবং উহাতে একজন ম্যানেজারের আবশ্যক হইবে। এইজন্য জমির মালিক পরমেশ্বর—ইহা বুঝাইয়া দিয়া আজ আমি গরীবকে জমির পূরা অধিকার দিতে চাহিতেছি। যদি হৃদয় জুড়িয়া যায় তাহা হইলে জমি জুড়িয়া দেওয়া কি আর কঠিন ব্যাপার হইবে? কোন্‌টা প্রথম জুড়িতে হইবে তখন তাহা তো বুদ্ধির বিষয়। যেখানে হৃদয় ভগ্ন হইয়া আছে সেখানে কি জমি জোড়া দেওয়া সম্ভব হইবে? এক ভাই আমাকে বলিয়াছেন যে, 'কোঅপারেসন' করিবার জন্য যখন লোক তৈয়ারী হইবে তখনই আমি জমি দিব। তাহাতে আমি তাঁহাকে বলি যে, 'আপনি লোককে এই জন্য বুঝান।' ইহাতে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা হইল। কারণ লোকে বলিতে লাগিল—'আমরা সমবায়ের মধ্যে যাইব না। অন্য কাজে আমরা নিজেরাই সমবায় করি না, আর অন্য দিকে আমরা ঐ সব গরীব লোকের উপর সমবায়ের সর্ত আরোপ করিতে চাহিতেছি ও বলিতেছি—'সমবায় কর'।' তাহাতে উহাদের উপর প্রতিবন্ধক চাপানোর ব্যবস্থা করা হইবে। আর উহারা তো আজ ভীত হইয়া আছে।' তখন সেই ভাই আমার কথা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রথমে হৃদয় জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক।"

### বিখণ্ডীকৃত ভূমির উৎপাদন

এরূপ আপত্তি করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞের ফলে জোত খণ্ডিত হইবে এবং তাহাতে উৎপাদন কম হইবে। এই আপত্তির কোন ভিত্তি নাই। চীন ও জাপানে গড়ে জোত হইল মাত্র দুই একরের মত কিন্তু উৎপাদন আমাদের দেশের তিনগুণ। উৎপাদনের হার জমি বড়-ছোটর উপর খুব বেশী নির্ভর করে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া জমি আবাদ করা হয় কিনা তাহাই আসল কথা। যেখানে চাষ-আবাদে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ করা হয় সেখানে বেশী ফসল ফলে। শ্রীমন্নারায়ণ আগরওয়াল তাঁহার এক প্রবন্ধে

লিখিয়াছেন—"পৃথিবী ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে ইহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, জমির ক্ষেত্রফল বর্ধিত হইলে এবং যন্ত্র ব্যবহার করিলে ঐ জমির কৃষি-কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের মত ঘন বসতিপূর্ণ দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে আত্যন্তিক কৃষিই ( intensive cultivation অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সত্যিকার সমাধান। অবশ্য ইহা ঠিক যে ছোট ছোট কৃষকদিগকে ভাল বীজ, সার, জল-সেচ এবং সমবায় পদ্ধতিতে বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে হইবে।" জমিতে কম-বেশী. ফসল উৎ-পাদনের ব্যাপারে আরও একটি প্রধান কারণ আছে। যেখানে জমিতে চাষীর পুরা অধিকার থাকে সেখানে উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। মজুর বা ভাগচাষী দ্বারা চাষ করিলে উৎপাদন কম হয়। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতা। চাষীকে জমিতে পুরা অধিকার না দেওয়া পর্যন্ত জমিতে উপযুক্ত সার বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগ করিবার বা জমিতে অধিক পরিশ্রম করি-বার দিকে চাষীর প্রেরণা জাগানো সম্ভব নহে। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"ছোট টুকরায় উৎপাদনের হার অধিক অথবা বড় টুকরায় উৎ-পাদনের হার অধিক—এই আলোচনা আর কি করিবেন? ইহা তো অর্থ-শাস্ত্রের এক মামুলী ব্যাপার যে, যে প্রকার টুকরায় উৎপাদন বেশী হইবে সেরূপ টুকরা তৈয়ারী করা হইবে। আসল কথা, হৃদয় জুড়িয়া গেলে অধিক ফসল হয়—ভূমির কেবল ছোট বা বড় টুকরার দ্বারা তাহা হয় না। পরিশ্রমের দ্বারা অধিক ফসল হয়—ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা। ছোট টুকরায় অধিক ফসল উৎপন্ন হয়—ইহা জগতের কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে। মজুরকে যদি আমরা জমির মালিক করি, তবে সে প্রেমপূর্বক জমি চাষ করিবে ও তাহাতে জমির উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যেখানে অধিক ফসল উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে অনুসন্ধান লইলে জানা যায় যে, ঐ জমির মালিক গরীব। আর যেখানে ফসল খারাপ হইয়াছে সেখানে অনুসন্ধানে জানা যায় ঐ জমির মালিক ধনী। 'Absentee Landlord' (অনুপস্থিত মালিক) এর কথা সকলে জানেন। অতএব অর্থশাস্ত্রের এইসব ছোটখাট প্রশ্ন উঠাইবেন না। আমাদের কাজ বুনিয়াদী ক্রান্তির কাজ—যাহাতে সমাজের আমূল পরিবর্তন হইবে।"

### Ceiling-এর প্রশ্ন

ভূমিসমস্যা সমাধানকল্পে ভূমি বণ্টনের কথা আজ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে কিছুদিন যাবৎ এক বিপদজনক কথা উত্থাপন করা হইতেছে। তাহা হইতেছে—জমির মালিকদের সব চাইতে কত বেশী জমি রাখিতে দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া সেই ব্যবস্থা করা। সিলিং (ceiling) নামে এই কথা আজকাল বেশ চালু হইয়াছে। অনেকে ভাবেন সিলিং ধার্য করিয়া দিলে ভূমিসমস্যার সমাধান সহজ হইয়া পড়িবে। এই ধারণা ভ্রান্ত। যাঁহারা সিলিং-এর কথা উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। বড় বড় জমির মালিকের মালিকত্ব কতদূর রক্ষা করা যায় তাহাতেই তাঁহাদের আগ্রহ। ভূমিহীন দরিদ্রেরা জমি পাইবে কি পাইবে না তাহাতে তাঁহাদের আগ্রহ নাই। অথচ ভূমিহীন দরিদ্রের জন্য ভূমির ব্যবস্থা করার প্রশ্ন আজ দেশের সব চাইতে জরুরী ও বুনিয়াদী সমস্যা। ভূমিহীন দরিদ্রের জন্য প্রথমে ভূমির ব্যবস্থা করা, পরে অন্য সব কথা। এই বুনিয়াদী সমস্যাকে অগ্রাধিকার দান করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি আমরা তাহা করি তবে সিলিং-এর প্রশ্ন উঠে না। অথবা যদিবা উঠে তবে তাহা নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়ে। অন্য দিকে যদি সিলিং-এব কথা অগ্রগণ্য করিয়া অগ্রসর হই তবে বড় বড় ভূমির মালিকেরা ভূমি আত্মীয়-স্বজনকে হস্তান্তর করিয়া দিয়া নিজেদের হাতে সিলিং-এর অনতিরিক্ত জমি রাখিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। সিলিং ধার্য হইবে এই আশংকায় জমির বড় বড় মালিকেরা ইতিমধ্যে ঐভাবে বহু জমি হস্তান্তর করিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। অতএব কম করিয়া সিলিং ধার্য করিলেও ভূমিহীনের জন্য বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমে প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি দেওয়া হউক, অতঃপর উদ্বৃত্ত জমি লইয়া যাঁহারা সিলিং ধার্য করিতে চাহেন তাঁহারা তাহা পরে করিতে পারিবেন। তাই বিনোবাজী সিলিং ধার্য করিবার নিতান্ত বিরোধী। তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, "সিলিং-এর কথা বিপজ্জনক। এই কথা আমাদের উঠানো ঠিক হইবে না। আজ ঐ কথা সকলে বলিতেছে। আমি বলিয়াছি, আমি সিলিং চাই না—আমি চাই 'রুফিং' ( Roofirg )। সকলে এই সিদ্ধান্ত

মানিয়া লউক যে, প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি দিতে হইবে এবং তাহাতে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা লইয়া যাহা হউক করা যাইতে পারে। কোন কোন লোক বলেন—আপনার কথামত 'রুফিং' করিলে এত নীচু হইবে যে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি বলিয়াছি—তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমার দিল্লীর 'সিলিং'-এর প্রয়োজন হইবে না—গ্রামের 'সিলিং' চাই। আমি রাঁচীতে দেখিয়াছি যে, ৩০ একরের 'সিলিং' হইলেও ভূমিহীনেরা কোন জমি পাইবে না। জমিওয়ালা লোকেরা নিজেদের পরিবারের লোক ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ঐ জমি বণ্টন করিয়া লইবে। তেলেঙ্গনাতেও সিলিং-এর কথা চলিয়াছিল। সেখানে জমির মালিকেরা ঐরূপই করিয়াছিল। সেখানে দুইশত একরের সিলিং করিবার কথা হইয়াছিল। যদি ৩০ একরের মত ছোট সিলিং ধার্য করা হয় তবে অনেক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বিনা ক্ষতিপূরণে আজ কোন জমি কাড়িয়া লওয়া চলে না। আর বড় সিলিং রাখিলে তাহাতে কোন জমিই পাওয়া যাইবে না। এইজন্য আমরা চাহিতেছি যে, গ্রামের জমি গ্রামের সব লোকেরই হউক। সব চাইতে বেশী তিনগুণ পর্যন্ত জমি রাখিতে পারা যাইবে এরূপ কথাও হইয়াছে। কিন্তু যদি সকলেই পুরা খাইতে না পায় তবে কাহাকেও তিনগুণ করিয়া খাইবার অধিকার কেন দেওয়া হইবে? কোন ব্যক্তি অন্য কোন লোকের চাইতে তিনগুণ জমি চাষ করিতে পারে না। তবে তিনগুণ জমি রাখিবার অধিকার কেমন করিয়া তাহার হইবে? অতএব এই সমস্ত আলোচনায় কোন সার পদার্থ নাই। আমাদিগকে বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে ভাবিতে হইবে। আমরা চাই যে, গ্রামের জমি গ্রামেরই হইবে। সরকার আইনের বলে ইহা করিতে পারিবেন কি? সিলিং ধার্য করিলে কি কাজ হইবে? আজ বড় বড় লুণ্ঠনকারী রহিয়াছে। উহার স্থলে ছোট ছোট লুণ্ঠনকারীর সৃষ্টি হইবে। তাহাতে লুণ্ঠনকারীদের দল বৃদ্ধি হইবে মাত্র।"

ঐ সম্পর্কে অন্য এক স্থানে তিনি ঐ কথাই বলিয়াছেন। "ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য সিলিং-এর কথা উঠিতেছে। কিন্তু সিলিং-এর দ্বারা কাজ হইবে না, ফ্লোরিং-এর প্রয়োজন। যদি আইন করিতে হয় তবে

এমন আইন করা দরকার যাহাতে প্রত্যেক কৃষক কমপক্ষে ৫ একর করিয়া ভূমি পায়।”

পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে অনেকে এই কথা বলিয়া থাকেন যে, পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা বেশী ও জমি কম। এখানে অত্যন্ত ঘন বসতি—প্রতি বর্গ মাইলে ৭৯৯ জনের বসতি। এখানে ভূমির পুনর্বণ্টন করিলেও সকল কৃষিজীবী লোককে জমি দেওয়া সম্ভব হইবে না। দেখা যাউক এই আপত্তি কতদূর সত্য। পশ্চিম বাংলার চাষের জমির পরিমাণ ১ কোটী ২৮ লক্ষ একর (১,২৮,৬২,৮০০ একর—১৯৫১ সাল)। ৫ জন লোকের পরিবারকে যদি ৫ একর করিয়া জমি দেওয়া যায় অর্থাৎ মাথাপিছু ১ একর করিয়া জমি দেওয়া যায় তাহা হইলে চাষের জমি যাহা আছে তাহাতে ১ কোটী ২৮ লক্ষ লোকের ব্যবস্থা হইতে পারে। ১৯৫১ সালের আদম-সুমারী অনুসারে পশ্চিম বাংলার কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ (১,৪০,৪৬,০৪০)*। এই সংখ্যার মধ্যে ভূমিস্বত্বভোগী অ-কৃষিজীবী জমিদারদের সংখ্যা ধরা হয় নাই সুতরাং ১ কোটি ২৮ লক্ষ বাদে বাকি ১২ লক্ষ লোকের জন্য বর্তমানে যে চাষের জমি আছে তাহা হইতে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। কিন্তু উক্ত চাষের জমি ছাড়া পশ্চিম বাংলায় (১৯৫১ সালের হিসাবানুসারে) ১৮ লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য অথচ অকর্ষিত জমি আছে। উহার মধ্যে অন্যূন ১২ লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য পতিত (cultivable waste) ভূমি আছে, তাহা মেরামত করিয়া লইলে চাষ করা যাইতে পারে। উহার দ্বারা বাকি ১২ লক্ষ লোকের সংস্থান হইতে পারে। এখন প্রশ্ন এই যে, অতঃপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কি হইবে? ইহার উপরে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যদি তখনও দেশে এমন অপব্যবস্থা চলিতে থাকে যাহাতে কৃষিজীবীর সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তবে পরিবার প্রতি ৫ একর করিয়া না দিয়া কিছু কম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অথবা কৃষি-

* (ক) ভূমিস্বত্বভোগী চাষী ও তাহাদের পোষ্যবর্গ—পুরুষ ৪০৬৬৮৯৮ নারী—৩৯৫৬৮৫৯; (খ) ভূমিস্বত্বহীন চাষী ও তাহাদের পোষ্যবর্গ—পুরুষ ১৫২১৫৩২, নারী—১৪৫৮৮৭০ এবং (গ) কৃষি-শ্রমিক ও তাহাদের পোষ্য-বর্গ—পুরুষ ১৬০৫৬৮০, নারী—১৪৩৬২০১। মোটসংখ্যা—১৪০৪৬০৪০।

জীবীদের মধ্যে যাহারা নিজেরা জমি চাষ করে না তাহাদের জমি কমাইয়া দিয়া বা প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে ক্রমশঃ বাদ দিয়া যেসব কৃষিজীবী নিজেরাই জমি চাষ করে মাত্র তাহাদিগকেই জমি দেওয়া যাইতে পারিবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পশ্চিম বাংলার ভূমিহীনদিগকে ভূমি দিতে হইলে অর্থাৎ সঙ্গতভাবে ভূমি বন্টন করিতে হইলে এখানে কোনরূপ সিলিং ধার্য করা চলিবে না। পশ্চিম বাংলার ভূমি সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টায় ইহা এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কৃষককে ভূমিহীন রাখিয়া কোন পরিবারকে ৫ একরের অতিরিক্ত ভূমি রাখিতে দেওয়া হইবে কি না পশ্চিম বাংলাকে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে হইবে।

**জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদন**

ভারতে জনসংখ্যা খুবই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার ফলে খাদ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান সুদূর পরাহত হইতে পারে। এই আশংকায় জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন ও অনেক সুধী ব্যক্তি Family Planning অর্থাৎ জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই বিষয়টি গভীরভাবে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বর্তমান লোক গণনার বিবরণে প্রকাশ যে, ভারতে প্রতি হাজার ব্যক্তির (পুরুষ ও স্ত্রীলোক) বৎসরে ৪০টি করিয়া সন্তান জন্মে। এই জন্মের হার জগতের মধ্যে সব চাইতে বেশী। এই দেশে মৃত্যু সংখ্যার হারও সব চাইতে বেশী অর্থাৎ প্রতি হাজার ব্যক্তির মধ্যে বৎসরে ২৭ জনের মৃত্যু হয়। এই অত্যধিক জন্ম ও মৃত্যুর হারের প্রকৃত কারণ কি? জৈব বিজ্ঞানের নিয়মে সাধারণতঃ যে অঞ্চল ও যে দেশ বা যে শ্রেণী যত দরিদ্র তাহার জন্ম সংখ্যার হার তত বেশী। দারিদ্র্যজনিত পুষ্টির অভাবই অধিক জন্ম হারের কারণ বলিয়া কথিত হয়। ইহা যে সাধারণভাবে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দারিদ্র্যও যে অধিক মৃত্যু হারের কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের গুরুতর নৈতিক অপকারিতার কথা না ধরিয়াও যদি বিচার করা যায় তথাপি বুঝা যাইবে যে, বর্তমান অবস্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপদেশে বিশেষ কিছু ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেসব দরিদ্রশ্রেণীর জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের বেশী

প্রয়োজন মনে করা হয় তাঁহাদের কানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বাণী পেঁাছিবে না এবং পেঁাছিলেও তাহা তাঁহাদের বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কারের অবস্থায় কখন পালিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। অন্য দিকে যাঁহাদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নাই তাঁহারা এইরূপ আন্দোলনের ফলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া নৈতিক অবনতির গভীর গহ্বরে নামিয়া যাইতেছেন। সংযম পালন করিয়া যাঁহারা সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন বিবাহিত নেতৃস্থানীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া যদি সংযম অভ্যাস করার জন্য উপদেশ দেন তবেই তাহার সুফল হইতে পারে। একমাত্র সংযত জীবন দেখিয়া অন্যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। জন্ম হার হ্রাস করিবার সব চাইতে কার্যকরী ব্যবস্থা হইতেছে অবিলম্বে দারিদ্র্য দূর করিবার ব্যবস্থা করা। ভূমির সম্যক বণ্টন ও পল্লী-শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। বর্তমান অবস্থায় মাত্র এই দুই উপায় একসঙ্গেই অবলম্বন করিলে তবে ভারতের দারিদ্র্য ঘুচিবে। তাই এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য আরও নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

সত্যই কি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কখন পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব হইবার আশঙ্কা আছে? এরূপ আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না। কথায় বলে—যাঁর সৃষ্টি তিনিই খাওয়াইবার ভার নেন। ইহা অন্ধসংস্কার-জনিত ধারণা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা সত্য বলিয়া দেখা গিয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ দিকে পশ্চিমে বিজ্ঞানের বিকাশ হওয়ায় তথায় কৃত্রিম নীল উৎপাদিত হইতে থাকায় ভারতের বিশাল ক্ষেত্রের নীল চাষ বন্ধ হইয়া গিয়া অধিক খাদ্যশস্যাদি উৎপাদনের সুবিধা হইল। কে জানে—জনসংখ্যার চাপ যখন আবার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে তখন পাট উৎপাদনের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে কি না। তখন ভারতের কোটী কোটী একর ভূমি খাদ্য উৎপাদনের জন্য মুক্ত হইবে। বর্তমানে কোন কোন দেশে কাগজ ও কাপড়ের থলিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে। উপরন্তু কৃত্রিম (synthetic) থলিয়াও তৈয়ারী করা হইতেছে এবং সেই সব স্থানের থলিয়ার প্রয়োজনও তাহার দ্বারা মিটান হইতেছে। ইহা

কি উপরোক্ত সম্ভাবনারই সূচনা দান করিতেছে না? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল ক্ষেত্রে রবার চাষের সম্বন্ধেও ঐরূপ ভাবা যাইতে পারে। এক সময় আসিতে পারে যখন রবার চাষের কোন প্রয়োজন হইবে না। অতএব খাদ্যের অভাবের আশঙ্কায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নাই।

বিনোবাজী জনসংখ্যার চাপের প্রতিকারের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবে বিচলিত হইয়া এই সারগর্ভ কথাগুলি উচ্চারণ করেন—"আপনারা family planning বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করিয়াছেন অর্থাৎ সন্তান জন্ম দেওয়া কম কর—এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু একথা আমাকে বলিবার আপনাদের কি অধিকার আছে? আপনারা কি আমার ভৃত্য না প্রভু? জাপান বা ইংলণ্ডে জমির উপর যে চাপ রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম চাপ ভারতের জমির উপর। কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা কি আপনারা কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সিংহের খুব কম বাচ্চা হয় আর ছাগের বেশী বাচ্চা হয়।

"ইহার প্রকৃত প্রতিকার জন্ম নিয়ন্ত্রণে নহে। জীবনকে ঠিক পথে পরিচালনা করাই ইহার প্রতিকারের উৎকৃষ্ট পন্থা।"

**অবস্থা অসহনীয়**

বিহারের ভূমিসমস্যার সমাধান হইলেও অন্যান্য প্রদেশের কাজ তো বাকি থাকিবে। তখন উহার জন্য কি করা হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"বিহারের সমস্যার সমাধান হইবার পরও অন্য প্রদেশগুলির লোকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে এরূপ চিন্তা করা ভুল। হয় সেখানকার সরকার আইন প্রণয়ন করিবে—না হয় কর্মীগণ কাজে লাগিয়া যাইবেন এবং না হয় সেখানকার লোকে বলপ্রয়োগ করিবে—সেখানে রক্ত-রঞ্জিত রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হইবে। যদি এরূপ বিপ্লবও হয় তবে তাহাতে আমি বরং খুশী হইব; কিন্তু বর্তমান অবস্থা অসহনীয়। এইজন্য যদি সেখানে বিপ্লব আসে তবে তাহাকে ঠেকাইবার আমি কে? আজকার যে পরিস্থিতি তাহা আমি কোন অবস্থায় সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।" কিন্তু

বিনোবাজী বিশ্বাস করেন যে, বিহারের সমস্যার সমাধান হইলে তখন অন্যান্য প্রদেশে ঐরূপ কোন হিংস্র বিপ্লব সংঘটিত হইবার অবকাশ আসিবে না। তাই তিনি ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"আজ পৃথিবীর অবস্থা এমন যে, পৃথিবীর কোন এক কোণে কিছু ঘটিলে পৃথিবীর সর্বত্র ঐ কথা ছড়াইয়া পড়ে। যখনই কাশ্মীরের রাজা রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন তখনই অন্য সব রাজার গদি টলিতে লাগিল। যখনই অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইবে তখনই অন্য রাজ্যগুলির উপর উহার প্রভাব পড়িবে। প্রাচীনকালে এরূপ অবস্থা হইত না। এখন তো এক স্থানের প্রভাব অন্য স্থানে না হইয়া যায় না। তাই যদি আমাদের এখানকার সৈন্যদল সফলতাপ্রাপ্ত হয় তবে ঐ সেনাই বাহিরে যাইবে। আমাদের ঐ সেনা এমনভাবে তৈয়ারী হইবে যে, উহারা কৃতকার্য হইবেই হইবে।" এইজন্য তিনি অন্যান্য প্রদেশের কর্মিগণকে উপদেশ দেন যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ প্রদেশের সর্বত্র অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেন। উপরন্তু প্রদেশের মধ্যে এমন এক বিশিষ্ট ছোট স্থান বাছিয়া লন যেখানে কাজ অগ্রসর হইলে সারা প্রদেশে উহার প্রভাব পড়িবে। এরূপ স্থানকে তিনি 'স্ট্রাটেজিক পয়েন্ট' (strategic point) বলিয়া থাকেন। এরূপ একস্থানে সকলে মিলিয়া আত্যন্তিক ও কেন্দ্রীভূতভাবে কাজ করিয়া সফলতা লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার প্রতিক্রিয়ায় সারা প্রদেশ ক্রমশঃ সাড়া দিতে থাকিবে। এই দৃষ্টি হইতে বিহারে গয়া জেলা বাছিয়া লইয়া সেখানে কেন্দ্রীভূত ও আত্যন্তিকভাবে কাজ করা হয় এবং তাহার ফল সারা প্রদেশে আশাতীতভাবে পাওয়া যায়।

**সনাতন ধর্ম**

ভূমিসমস্যার সমাধান হইলেই আমাদের কাজ শেষ হইবে না। অর্থাৎ আমরা যে ক্রান্তি চাহিতেছি তাহা মাত্র ভূমি-ক্রান্তি নহে। উহা বিচার-ক্রান্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। বিনোবাজী এক ধর্ম-বিচার প্রবর্তন করিতে চাহিতেছেন। সে ধর্ম-বিচার সনাতন; কিন্তু তাহা আজকার হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি ধর্মের অর্থে 'ধর্ম' নহে। এই ধর্ম-বিচার প্রবর্তনকে তিনি 'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন' আখ্যা দিয়াছেন। ইহা কি, তাহা আমরা পূর্বে

বুঝিয়াছি। তবে এই ধর্ম-বিচারকে কি অর্থে 'সনাতন' বলা হইয়াছে তাহা একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝা প্রয়োজন। কারণ তাহাতে এই ধর্ম-বিচার আজকার সমাজে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা সুস্পষ্ট হইবে। এই সনাতন ধর্মের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"'সনাতন' শব্দের ব্যবহার বহু হইয়া থাকে। কিন্তু উহার অর্থের বোধ সকলের নাই। ধর্ম দুই প্রকারের হয়। এক তো যাহার পরিবর্তন হয় না। যেমন সত্য-পালন। প্রাচীনকালে উহা ধর্মস্বরূপ ছিল এবং আজও আছে। ভারতভূমিতে উহা ধর্মস্বরূপ এবং অন্য দেশেও তাহাই। এজন্য উহাতে দেশ-কালের ভেদ লাগে নাই। অতএব উহা নিত্য ও সনাতন ধর্ম। এইরূপে প্রেম, দয়া, বাৎসল্য—এই সব সনাতন ধর্ম। উহার আচরণে ঐ সনাতন ধর্ম পালনের জন্য পুরাকালে যে আচার-নিষ্ঠা ছিল, তাহা দেশ-কাল ও পাত্র অনুসারে বরাবর বদলাইয়া আসিতেছে। সকলের জন্য ভক্তি সনাতন ধর্ম এবং সকলের জন্য উহা সমান—যদিও উপাসনার পদ্ধতি পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। অতএব যে সনাতন ধর্ম ধর্মের সার ও আত্মাস্বরূপ সেই সনাতন ধর্মকে ধরিয়া থাকা ও নিয়ত উহার ধ্যান করা আমাদের কর্তব্য। ধর্মের পরিবর্তনশীল অঙ্গের দিকে আমি ধ্যান দিতেছি না। কিন্তু ধর্মের যে সার তাহা আমি লোককে দিতেছি। উহা সনাতন। উহা পরিবর্তনশীল নহে এবং উহা তিন কাল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সর্বত্র সমতা ও একতা স্থাপন করা চাই, ইহা সত্ত্বেও মানুষের বাহ্য জীবনে বৈষম্য ও বিভিন্নতা থাকিবে। কিন্তু সমতা স্থাপন করা আমাদের ধ্যেয় থাকিবে। সন্তানগণ যখন ছোট থাকে তখন তাহাদিগকে অনুশাসনে রাখা মাতাপিতার কর্তব্য। কিন্তু যখন উহারা যুবক হইয়া উঠে তখন উহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া ও উপদেশ দেওয়া মাতাপিতার কর্তব্য। যখন মাতা-পিতা বৃদ্ধ হন—তখন সন্তানদেরই অনুশাসনে থাকা তাঁহাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে, এইভাবে ধর্ম বদলাইতে থাকে। কিন্তু সন্তানদের স্নেহ করা ও উহাদের সেবা করা মাতাপিতার তিন কালের সমান ধর্ম। অতএব সন্তানকে স্নেহ করা এক সনাতন ধর্ম। ঐরূপে সমাজের অবস্থার পরিবর্তন হইলে উহার ধর্মেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। যখন সমাজ বাল্যাবস্থায় ছিল

তখন রাজার আবশ্যকতা ছিল। ঐ সময়ে প্রজাগণকে অনুশাসনে রাখা রাজাদের ধর্ম ছিল এবং রাজার আজ্ঞা পালন করা প্রজার ধর্ম ছিল। কিন্তু এখন সমাজ আর বাল্যাবস্থায় নাই। এইজন্য এখন রাজাদের কাজ শেষ হইয়াছে এবং লোক-প্রতিনিধিদের হস্তে রাজ্য-পরিচালনার ক্ষমতা আসিয়াছে। এখন 'রাজা কালস্য কারণম্' নহে, এখন তো 'প্রজা কালস্য কারণম্' হইয়াছে। পুরাকালে সম্রাট এবং বিদ্বানের যে জ্ঞান ছিল না সেই জ্ঞান এখন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সাধারণ লোকের হইয়াছে। আকবর বাদশাহ জানিতেনই না যে আমেরিকা কি জিনিস বা মস্কো কোথায়? কিন্তু আজ তো স্কুলের ছেলেরা ইহা জানে। কিন্তু সমগ্র সমাজকে একরূপ (এক রস) করিয়া তোলা ও সমাজে অধিক সমানতা আনয়ন করা—ইহা যে মূল তত্ত্ব তাহা দুই কালেই সমান রহিয়াছে। সমানতার জন্য প্রাচীনকালে ভূমি বণ্টনের প্রয়োজন ছিল না; কারণ ঐ সময়ে বহু জমি পতিত থাকিত এবং জনসংখ্যা কম ছিল। কিন্তু এখন ভূমি বণ্টনের প্রয়োজন হইয়াছে।"

**'যুগধর্ম' ও 'স্বধর্ম'**

ভূদানযজ্ঞ 'যুগধর্ম'। যুগধর্মের অর্থ এবং কেন যে ভূদানযজ্ঞকে যুগধর্ম বলিয়া মান্য করা উচিত তাহা ভালভাবে বুঝা আবশ্যক। ইহা বুঝিতে পারিলে লোকে ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রেরণা লাভ করিবে। দেশে কোন এক সময়ে সমাজের তৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী এমন এক কার্যের জরুরী প্রয়োজন হয় যাহা সাধিত হইলে দেশের অন্য বহুতর সমস্যা আপনা-আপনি মিটিয়া যায়, দেশের সর্ববিধ কল্যাণ ও অগ্রগতির পথ সুগম হয়। আর বিফল হইলে দেশের অন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রচেষ্টা বৃথা ও পন্ড হইয়া যায় এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান অসম্ভব হইয়া পড়ে। "এক সাধে সব সাধ।" এরূপ মহান কর্তব্য কর্মকে যুগধর্ম বলা হয়। ইতি-পূর্বে যেসব আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অবিলম্বে শান্তির পথে ভারতের ভূমিসমস্যার সমাধান না হইলে দেশে 'জ্বালামুখী' প্রজ্জ্বলিত হইবে ও দেশের অন্য কোন বৃহৎ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হইবে না। দেশে সরকারী বা বেসরকারীভাবে

যেসব কল্যাণ প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা সবই বিগড়াইয়া যাইবে। অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা মহাত্মা গান্ধীর ব্যবস্থিত গঠনকর্মের অন্যতম। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন দিকের অবস্থার পরিণতি এমন চরমে উঠিয়াছে যে, উহাকে এখন আর শুধু অন্যতম গঠনকর্ম হিসাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না, পরন্তু অগ্রাধিকার দান করিয়া ও উহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিয়া সমস্ত শক্তি উহাতে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং সর্বপ্রথমে ও অবিলম্বে উহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। নচেৎ অন্য যাহা কিছু গঠনকর্ম প্রচেষ্টা করা হইতেছে তাহা সবই নষ্ট হইয়া যাইবে; সবই বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং অন্য কোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব হইবে না। যদি শান্তির পথে ভূমিসমস্যার সমাধান হয় ও সামাজিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে পত্তন হয় তবে অন্য সমস্ত রচনাত্মক প্রচেষ্টার সাফল্যের পথও উন্মুক্ত হইবে। এইজন্য ভূদানযজ্ঞ এই যুগের 'যুগধর্ম'। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আপনাদের সকলকে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, ভূদানযজ্ঞের কাজ একটি ভাল কাজ—কেবল ইহা মনে করিয়া আপনারা যেন এই কাজ না করেন। পরন্তু ইহা যুগধর্ম, ইহা এমন এক কাজ যে ইহা সফল হইলে অন্য সবই সফল হইবে এবং ইহা বিফল হইলে অন্য সবই বিগড়াইয়া যাইবে—এরূপ অনন্য ও অব্যভিচারী ভাব আপনাদের মনে যদি উদয় হয় তবেই প্রত্যেকের সর্বোত্তম শক্তি এই কাজে নিয়োগ করিবার প্রশ্ন আসে।"

### স্বধর্ম এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম

ভূদানযজ্ঞের সংকল্প সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে গভীর, জরুরী ও একাগ্রভাবে এই কাজে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। ভূদানযজ্ঞের কর্মিগণ এই কাজকে 'স্বধর্ম' গণ্য করিয়া ইহাতে অনন্যভাবে আত্মনিয়োগ করুন—ইহা বিনোবাজী চাহেন। ভূদানযজ্ঞে যাঁহারা ভূমিদান দিবেন তাঁহাদের সকলকে ভূদানযজ্ঞের সেবক কর্মীস্বরূপ গণ্য করা হইবে—দরিদ্র কৃষক-দাতাগণকে তো ভূদানযজ্ঞের সৈনিক বলিয়া মানা হয়। তাই 'স্বধর্ম' কি তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক—যাহাতে প্রত্যেকে নিজের অন্তর্দৃষ্টিতে উহা তাঁহার স্বধর্ম কি না বুঝিয়া লইতে পারেন। এই প্রসঙ্গে 'নিত্যধর্ম'

ও 'নৈমিত্তিক ধর্মের' পার্থক্যও হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। 'স্বধর্ম', 'নিত্য-ধর্ম' ও 'নৈমিত্তিক ধর্মের' ব্যাখ্যা করিয়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"কখন কখন আমাদিগকে ঘর-সংসারের চিন্তায় থাকিতে হয় এবং সেইজন্য আমরা বেশী সময় বাঁচাইতে পারি না। তাহাই আমাদের নিজেদের সামর্থ্যের সীমা মনে করিয়া সমাধান মানিয়া লইতে হইবে। ঘরের কাজ ছাড়া কোন সার্বজনিক কাজও আমাদের করিতে হয়। তাহার জন্য যদি আমরা অন্য নূতন কাজ করিতে না পারি তবে পুরাতন কাজের সহিত নূতন কাজের ওজন করিয়া দেখা কর্তব্য। কিন্তু নূতন কাজের ওজন যদি অপেক্ষাকৃত বেশী হয় তবে পুরাতন কাজ যে পরিত্যাগ করিতে হইবে এমন কথা নয়। ধর্মের ব্যাপারে যে ধর্ম শ্রেষ্ঠ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহা লঘিষ্ঠ তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে—এমন কথাও নহে। পরন্তু ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যে কাজ আমাদের হাতে রহিয়াছে তাহা বড় হউক আর ছোট হউক তাহা আমাদের কাছে 'স্বধর্ম' কি না। যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমরা যে কাজ করিতেছি তাহা আমাদের স্বধর্ম তবে আমাদের সেই কাজ করিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহার স্বধর্ম পৃথক তাঁহার আমাদের কাজে যোগ দেওয়া কর্তব্য নয়। তাহাতে তাঁহার দুঃখিত হওয়াও উচিত নয়। তিনি আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতি রাখিতেছেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট, ইহা মানিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু যদি আত্মনিরীক্ষণ দ্বারা ইহা স্থির হয় যে, আমাদের বুদ্ধি এই নূতন কাজকেই বুনিয়াদী কাজ বলিয়া গণ্য করিতেছে, তাহা হইলে অন্য কোন কাজের বোঝা আমাদের মাথার উপর থাকিলে তাহা বিবেচনাপূর্বক সরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং এই নূতন কাজে লাফাইয়া পড়িতে হইবে। সেক্ষেত্রে ইহা চিন্তা করা ঠিক হইবে না যে, আমাদের হাতে যে কাজ ছিল তাহার কি হইবে? যে অবস্থায় মনে ইহা নিশ্চয় হইয়া যায় যে, এই কাজই বুনিয়াদী কাজ সেই সময়ের সেই কাজই 'যুগধর্ম' হইয়া পড়ে। 'যুগধর্ম' হইতেছে 'নৈমিত্তিক'। উহা চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চলে না। কিন্তু যে সময়ের জন্য উহা হয় তখন 'নিত্যধর্ম' উহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। ওই কাজের ওজন সব চাইতে বেশী হয়। আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি। উহা নিত্যকর্ম।

কিন্তু সেই সময় যদি কোথাও আগুন লাগিয়া যায় তখন আমাদের প্রার্থনা অসমাপ্ত রাখিয়া আগুন নিভাইবার জন্য যাইতে হয়। কেননা নৈমিত্তিক ধর্ম বলবান। যে নৈমিত্তিক ধর্মের বিষয়ে আমরা নিঃশংসয় হইয়া গিয়াছি উহার জন্য যদি আমাদিগকে নিত্যধর্ম ত্যাগ করিতে হয় তবে তাহা করিতে হইবে।” তিনি পরে অন্য এক স্থানে এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—“রুশ ও চীনে যে কার্য হিংসার দ্বারা সাধিত হইয়াছে আমি তাহা এখানে অহিংসার পথে করিতেছি। শুধু তাহাই নহে, এই কার্যের দ্বারা গান্ধী-বিচার প্রসার লাভ করিতেছে। ইহা অহিংসার দ্বাবা সমাজের গঠন বদলাইবার মহান কার্য। ইহার ন্যায় আজ আর অন্য কোন কার্য নাই। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্য প্রভৃতি অন্য যেসব কার্য আছে তাহা নিত্যকার কার্য, কিন্তু এই কার্য যুগধর্মের মহান্ নৈমিত্তিক কার্য। মনে করুন আমি সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছি, এমন সময়ে গ্রামের মধ্যে কোথায়ও আগুন লাগিয়াছে। আমি প্রার্থনা বন্ধ করিয়া সেখানে তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া যাইব। ভজনের মহত্ব কম নহে। কিন্তু উহা প্রতিদিনের কার্য এবং অগ্নি নির্বাপণের ঐ কার্য নৈমিত্তিক কার্য। কারণ উহা বিশেষ পরিস্থিতি হইতে উদ্ভব হইয়াছে। এরূপ অন্য বড় বড় কাজ বহু আছে। কিন্তু তুলনা করিলে এই কাজের মহত্ব সব চাইতে বেশী। যদি ইহা বুঝিয়া সকলে এই কার্যে লাগিয়া যায় তবে সারা পৃথিবীতে আমরা ক্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারিব। আমি গণিতজ্ঞ। প্রত্যেক শব্দ ওজন করিয়া আমি উচ্চারণ করিতেছি।”

### পূর্বজন্মের সহিত দারিদ্র্যের সম্পর্ক

কেহ কেহ বলেন যে, মানুষ তাহার পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলে ধনী বা দরিদ্র হইয়া থাকে। অতএব দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করা তথা ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়াইবার চেষ্টা করা ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধতা করারই সামিল। বিকৃত ধর্মবোধ হইতে এরূপ কথা বলা হইয়া থাকে। ধনী তাঁহার ধন সংরক্ষণের জন্য যেসব মিথ্যা যুক্তি-তর্ক ও অপকৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন, ইহা তন্মধ্যে অন্যতম। সমাজের অর্থনৈতিক অপব্যবস্থায় দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে ও দারিদ্র্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে,

ইহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব পূর্বজন্মকৃত কোন কুকার্যের জন্য মানুষ দরিদ্র হইয়াছে, ইহা কল্পনা করা অন্যায় ও বিবেকবুদ্ধিবিরোধী। শাস্ত্র বলে—যে পাপ কর্ম করে তাহার আসুর যোনিতে জন্ম হয়। আসুর যোনির অর্থ—মনুষ্যেতর জীব-যোনি অর্থাৎ ব্যাঘ্র-সর্পাদি-যোনি। "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥" অর্থাৎ নীচ, দ্বেষপরায়ণ, ক্রূর, অমঙ্গলকারী নরাধমদিগকে এই সংসারে অত্যন্ত আসুরী যোনিতে বার বার নিক্ষেপ করিয়া থাকি। শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যে সৎ লোক আছে—অসৎ লোকও আছে। এরূপ এক আপত্তির উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"খারাপ কাজের ফল দারিদ্র্য ও ভাল কাজের ফল ধনিকত্ব এরূপ কোন কথাই নাই। শঙ্করাচার্যের গরীবকুলে জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে, তিনি গত জন্মে পাপ করিয়াছিলেন? পাপ ও পুণ্যের পরিণাম দারিদ্র্য ও আমীরী নহে। পূর্বজন্মের পাপের ফল কুবুদ্ধি এবং পুণ্যের ফল সুবুদ্ধি। শাস্ত্র বলে যে, যিনি ভাল কাজ করেন তিনি পরজন্মে পবিত্রকুলে জন্মলাভ করেন এবং যিনি বহু পুণ্যবান তাঁহার তো যোগীদের কুলে জন্ম হয়। যোগীরা তো গরীব হইয়া থাকেন। অতএব আমরা পূর্বজন্মে পাপ করিয়াছি না পুণ্য করিয়াছি তাহা আমাদের কুবুদ্ধি বা সুবুদ্ধি হইতে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের বহু ভ্রান্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। একজন সন্ন্যাসী তো আমাকে এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, রোগীর সেবা করা ভুল—কারণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তো নিজের প্রারব্ধ ভোগ করিতেছে এবং উহার সেবা করিয়া আমরা উহার প্রারব্ধের ক্ষতি সাধন করিতেছি। ইহা শুনিয়া আমি তো আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। আমি এই জবাব দিলাম যে, সকলকে তো নিজ নিজ প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়। আমার সেবার দ্বারা তাহার প্রারব্ধের উপর কোন প্রভাব পড়িবে না। প্রারব্ধ এত শক্তিশালী যে, উহা নিজ বলে চলিতে থাকে। কিন্তু আমার ধর্ম তো সেবা করা। এইজন্য আমি তো সেবা করিতেই থাকিব। ভগবান যদি আমাকে গরীব বা ধনবান করিয়াই থাকেন তবে তাহা আমাকে পরীক্ষা করিবারই জন্য। জীবন এক পরীক্ষা। এইজন্য পূর্বজন্মের কথা তুলিয়া

গরীবের সেবা না করা নিতান্ত ভুল।" কিছুদিন পূর্বে এক ধনবান ব্যক্তি আমার কাছে ঐরূপভাবে পূর্বজন্মের কথা উঠাইয়া ভূদানযজ্ঞে তাঁহার ভূমি-দান না দিবার কারণ দেখাইতেছিলেন। তাঁহাকে অন্যান্য কথা বুঝাইয়া বলিবার পর আমি তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম—ভাই, আজ যে অবস্থা দেখিতেছেন তাহাতে অধিকাংশই তো গরীব এবং ধনীর সংখ্যা কম। মনে করুন আপনি একজন সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি। আপনার মৃত্যু হইল। ধরিয়া লউন, মৃত্যু হইলেই তৎক্ষণাৎ জন্মিতে হইবে অথবা মৃত্যুর পর কোন পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া সেখানে সুখ-শান্তি ভোগ করিবার পর আপনার জন্মগ্রহণ করিবার মুহূর্ত উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময়ে ধনীর গৃহে খালি নাই। কোথাও ধনী মায়ের কোল খালি ( vacancy ) পাইলেন না। আপনি তো তৎক্ষণাৎ না জন্মিয়াই পারেন না। তখন বাধ্য হইয়া আপনাকে গরীব মায়ের কোলে জন্ম লইতে হইল ও দুঃখ-কষ্টে সারা জীবন যাপন করিতে হইল। আপনার ন্যায় এরূপ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোক যাঁহারা পূর্বজন্মে সৎ ছিলেন, তাঁহারা এইভাবে গরীবের ঘরে জন্মিতে বাধ্য হইয়া কতই না দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের জন্য আপনার অন্তর কাঁদিবে না কেন?

**কলিযুগে কি ইহা সম্ভব?**

• লোকে বলে—এখন কলিযুগ। এখন এসব কি হওয়া সম্ভব? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"কিন্তু যে শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ ভগবানের নিবাসের জন্য জমির প্রয়োজন হওয়ায় মোহর বিছাইয়া জমি লইতে হইয়াছিল, সেই শ্রাবস্তীপুরেই আমার মত অপদার্থ—ভগবান বুদ্ধের তুলনায় যাহার কোন অস্তিত্বই নাই—এই কলিযুগেই একশত একর ভূমি পাইয়াছি। তাহা হইলে বুঝুন, ইহা কলিযুগ অথবা সত্যযুগ?" এই প্রসঙ্গে অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—ত্রেতাযুগে রাবণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাপরযুগে দুঃশাসনের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু এই কলিযুগেই শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলেন—"যুগ আমাদের স্বরূপ দান করে না। আমরাই যুগের

স্বরূপদানকারী 'কাল-পুরুষ'। আমরা চেতন। এইজন্য এই সমগ্র জড়-সৃষ্টি আমাদেরই হাতে। আমরা মাটির যে আকার দিই না কেন, উহা তাহাতে কোন আপত্তি করে না। আজ এমন সমুন্নত সময় আসিয়াছে যে, আমরা ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা এই সময়ে নিজেদের চোখে দেখিতে পাইলাম। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কখনও স্বাধীনতা-যুদ্ধ অহিংস পন্থায় পরিচালিত হইয়াছে কি? অতএব ভ্রাতৃগণ, ভুল পথে চিন্তা করিবেন না। আজ আমাদের চোখের সামনে সত্যযুগ আসিতেছে। এবং অত্যন্ত তীব্র-বেগে উহা আসিতেছে। লোকে বলে, মহাযুদ্ধ আসিতেছে। আমি বলি—আসুক। যতবার মহাযুদ্ধ আসিবে ততবার পৃথিবী শিক্ষালাভ করিবে যে, মহাযুদ্ধের দ্বারা পৃথিবীর কোন সমস্যার সমাধান হয় না। আমি সকল মহাযুদ্ধকে অভ্যর্থনা করি। কেননা, উহার পরিণামস্বরূপ সারা দুনিয়াকে সিধা আমার নিকট আসিতে হইবে এবং আমার কাছে বলিতে হইবে যে, "আমরা হারিয়া গিয়াছি; আমাদিগকে অহিংসার রাস্তা দেখাইয়া দিন।" তিনি এই প্রসঙ্গে অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন—"দান দিতে স্বীকৃত হয় নাই এমন কোন লোকের সহিত আমার এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি ইহার অর্থ এই বুঝিয়াছি যে, সত্যযুগ আসিতেছে। পুরাণসমূহে চারি যুগের কথা আলোচনা করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক যুগের স্থিতিকালের সীমা নির্ধারিত আছে, ইহাও বলা হইয়াছে। পরন্তু উক্ত চারি যুগের অন্তর্বর্তী-কালেও অন্যান্য যুগ আসিয়া থাকে। যেমন দিনে আলো ও রাত্রিতে অন্ধকার হইয়া থাকে, যেমন দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতিনিয়ত বহিয়া থাকে, যেমন চন্দ্রের ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধিও হয় তেমনি এক এক যুগের মধ্যেও অন্যান্য যুগও যাওয়া-আসা করিয়া থাকে। এই সময়ে কলিযুগ চলে চলুক, কিন্তু এই কলিযুগের মধ্যেই সত্যযুগ আসিতে পারে। আর যদি এখন সত্যযুগ চলিতে থাকে তবে ইহার মধ্যে কলিযুগও আসিতে পারে। পুরাণে আমরা দেখিয়াছি—শ্রীরামের যুগে রাবণের ন্যায় রাক্ষস ছিল। আর এই কলিযুগেও অসংখ্য সৎ পুরুষের জন্ম হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যুগ তো মাত্র নামের জন্য। জ্যোতিষানুসারে উহা চলিয়া থাকে। কিন্তু ভাবানুসারে একই যুগের মধ্যে চারি যুগই আসিয়া যায় এবং মোটের উপর

সত্যযুগই সব চাইতে দীর্ঘ হইয়া থাকে। কলির অর্থ—এক। উহার দ্বিগুণ—দ্বাপর যুগ; উহার তিনগুণ ত্রেতাযুগ এবং উহার চারগুণ সত্যযুগ হইয়া থাকে। সংস্কৃতে কলির অর্থ—'এক', দ্বাপরের অর্থ—'দুই', ত্রেতার অর্থ—'তিন' এবং সত্য-এর অর্থ—'চার'। ইহার মানে এই যে, কলিযুগ অপেক্ষা সত্যযুগের শক্তি চারগুণ অধিক। মধ্যে মধ্যে কলির জোর চলিয়া থাকে। কিন্তু সত্য অধিক বলবান।"

**মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যার সমাধান**

বিনোবাজী যখন বিহারের মানভূম জেলায় ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একব্যক্তি তাঁহাকে বলেন যে, তিনি গরীবদের সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অবস্থাও খারাপ। সুতরাং তিনি যেন তাঁহাদের জন্য কিছু করেন। ঐ ব্যক্তি আরও বলেন যে, গরীবদের অবস্থা তো বরং কিছু ঠিক আছে; কারণ তাহারা হাতের কাজ ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিয়া থাকে এবং দরিদ্রের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মধ্যম শ্রেণীর লোকের অবস্থা খুব খারাপ। কারণ উহারা যে কিছু উৎপাদন করিবে এমন কোন উপায় তাহাদের হাতে নাই। অন্য দিকে ধনীর হাতে যেরূপ অর্থ আছে সেরূপ অর্থও তাহাদের নাই। এইজন্য তাহারা নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত। ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমরা ভূমিহীনকে তো ভূমি দিব। যদি মধ্যম শ্রেণীর মধ্য হইতে কেহ জমি চাহেন তবে আমরা তাঁহাকেও জমি দিব। কিন্তু তাহাতে এই মুস্কিল হইবে যে, তিনি নিজে ঐ জমি চাষ করিবেন না। আর যদি তিনি জমিতে নিজে পরিশ্রম না করেন তবে তাঁহাকে জমি দিয়া কোন লাভ নাই। আপনাদের মধ্যম শ্রেণীর লোকের যে এরূপ দুর্দশা তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা উৎপাদনের কোন কাজ জানেন না। ইহার প্রতিকারের উপায় এই যে, আজ যে শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে। মধ্যম শ্রেণীর লোকদের অনেকেই শিক্ষিত। কিন্তু যে বিদ্যালয়ে তাঁহারা পড়েন তাহাতে কোন হাতের কাজ বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয় না। অবস্থা এতদূর গড়াইয়াছে যে, কৃষকের

ছেলে স্কুলে পড়িয়া শিক্ষিত হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আর সে ক্ষেতের কাজ করিবে না। সে চাকুরী করিতে চাহিবে; কিন্তু চাকুরী তো বেশী নাই। আমি শুনিয়াছি যে, বাংলায় এ বৎসর এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক মেয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিতেছে। যখন মেয়েদের সংখ্যাই এত তখন পুরুষদের সংখ্যা তো আরও অনেক বেশী হইবে। এত সব বি. এ. লোককে আমরা কোথায় বপন করিব এবং তাহা হইতে কি বা ফসল পাওয়া যাইবে? উহার ফল এই দাঁড়ায় যে, উহারা সকলে বেকার হইয়া থাকে। উহাদের অভিমান বেশী। তাই তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের খরচ করিবার অভ্যাস হয়, কিন্তু উপার্জন কিছুই হয় না। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিদ্বান হয়, তবে দুই বিদ্বানের ঘরকন্না হয় এবং তাহাতে ঘর-সংসার নষ্ট হইয়া যায়। যদি দুইজনের একজন মূর্খ হয় তবে ঘরকন্না ভাল চলিতে থাকে। কিন্তু আজকাল তো দুইজনেই বি এ পাশ করিতে চাহে। ইহাই আপনাদের অবস্থা। মধ্যম শ্রেণীর দুরবস্থা দূর করিবার উপায় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইবে। এইজন্য গান্ধীজী এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, যে শিক্ষাই দেওয়া হউক না কেন উহাতে কোনও না কোন শিল্পের কাজ শিক্ষা দেওয়া চাই; উপরন্তু শিল্পের মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া চাই। এরূপ তো হওয়া চাই যে, অমুক বি এ পাশ করিয়াছে বটে কিন্তু বয়ন কাজ করিতেছে। অমুক এম এ কিন্তু সে ক্ষেতের কাজ করিতেছে। অমুক বি, এস-সি, কিন্তু সে নাপিতের কাজ করিতেছে। নিজের নিজের বিদ্যার প্রয়োগ সেই সেই কাজে তাহারা করিতেছে। এই প্রকারে বিদ্যা ও কাজ যদি যুক্ত করা হয় তবে শিক্ষিতদের বেকারত্ব থাকিবে না এবং ভারতের উন্নতি সাধিত হইবে। তখন যদি তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে ভূমি চাহেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ভূমি দিব। তাঁহারা ঐ জমিতে আবাদ করিবেন এবং সুখী হইবেন। আপনার যেরূপ অব্যবস্থা সেরূপ অব্যবস্থায়ও যদি মধ্যম শ্রেণীর কেহ জমি চাহেন এবং নিজে জমি চাষ করেন তবে আমরা তাঁহাকে জমি দিব।

"কাশীতে বৈদিক ব্রাহ্মণরা আমার নিকট জমি চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা নিজেরা চাষ করিবেন না অন্যের

দ্বারা চাষ করাইবেন। তাঁহারা বলিলেন—'আমরা নিজেরাই জমি চাষ করিব। চাষ করা বৈদিক ঋষিদের ধর্ম ছিল।' ইহা শুনিয়া আমার আনন্দ হইল, আমি বলিলাম—আপনাদিগকে ৫ একর করিয়া জমি দিব এবং আমি ঐ জমি দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্য হইতে এখনও বেশী লোক ক্ষেতের কাজ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন না। যাঁহারা অন্য জীবিকা করেন তাঁহাদিগকে জমি দেওয়া হইবে না। কিন্তু যাঁহার অন্য জীবিকা নাই এবং যিনি ক্ষেতের কাজ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকেই জমি দেওয়া হইবে—তিনি মধ্যম শ্রেণীরই লোক হউন বা অন্য শ্রেণীর হউন।"

**পুঁজিবাদ অবসানের উপায়**

পুঁজিবাদ দূর করিবার উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"প্রেমের পথে অথবা সংঘর্ষের পথে পুঁজিবাদের অবসান করা সম্ভব হইবে না। একমাত্র বিচার বিপ্লবের দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে। সংঘর্ষের দ্বারা অধিকতর সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে উভয় পক্ষই দুর্বল হইয়া পড়ে। আবার প্রেমও বস্তু-স্থিতির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। প্রেমে ভাবাবেগ বা উৎসাহের প্রাবল্য আসে বটে কিন্তু বিপ্লবের সঞ্চার ও বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা একমাত্র সদ্‌বিচার প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। আমরা ভূমি ভিক্ষা চাই না। পরন্তু দরিদ্রের অধিকারের ভিত্তিতে তাহাদের জন্য একাংশ ভূমি দাবি করিয়া থাকি। আমরা জনমানসে এই বিচার-বোধ আনিয়া দিতে চাই যে, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে জমিতে সকলের সমান অধিকার। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা এই বিচার-বোধের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরশীল। তথাপি যদি সংঘর্ষ বা বিরোধের প্রয়োজন হয় তবে আমরা তাহা এড়াইয়া যাইব না। সংঘর্ষ অগ্রগতির এক সাধন। কিন্তু তাহা বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারে না।"

**সর্বোদয় সাধনের ভিত্তি**

গ্রামকে ভিত্তি করিয়া ও সর্বোদয় সমাজের unit (একক) ধরিয়া সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। গ্রামকে কেন ভিত্তি ধরা

হইল অর্থাৎ বিনোবাজীর ভাষায় গ্রাম-রাজ প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা কেন করা হইল তাহা ভালভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। তাহা হইলে সর্বোদয়ের স্বরূপ এবং উহার সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইবে। কারণগুলি এই ঃ—

(১) সর্বোদয় সমাজব্যবস্থা সর্বাত্মক ব্যবস্থা। জীবন অবিভাজ্য। তাই জীবনের কোন দিক বাদ দিয়া সর্বোদয়ের কল্পনা করা সম্ভব নয়। নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই সাম্য প্রতিষ্ঠা সর্বোদয়ের কাম্য। এই সাম্যের উৎস হইতেছে আত্মার একত্ব—ইহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। পরিবারের মধ্যে সাম্যের এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মা ও সন্তানের, পিতা ও পুত্রের, স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে একাত্মবোধ বিদ্যমান। পরিবারস্থ যাহার যেরূপ যোগ্যতা থাকুক না কেন সকলের জীবনযাত্রার মান একরূপ। মানুষ পরিবারের মধ্যে একত্ব ও সাম্যের যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা সারা সমাজে প্রসারিত করা সর্বোদয়ের উদ্দেশ্য। পরিবারকে বাদ দিলে সমাজের মধ্যে গ্রামই মানুষের সব চাইতে নিকটে। তাই একাত্ম-বোধকে পরিবার হইতে প্রতিবেশীতে অর্থাৎ গ্রামে সম্প্রসারণ করা মানুষের পক্ষে সব চাইতে সহজ সাধ্য হইবে।

(২) শাসনমুক্ত সমাজব্যবস্থার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য শাসন-ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সবই প্রশ্ন গ্রামে উদ্ভব হইতে পারে এবং উদ্ভব হইয়া থাকে। উপরন্তু সামূহিক জীবনের ক্ষেত্রে গ্রামই সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থিত। তাই বিকেন্দ্রীকরণের অন্তিম সীমাস্বরূপ গ্রামকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৩) আর্থিক ব্যবস্থার যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। যে সব শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ করা যাইতে পারে তৎসমস্তকে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দৃষ্টিতে গৃহশিল্পস্বরূপে চালান সম্ভব নহে। বহু শিল্পকে গ্রাম্যশিল্পস্বরূপ চালাইতে হইবে। যেমন বস্ত্র-স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে সুতাকাটা ও বস্ত্র-বয়ন গৃহশিল্প করিতে হইবে। কিন্তু কাগজ প্রভৃতি প্রতি গৃহে উৎপাদন করা সুবিধাজনক হইবে না। ঐ সমস্ত শিল্প গ্রাম্যশিল্পস্বরূপ চলিবে। তাই আর্থিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য গ্রামকে অবলম্বন করা হইয়াছে।

(৪) কেন্দ্রীত ব্যবস্থায় কোন যোজনা ব্যর্থ হইলে তাহার দ্বারা সমগ্র সমাজ বা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই যদি যোজনার ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব সংকুচিত করা হয় তবে উহার ব্যর্থতায় সমাজ বা দেশের অন্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। সেই দৃষ্টিতে প্রতি গ্রাম নিজের যোজনা করিলে যে গ্রামের যোজনা অভিজ্ঞতায় ব্যর্থ বা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইবে মাত্র সেই গ্রামই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহাতে অন্য গ্রামের কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না; বরং উহা তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে।

(৫) প্রাচীনকালে গ্রামই আর্থিক ও শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল। গ্রাম-পঞ্চায়তের দ্বারা শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালিত হইত। জনমানসে তাহার স্মৃতি রহিয়াছে। সুতরাং ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে গ্রামকে গ্রহণ করা সমীচীন ও জনমনের অনুকূল হইয়াছে।

(৬) স্বাধীনতা লাভের পূর্বে নূতন সমাজ রচনার জন্য যে কর্ম-প্রচেষ্টা (গঠনমূলক কর্ম) চলিতেছিল তাহা স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে করা হইত। তখন স্বাধীনতা অর্জনই যুগের দাবি ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন তখন যুগ-ধর্ম ছিল। তাই নূতন সমাজ রচনার জন্য প্রচেষ্টা তাহার মাধ্যমে করা ব্যতীত অন্য কিছু অবলম্বন করিয়া করিলে কোন ফলোদয় হইত না। যুগ পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমান যুগের দাবি ভূমির সমবণ্টন তথা সাম্য প্রতিষ্ঠা। তাই ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার সকল কর্ম-প্রচেষ্টা অগ্রসর করিয়া দিবার সুযোগ আসিয়াছে। আমাদের লক্ষ্যের মুখে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা এই নূতন মাধ্যম পাইয়াছি।

## সর্বোদয় সূত্র

বুদ্ধগয়া সর্বোদয় সম্মেলনে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ জীবনদানের জন্য আহ্বান করায় বিনোবাজী তাহার উত্তরে নিজের জীবন সমর্পণ ঘোষণা করিয়া এক পত্র লেখেন। কিসের জন্য তিনি জীবন সমর্পণ করিতেছেন তাহা চারিটি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেন। তাহা হইতেছে—'ভূদানযজ্ঞমূলক, গ্রামোদ্যোগপ্রধান অহিংস ক্রান্তি'। ইহা হইতেছে—চারিটি শব্দের দ্বারা রচিত একটি মহান সূত্র। ইহাতে সূত্রাকারে সর্বোদয়ের অর্থাৎ নূতন

সমাজ রচনার ভিত্তি, স্বরূপ, সাধন ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। বিনোবাজী এই সূত্রের স্পষ্টীকরণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম শব্দ 'ভূদানযজ্ঞ' ইহার আধার, শেষ শব্দ 'ক্রান্তি' ইহার উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় শব্দ 'গ্রামোদ্যোগ-প্রধান' ইহার স্বরূপ ও তৃতীয় শব্দ 'অহিংসা' ইহার সাধনোপায়। 'ক্রান্তি' শব্দের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। অন্য তিনটি শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি তাহা অনুধাবন করা প্রয়োজন, তাহাতে সর্বোদয়ের ভিত্তি, স্বরূপ ও সাধনোপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে।

(ক) 'ভূদানযজ্ঞমূলক' ঃ—(১) ভূমি মৌলিক জিনিস। বায়ু, জল ও আলোকের ন্যায় ইহা ভগবানের দান। ইহা ধন উৎপাদনের মৌলিক সাধন। তাই ভূমির সুসম বণ্টনের আধারের উপর নূতন সমাজ রচনা করিতে হইবে। (২) আর্থিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সকলকে অল্পাধিক শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবনধারণের পক্ষে প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য ও বস্ত্র উৎপাদন করিতে হইবে। ভূমি উৎপাদক শ্রম করিবার মৌলিক ক্ষেত্র। নূতন সমাজ রচনার ভিত্তি পত্তন করিতে হইলে শারীরিক শ্রমের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এজন্য ভূমি কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে দেওয়া আবশ্যক যাঁহারা নিজেরা শ্রম করিয়া আবাদ করিবেন। তাই সর্বোদয় সমাজ রচনার ভিত্তিস্বরূপ প্রথমেই ভূমির পুনর্বণ্টন হওয়া আবশ্যক। (৩) বর্তমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে ভূমি সমস্যা সব চাইতে জরুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূমির পুনর্বণ্টন হইতেছে এই যুগের দাবি। ইহা যুগধর্ম। কিন্তু ভূমি-দান প্রাপ্তি ও ভূমি বিতরণে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে না। ভূমির সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-শিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূমির পুনর্বণ্টন হইলে পল্লী-শিল্পের ব্যবস্থা করার কাজ সহজ হইবে এবং উহার জন্য অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্ট হইবে।

(খ) 'গ্রামোদ্যোগ প্রধান' ঃ—ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যা শুধু ভূমির দ্বারা মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে; পূরক বৃত্তি অথবা বহুক্ষেত্রে প্রধান বৃত্তিস্বরূপ কুটীর-শিল্প চাই। কর্তৃত্ব বিভাজন না হইলে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত আর্থিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বিভাজন করা যাইবে না। উপরন্তু সর্বোদয় আদর্শে যে প্রকারের কাজ করা হউক না

কেন উহার আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই এবং সকলের কাজ পাওয়াও চাই। বিকেন্দ্রিত উৎপাদন বা শিল্প ব্যবস্থায় (১) প্রত্যেকের কাজ পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। (২) উহাতে কাজের প্রকার ও প্রকৃতি নির্বিশেষে কাজের আর্থিক মূল্য আপনাআপনি সমান হইতে থাকে। আর্থিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। তাই সর্বোদয় সমাজ রচনার পক্ষে কুটীর-শিল্পকে প্রধান স্থান দেওয়া আবশ্যক। এই সম্পর্কে বিনোবাজী অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বলিয়াছেন—"রামনাম লইবার সময় আমি কেবলমাত্র 'রাম' উচ্চারণ করি না, আমি 'সীতারাম' বলিয়া থাকি। তাহার অর্থ এই যে, ভূমি পুনর্বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে আমি গ্রাম-শিল্পও চাই। লোকে অনেক সময় বলে কুটীরশিল্পজাত জিনিসের দাম বেশী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষের জীবিকা হরণ করিয়া, তাহাকে বেকার করিয়া, তাহাকে অভুক্ত রাখিয়া কল যে পণ্য উৎপাদন করে তাহা সস্তা নহে বরং তাহা অত্যন্ত দুর্মূল্য। যদি কল সেই বেকারকে খাওয়াইতে বাধ্য হয় তবে মিলজাত দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত মহার্ঘ হইবে। কলের উৎপাদন সৌকর্যার্থ যে ব্যয় করা হয় তাহার হিসাব করিয়া বলুন কলজাত দ্রব্য সস্তা বা দুর্মূল্য? কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা যে দ্রব্য উৎপাদন করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে জিনিস চুরি করিয়া আনিয়া বিক্রয় করা হইতেছে তাহা সস্তা হইবেই তো। বিষ সস্তা এবং অমৃতের মূল্য বেশী। এইজন্য এই বিষ খরিদ করিবেন?"

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সমাজের বর্তমান অবস্থায় বৃহৎ যন্ত্রকে অর্থাৎ কেন্দ্রিত শিল্পকে একেবারে বর্জন করা কি সম্ভব? না, তাহা সম্ভব নয়। তবে কোন্ কোন্ কেন্দ্রিত শিল্প গ্রহণীয় হইবে এবং কোন্ নীতিতে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। এ সম্পর্কে বিনোবাজী তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে এক যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। ইহাকে সর্বোদয়ের অর্থনৈতিক যোজনা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—"যন্ত্র তিন প্রকার—সময়সাধক, সংহারক এবং উৎপাদক। (১) আমি সময়সাধক যন্ত্রের বিরোধিতা করি না। ট্রেন ও এরোপ্লেনের ন্যায় যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না বটে কিন্তু সময় বাঁচিয়া যায়। দশ হাজার ঘোড়াও একযোগে একটি এরোপ্লেনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না।

সেজন্য আমরা এরূপ সময়সাধক যন্ত্র চাহি। (২) কামান, বন্দুক, বোমা প্রভৃতির ন্যায় সংহারক যন্ত্রের অহিংস ব্যবস্থায় স্থান নাই। এইজন্য ঐরূপ যন্ত্র আমরা চাহি না। (৩) উৎপাদক যন্ত্র দুই প্রকার—পূরক ও মারক। যেখানে লোকসংখ্যা অধিক এবং কোন যন্ত্র লোককে বেকার করে তাহাকে তৎস্থানের মারক যন্ত্র বলা যায়। কিন্তু যেখানে মনুষ্যশক্তি কম এবং কাজ অধিক, সেখানে সেই যন্ত্র মারক নহে বরং পূরক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এক দেশে এক যন্ত্র পূরক হয়, আবার অন্য দেশে সেই যন্ত্রই মারক হয়। ভারতবর্ষে ট্রাক্টরের মত যন্ত্র আসিলে উহার ফলে প্রচণ্ডভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আমেরিকা রাশিয়ার মত দেশসমূহে ট্রাকটরের মত যন্ত্র মারক নহে, সেখানে উহা উৎপাদক বলিয়া গণ্য হইবে। ঐরূপে এক কালে এক যন্ত্র পূরক থাকে এবং উহা অন্য কালে মারক হইয়া যায়। দেশ, কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে কোন যন্ত্র পূরক বা মারক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং যন্ত্র বলিয়াই যন্ত্রের প্রতি আসক্তি রাখা বা যন্ত্রের বিরোধিতা করা উচিত নহে। যন্ত্রের উপযোগিতা বিবেচনা করিয়াই আমরা উহা গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা যদি যন্ত্রের প্রতি আসক্তি রাখি এবং বলিতে থাকি যে, মিলের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত উপযোগী যন্ত্র গ্রাম্যশিল্পে নাই অতএব আমরা উহার ব্যবহার করিব না, তবে এরূপ যিনি বলিয়া থাকেন তিনি দেশের জন্য যেরূপ চিন্তা করা উচিত সেরূপ চিন্তা করেন না। পাশ্চাত্ত্য দেশে এক ব্যাপার চলিতেছে বলিয়াই আমরা উহার চক্রে ও ধোঁকায় পড়িয়া সেই একই কথাই বলিতেছি। ইহা সত্ত্বেও গান্ধীজী আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমরা ভুল করিতেছি। আমি দেখিয়াছি যে, যেখানে আমরা সাম্যের কথা বলিয়া থাকি সেখানে সম্মুখস্থ কেহ উহার বিরোধিতা করিয়া বৈষম্যের কথা বলিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা "এফিসিয়েন্সি" বা দক্ষতার কথা উঠাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, আপনি সমতাবাদী কিন্তু আমরা দক্ষতাবাদী। এইরূপে তাঁহারা এক গুণের বিরুদ্ধে অন্যগুণ খাড়া করিয়া দেন। ইহার ফলে বিরোধ চলিতে থাকে। আজকাল পুঁজিবাদীরা দক্ষতার ধ্বনি উঠাইয়াছেন। আমিও দক্ষতা চাহি। কিন্তু আমি ইহা চাহি না যে, পরিবারের কয়েকজনের আহার মিলিবে আর অন্য কয়েকজন উপবাসী থাকিবে।

আমি চাহি যে সকলেই যেন খাইতে পায়। যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রাম্যশিল্পের যন্ত্র সকলের আহারের সংস্থান করিতে সক্ষম হয় তবে তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য। কিছু লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবশিষ্ট লোককে বেকার করিয়া রাখিয়া আমরা কখনও 'সক্ষম' হইয়া উঠিবার দাবি করিতে পারিব না।

"ভারতে আজ উৎপাদন অত্যন্ত কম এবং বেকারত্ব অত্যন্ত বেশী রহিয়াছে। অসন্তোষের সৃষ্টি এই কারণে হইয়াছে এবং উহা কোন না কোন সুযোগে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য কিছু করিতেই হইবে। অসন্তোষ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করা চাই। গান্ধীজীর এই কার্য-সূচী ছিল যে, যাহার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক তাহাকে তিনি সহায়তা করিতেন। কবি দুখায়েল শুনাইয়াছেন যে, সাহায্য দান করিবার ক্রম এইরূপ—প্রথমে ক্ষুধার্ত, পরে দুঃখী এবং শেষে সুখী। কিন্তু আজ তো ইহার বিপরীত ক্রম চলিতেছে। এইজন্য গান্ধীজী সদাসর্বদা এই কথা চিন্তা করিতেন যে, যাহার প্রয়োজন সব চাইতে অধিক তাহাকে সাহায্য দান করিবার উপায় করা চাই। এই অন্বেষণের ফলে চরকার আবিষ্কার হইয়াছিল। ইহা তাঁহার অদ্ভূত প্রতিভা। উহা তাঁহার কাব্যশক্তি। কেবলমাত্র কয়েক ছত্র লিখিলেই কবি হওয়া যায় না। ব্যাসকাচার্য বলিয়াছেন যে, "কবিঃ ক্রান্তিদর্শী"। বৈপ্লবিক দৃষ্টি যাঁহার আছে, যাঁহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, যিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনিই কবি। এই অর্থে গান্ধীজী কবি ছিলেন। তিনি কতিপয় বর্ষ পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য গ্রাম্যশিল্পের জরুরী প্রয়োজন। তিনি নয়ী-তালিম, রাষ্ট্রভাষা, জমির পুনর্বণ্টন প্রভৃতির কথা কয়েকবৎসর পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিরূপ মহোপকার তিনি করিয়াছেন, কিরূপ মহান বুদ্ধিমত্তা তাঁহার ছিল, কতই না প্রতিভা এবং কতই না বাৎসল্য তাঁহার হৃদয়ে ছিল! তিনি আমাদের জন্য এতই করিয়াছেন! আমরা তাঁহার নিকট হইতে আলোক পাইয়াছি। তথাপি আজ আমরা টলমল করিতেছি। আমরা এমন অভাগা।"

স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খাদ্য ও বস্ত্র গৃহে, তাহা সম্ভব না হইলে গ্রামেই উৎপাদন

করিতে হইবে। উপরন্তু যে সব দ্রব্যের কাঁচামাল যে গ্রামে উৎপন্ন হয় ও সেখানে উহাকে পাকামাল করিয়া প্রস্তুত করা সম্ভব তাহা ঐ গ্রামেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে ও পাকামালই গ্রামের বাহিরে পাঠাইতে হইবে। যেমন সৌরজগতে সূর্য কেন্দ্রস্বরূপ ও প্রধান, তেমনি পল্লী-শিল্প-রূপ সৌরজগতে খাদি সূর্য-স্বরপ। উহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্য সব পল্লীশিল্প গড়িয়া উঠিবে। তাই মহাত্মা গান্ধী সারাজীবন লোককে বুঝাইয়া গিয়াছেন —নিজের কাপড়ের জন্য নিজে সূতা কাটুন আর যিনি সূতা কাটিতে পারিবেন না তিনি খদ্দর খরিদ করিয়া ব্যবহার করুন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর অনেকে বলিতেছেন—'স্বাধীনতা লাভের জন্য খাদির প্রয়োজন ছিল। এখন খাদির আর কি প্রয়োজন?' তাঁহাদের সম্বন্ধে বিনোবাজী মন্তব্য করিয়াছেন যে তাঁহারা বুদ্ধিভ্রষ্ট। স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য ও তাহা সংরক্ষণের জন্য খাদি তথা পল্লীশিল্প অপরিহার্য। যদি খাদি গড়িয়া না উঠে তবে অন্য কোন পল্লীশিল্প গড়িয়া উঠা সম্ভব নয়। তাহা হইলে গ্রামের দারিদ্র্য দূর করাও সুদূর পরাহত হইবে। সে ক্ষেত্রে গ্রাম ধনী ও মিলমালিকদের কবলস্ত হইয়া পড়িবে ও স্বাধীন জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। এক কথায় গ্রামের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে এবং পরিণামস্বরূপ দেশের স্বাধীনতা হারাইবার পথ পরিষ্কার হইবে। তাই যাঁহারা খদ্দর পরিধান করেন না তাঁহাদিগকে বিনোবাজী অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন খদ্দর খরিদ করেন এবং মিলের বস্ত্র অপেক্ষা খদ্দরের মূল্যে যাহা বেশী হইবে তাহা দরিদ্রকে গুপ্তদান দিলেন বলিয়া ধরিয়া লন। তিনি বলিয়াছেন—"চারি টাকা মূল্যের খাদি পরিধান করুন। দুই টাকা তো কলের কাপড়েও খরচ হয় আর বাকি দুই টাকা দান-ধর্মে খরচ হইল বলিয়া ধরিয়া লউন। যদি হিসাবের খাতা রাখেন তবে তাহাতে লিখিবেন কাপড় দুই টাকা ও দান-ধর্ম দুই টাকা। দেশের মা-বোনদের যদি বাঁচাইতে চান তবে কিছু ধর্ম করিতেই হইবে। যদি এইরূপ দান-ধর্ম করেন তবে গরীবেরা বেকার হইবে না। পিতামহ ভীষ্ম বলিয়াছেন—"দরিদ্রান্ ভর, কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরং ধনম্" অর্থাৎ দরিদ্রকে ধন দাও, ধনবানকে দিও না।"

সকলেই উৎপাদক শ্রম করিবে। সকলকেই উৎপাদক শ্রম করিবার

সুযোগ দিতে হইবে। ইহা পল্লী-শিল্পের মূল কথা। কিন্তু কেবল "উৎপাদক শ্রম" বলিলে সঠিক বলা হয় না। কারণ যে সব বৃহৎ যন্ত্রশিল্প কোটি কোটি মানুষকে বেকার করিয়া দেয় তাহাতে যে সব শ্রমিক কাজ করে তাহারাও তো উৎপাদক শ্রম করে। কাপড়ের কলের এবং চাউল কলের শ্রমিকেরাও যে শ্রম করে তাহা তো উৎপাদক শ্রম। তাই বিনোবাজী কুটীর-শিল্পে প্রযুক্ত উৎপাদক শ্রমকে "দ্রোহ-রহিত" বিশেষণ দিয়াছেন। বেকারত্ব সৃষ্টিকারী যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সহিত পল্লীশিল্পে উৎপাদনকারী শ্রমিকের এই পার্থক্য। একজনের শ্রম দ্রোহরহিত অর্থাৎ অন্যের 'অনিষ্ট সাধন করে না এবং অন্য জনের শ্রম 'দ্রোহকারী'।

আমাদের সমাজ রচনা পল্লী-শিল্প-প্রধান হইবে। বিনোবাজী ইহার স্পষ্টীকরণ করিয়া বলিয়াছেন—"'প্রধান' বলিবার কারণ এই যে গোণরূপে আরও বিষয় ইহাতে থাকিবে।" তাহা হইতেছে—নয়ী-তালিম, রাষ্ট্রভাষা, সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্যপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। মহাত্মা গান্ধী-নির্দেশিত আঠার দফা গঠনমূলক কার্যের মধ্যে এই সব গোণ বিষয় রহিয়াছে। তাহা ছাড়া অবস্থার প্রয়োজনে নূতন বিষয় যুক্ত হইতে পারে।

(গ) 'অহিংস'—বিনোবাজী 'অহিংস' শব্দের স্পষ্টীকরণ করিয়া বলিয়াছেন—"আমাদের ক্রান্তির সাধন 'অহিংসা' হইবে। ইহাকে আমরা সত্যাগ্রহও বলিয়া থাকি। ইহার চারিটি অঙ্গ ঃ—(১) দুঃখকষ্ট বরণ করা অর্থাৎ তপস্যা, (২) বিচার প্রচার, (৩) নয়ী-তালিম এবং (৪) পাপ অর্থাৎ অন্যায়ের সহিত অসহযোগ।"

নূতন সমাজ রচনায় অহিংসা নিম্ন তিন প্রক্রিয়ায় কাজ করিবে—(১) স্বতন্ত্র জনশক্তি, (২) কর্তৃত্ব বিভাজন ও (৩) বিচার-শাসন। এই তিন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্র-শক্তির সাহায্য না লইয়া বা উহা প্রয়োগ না করিয়া বা উহার অপেক্ষায় না থাকিয়া জনগণ নিজ প্রেরণায় নিজেদের বিধায়ক-শক্তি জাগ্রত করিয়া কার্যসিদ্ধি করিবে। উহা হিংসার বিরোধী। যেমন আইন প্রণয়নের অপেক্ষায় না থাকিয়া ভূমি প্রাপ্তি ও বিতরণের কার্য। পল্লী-শিল্পের ক্ষেত্রেও জনশক্তি সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হওয়া। আইনের সাহায্যে বা সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা পল্লী-শিল্পের

উন্নতি করিবার জন্য অপেক্ষা না করা। বিচার-শাসন হইতেছে—বাহ্যিক শক্তির চাপে অথবা আইনের ভয়ে না করিয়া অন্তরে বিচার করিয়া বুঝিয়া অন্তরের প্রেরণায় সার্বজনিক সর্বক্ষেত্রে নিজেকে পরিচালনা করিবে। কর্তৃত্ব বিভাজন হইতেছে—রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ ক্ষমতা কেন্দ্র হইতে হস্তান্তর করিয়া গ্রামের হাতে অর্পণ করা; উহা মফঃস্বলে কেবলমাত্র administrative authority সৃষ্টি করা নহে।

**শাসনমুক্ত সমাজ**

সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনায় সমাজের চরম পরিণতি হইতেছে —শাসনমুক্ত অবস্থা। ইহা মাত্র Stateless society অর্থাৎ রাষ্ট্র শাসনবিহীন সমাজ নহে। ইহাতে সামাজিক শাসনও থাকিবে না। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবে। প্রত্যেকের বিবেক-বুদ্ধি এরূপ বিকশিত হইবে যে, কাহারও সহিত কাহারও স্বার্থ-সংঘর্ষ আসিবে না; সুতরাং কোন সংঘর্ষ বা বিবাদের উদ্ভবই হইবে না। বাস্তব-ক্ষেত্রে কখনও হয়তো এই অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। সম্পূর্ণভাবে শাসনমুক্ত সমাজ এক আদর্শ। আদর্শে পৌঁছিবার জন্য চিরদিন প্রচেষ্টা চলিবে ও চিরদিন তদভিমুখে উত্তরোত্তর অধিক অগ্রসর হওয়া যাইবে কিন্তু আদর্শে হয়তো কখন পৌঁছান যাইবে না। কিন্তু আদর্শে একদিন না একদিন পৌঁছাইতে হইবে ও পৌঁছান যাইবে ইহা মনে করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাই এই আদর্শকে অবহেলা করা চলিবে না। তাহা হইলে অন্য সব ব্যবস্থার মূল শিথিল হইয়া যাইবে। উহা জ্যামিতির বিন্দুর মত। উহার কল্পনা করা যায়, কিন্তু চোখে দেখা যায় না। তথাপি উহাকে বাদ দিয়া কোন বৈজ্ঞানিক বাস্তবক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন না। কারণ তাহাতে জ্যামিতির পরবর্তী সব সিদ্ধান্তই অচল হইয়া পড়িবে। বিন্দুর কল্পনাকে বাদ দিলে কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন দালানের নক্সা তৈয়ারি করিতে পারিবেন না। সেরূপ শাসনমুক্ত সমাজের আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে সর্বোদয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের কোন প্রকার গঠন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হইবে না।

এই আদর্শে পৌঁছাইতে হইবে এই লক্ষ্য অন্তরে জাগরূক রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই আমরা চলিবার পথ-নির্দেশ পাইব। যদি শাসনমুক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে হয় তবে প্রথম হইতে রাষ্ট্রশক্তির সহায়তার অপেক্ষা না করিয়া আমাদিগকে উপযোগী আত্মশক্তি নির্মাণ করিয়া (যাহাকে সামুদায়িক ক্ষেত্রে জনশক্তি বলা হয় তাহার উপরে নির্ভর করিয়া) কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। এই আত্মশক্তির দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি-নিরপেক্ষ জনশক্তি নির্মিত হইবে। নৌকা, জাহাজ, গাড়ী ইত্যাদিতে যেমন দিশা-নির্ণায়ক যন্ত্র ও শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র—এই উভয়বিধ যন্ত্র থাকে তেমনি নব সমাজ রচনায় শাসনমুক্ত সমাজের আদর্শ হইতেছে দিশা-নির্ণায়ক যন্ত্র এবং স্বতন্ত্র জনশক্তি উহার শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র বা Motor force।

শাসনমুক্ত সমাজ কাম্য। তাই প্রথম হইতেই সেই অভিমুখে অগ্রসর হওয়া শুরু করিতে হইবে। শাসনমুক্ত সমাজ রচনা করিতে হইলে সমাজকে শোষণ-মুক্ত করা চাই। এইজন্য গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে। জীবন-ধারণের পক্ষে যাহা কিছু প্রাথমিক প্রয়োজন তৎসমস্তই গ্রামে উৎপন্ন করিতে হইবে। উপরন্তু কাঁচামাল যাহা গ্রামে উৎপন্ন হয় তাহা সেই গ্রামেই পাকা মালে পরিণত করিয়া তবেই বাহিরে পাঠান যাইবে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। উহাতে ক্ষমতার সত্যিকারের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া চাই। উহার দ্বারা মাত্র স্থানীয় administrative authority সৃষ্টি করা না হয়। গ্রাম-পঞ্চায়তে উহা রূপ পরিগ্রহ করিবে। গ্রামের ব্যাপারে উহার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে। যেমন, যদি কোন গ্রাম মনে করে যে, সে গ্রামে কলের তৈল আমদানী হইবে না তবে দেশের অন্যত্র অন্যরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলেও তাহার নিজের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার ক্ষমতা সেই গ্রাম-বিশেষের থাকিবে। গ্রাম-পঞ্চায়ত যে কিরূপ তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে। সরকার যে গ্রাম-পঞ্চায়ত করিতে চান তাহা মাত্র স্থানীয় administrative agency। সত্যি-কারের গ্রাম-পঞ্চায়তে সিদ্ধান্ত ভোটাভুটির দ্বারা করা হইবে না। ইহাতে সর্বসম্মতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। গ্রাম-পঞ্চায়তের নীতি সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"গ্রাম-পঞ্চায়তের নীতি এই যে ভগবান পঞ্চজনের

মাধ্যমে কথা বলেন অর্থাৎ পঞ্চায়তের সর্বসম্মত অভিমতই ভগবানের বিচার বলিয়া মান্য করা উচিত। যে ক্ষেত্রে পাঁচজনের মধ্যে তিনজন বা চারজন একরকম বলেন এবং বাকি অন্যরূপ বলেন সে ক্ষেত্রে তাহা ভগবানের বিচার হইল না।" এইরূপে ক্রমশঃ গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'শাসন-মুক্ত' এর স্থলে 'শাসনহীন' শব্দ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিনোবাজী বলেন যে, 'শাসনমুক্ত' শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহার করিলেই তবে সঠিক বলা হয়। কারণ সমাজ মানেই শাসন বা অনুশাসনবদ্ধ জন-সমবায়। শাসন ছাড়া সমাজের কল্পনা কখনও করা যায় নাই। সর্বোদয় প্রতিষ্ঠায় সেই শাসন হইতে মুক্ত হইতে হইবে সুতরাং শাসনমুক্ত সমাজই কাম্য।

**শরীর শ্রমের গুরুত্ব**

নব সমাজ রচনা বা সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকেরই উৎপাদক শারীরিক শ্রম করার প্রয়োজনীয়তার উপর কেন যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহা ভালভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। সাধন-পদ্ধতির পশ্চাতে যে গভীর বিচার-ধারা রহিয়াছে তাহা বুঝিলে সর্বোদয়ের পথে অগ্রসর হইবার জন্য সকলে প্রেরণা লাভ করিবে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীবনের আর্থিক ক্ষেত্র সব চাইতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র। আর্থিক ক্ষেত্রেই সর্বোদয়ের রূপ সব চাইতে বেশী প্রকাশ পায়। তাই সর্বোদয় প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সাম্যের প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশী। আর্থিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে—(১) সমাজের উপকারে আসে এমন যে কোন কাজেই হউক না কেন তাহার আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই। একদিকে যেমন কৃষি-শ্রমিকের এক ঘণ্টার কাজ ও কর্মকার বা নাপিতেব এক ঘণ্টার কাজের পারিশ্রমিক সমান হইবে, অন্যদিকে সেরূপ কৃষি-শ্রমিকের এক ঘণ্টা কাজের জন্য যে মজুরী দেওয়া হইবে উকিলের এক ঘণ্টা কাজের পারিশ্রমিক তদপেক্ষা বেশী হইবে না। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর শারীরিক শ্রমের কাজের মূল্য যেমন সমান হওয়া চাই তেমনি শরীরিক ও বৌদ্ধিক কাজের মূল্যের মধ্যেও কোন পার্থক্য না থাকা চাই। (২) নৈতিক সাম্য ও সামাজিক সাম্য না আসিলে আর্থিক

সমানতা প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য। সমাজের পক্ষে চাষের কাজ করার যেমন প্রয়োজন অধ্যাপকের অধ্যাপনার কাজও তেমনি প্রয়োজন। নৈতিক দৃষ্টিতে এই দুইকে সমান মূল্য দেওয়া উচিত। উপরন্তু শ্রমিক ও অধ্যাপকের সামাজিক মর্যাদা সমান হওয়া উচিত। অধ্যাপককে কৃষি-শ্রমিক অপেক্ষা উচ্চ ভাবা উচিত নয়। কৃষি কার্য ও অধ্যাপনার কার্যের নৈতিক মূল্য সমান এবং সামাজিক মর্যাদার দৃষ্টিতে কৃষি-শ্রমিক ও অধ্যাপক উভয়েই সমান। সমাজের চক্ষে এই দুই কাজের প্রয়োজনীয়তা যদি সমান হয় ও উহাদের মর্যাদাও যদি সমান হয় তবে আর্থিক ক্ষেত্রের বিচারধারাও সমানতার দিকে লইয়া যাইবে। তাহা হইতেছে কৃষি-শ্রমিকের পুষ্টির জন্য যতটা প্রয়োজন, অধ্যাপকের পুষ্টির জন্যও ততটা প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহাদের পারিশ্রমিকের মধ্যে প্রভেদ থাকার কোন কারণ নাই।

আজ সমাজে বৌদ্ধিক কাজের ও শারীরিক শ্রমের পারিশ্রমিকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। সামাজিক ক্ষেত্রেও শ্রমজীবীকে বুদ্ধিজীবীর তুলনায় নিতান্ত কম মর্যাদা দেওয়া হয়। ইহা কেন্দ্রীত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণাম। কারণ কেন্দ্রীত উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থাৎ বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পে ম্যানেজারআদি কর্মনিম্ন সকল স্তরের পরিচালক ও ব্যবস্থাপকের এবং বৃহৎ যন্ত্র-নির্মাতা ও যন্ত্র-পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির উচ্চস্তরের বৌদ্ধিক কার্য অপরিহার্য। অন্যদিকে সেখানে শ্রমিকের কাজে বুদ্ধি চালনার একেবারে কোনই প্রয়োজন থাকে না। তাই নৈতিক ও আর্থিক সমানতার প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই অবস্থা আদৌ অনুকূল নহে। সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে উৎপাদন ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যেখানে শারীরিক শ্রমের কাজের প্রয়োজন বেশী, উপরন্তু যেখানে শ্রম ও বুদ্ধির সমন্বয় সাধিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। পল্লী-শিল্প বা কুটীর-শিল্পে শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ার একই ব্যক্তি অর্থাৎ তাহাতে যে বুদ্ধির কাজের প্রয়োজন হয় তাহা শ্রমিকই করিয়া লয় ও সহজে করিতে পারে। ইহাতে জটিল বুদ্ধির আবশ্যকতা নাই। ইহাতে বুদ্ধির monopoly (একচেটিয়া) ও একনায়কত্ব থাকিবে না। উপরন্তু বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থায় পৃথক পরিচালক বা ব্যবস্থাপকের আবশ্যকতা নাই। যৎসামান্য পুঁজি যাহা লাগে তাহা শ্রমিকই দিতে পারে। তাই কুটীর-শিল্পে

শিল্পের মালিক নিজেই একযোগে পুঁজিপতি, শ্রমিক, পরিচালক ও ইঞ্জিনিয়ার। তাই সাম্য-প্রতিষ্ঠা আপনা আপনি হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীত উৎপাদন ব্যবস্থার তুলনায় পল্লী-শিল্পে বহুগুণ অধিক লোকের শারীরিক শ্রম করিবার প্রয়োজন হয়। উহাতে শারীরিক শ্রমও অধিক করিতে হয়। উপরন্তু আজ শারীরিক শ্রমের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ভাব বিদ্যমান। সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাহাই সর্বাপেক্ষা মনস্তাত্বিক প্রতি-বন্ধক। তাই যদি আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তবে তাহার ভিত্তি-স্বরূপ সমাজে শারীরিক শ্রম সম্পর্কে মনস্তাত্বিক পরিবর্তন আনিতে হইবে। যাঁহাদের আজ জীবিকা উপার্জনের জন্য শারীরিক শ্রম করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না, যাঁহারা উচ্চস্তরের ও জটিল বুদ্ধির কাজে কুশল ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা যদি দৈনিক নিয়মিতভাবে কিছু সময় উৎপাদক শ্রম করিয়া নিজেদের খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইয়া লইবার জন্য অগ্রসর হন তবে জনমানসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিবে। উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী ইঁহারা যদি এইভাবে নিয়মিত উৎপাদক শ্রমের কাজ করিতে থাকেন তবে তাহার বৈপ্লবিক ফল সহজে কল্পনা করা যায়। যদিও এখনই ইহা দুরাশা বলিয়া মনে করা হয় তথাপি অন্য সকলে তাহাদের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য ও বস্ত্রের আবশ্যকতা মিটাইবার জন্য অগ্রসর হইবেন না কেন? দ্রোহরহিত উৎপাদক শ্রমকে জীবন-নিষ্ঠাস্বরূপ সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ 'পৃথিবীতে আজকার বহুতর বৈষম্য, বহুতর দুঃখ-কষ্ট ও বহুতর পাপের হেতু হইতেছে শ্রম না করিবার অভিলাষ! শরীর-শ্রম হইতে বিরত থাকা যাহার সংকল্প সে ব্যক্তির গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে চুরি করা হয়।'

### গ্রামরাজ ও রামরাজ

সর্বোদয়ের আদর্শে সংগঠিত গ্রামকে বিনোবাজী 'গ্রামরাজ' আখ্যা দিয়াছেন। গান্ধীজী 'রামরাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেন। এই দুই কি একই জিনিস? মনে করুন, ভূমিদানযজ্ঞ ও সম্পত্তিদানযজ্ঞ সফল হইয়া ভূমিতে মালিকত্ববোধ দূর হইল। যিনি জমি চাষ করিতে চাহেন তিনিই

জমি পাইতেছেন। প্রতি গ্রাম জনশক্তির বলে জীবনধারণের পক্ষে প্রাথমিক-ভাবে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি গ্রামেই উৎপন্ন করিয়া লইতেছেন। প্রতি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে। কোন জিনিষ গ্রামে উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ণয় করিবার ও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার অধিকার গ্রামবাসী অর্জন করিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি গ্রামে গ্রামে বিকেন্দ্রীত হইয়াছে। সমাজে কোথাও উচ্চনীচ ভেদভাব নাই। সকল মানুষ জীবনযাত্রার সমান সুযোগ লাভ করিয়াছে। কাজের প্রকৃতি বা প্রকারভেদে আয়ের ইতর-বিশেষ আর নাই। সকল কাজের সমান মূল্য। ইহা হইতেছে—'গ্রামরাজ'। 'গ্রামরাজে' যাহা কিছু সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় করা হইবে তাহা সর্বসম্মতিক্রমেই করা হইবে। 'গ্রামরাজের' অবস্থায় মতভেদ বা বিবাদের উদ্ভব হইতে পারে তবে তাহার মীমাংসা সর্বসম্মতিক্রমেই হইবে। কিন্তু 'রামরাজে' বিবাদ-বিসংবাদ বা মতভেদের উদ্ভবই হইবে না। তাহা হইবে একেবারে শাসনমুক্ত অবস্থা। প্রত্যেক মানুষ নিজের বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইবে। সুতরাং বিনোবাজীর 'গ্রামরাজ' মহাত্মা গান্ধীর 'রামরাজের' পূর্ব-সূচনা। এ সম্পর্কে বিনোবাজী একদা মন্তব্য করিয়াছিলেন যে—"যেক্ষেত্রে গ্রামের মতভেদ গ্রামে সর্বসম্মতিক্রমে মীমাংসিত হয় তাহাই হইবে 'গ্রামরাজ'। যে অবস্থায় মত-ভেদ বা বিবাদের উদ্ভবই হইবে না তাহা হইবে 'রামরাজ'।"

### যুগপৎ উভয় পদ্ধতি অনুসরণ

এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দুইটি সাধন-প্রক্রিয়া একসঙ্গে অনুসরণ করা হইতেছে। এক হইতেছে—আধ্যাত্মিকতার বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা এবং অন্যটি হইতেছে—জন-জাগৃতি। ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। ধন-অর্থ শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নহে। উহা সমাজের। ব্যক্তিগত মানুষ সমাজের পক্ষে উহায় ন্যাসরক্ষক মাত্র। এই বোধ জনগণের মধ্যে জাগ্রত হইলে উহার প্রতিক্রিয়ার চাপে যাঁহার অধিক আছে তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি কেবলমাত্র এইরূপ জাগৃতি হয় এবং আর কিছু না করা হয় তবে তাহার পরিণামস্বরূপ হিংসার দিকে প্রবণতা সৃষ্টি করিবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হওয়া

চাই। সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান। তাই মানুষ নিজেকে যেমন ভাবে ও দেখে অন্যকেও সেইরূপ ভাবিবে ও দেখিবে। সকলের আত্মা সমানদাবে জাগ্রত ও বিকশিত হইতে পারে। উহাতে ধনীর হৃদয়-পরিবর্তন হইবে। উপরন্তু উহা জনগণকে সত্য ও অহিংসার পথ অনুসরণ করিবার দীক্ষা দান করিবে। তাই এই দুই প্রকারের প্রচেষ্টা যুগপৎ অগ্রসর হওয়া চাই। নচেৎ বিপদের সম্ভবনা থাকিয়া যায়। তাই বিনোবাজী যুগপৎ এই দুই দিক দিয়া অগ্রসর হইতেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"প্রথম হইতেছে এই যে, অন্তরস্থিত ভগবান আমাদের ভরসা। শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, সেই ভগবান জাগ্রত হইবেনই এবং মানুষকে সুপথে চলিবার প্রেরণা দান করিবেন। দ্বিতীয়তঃ আমরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা করিতেছি যাহাতে জন-জাগৃতি আসিবে এবং লোকে দান না দিয়া থকিতে পারিবে না। এরূপে আমরা উভয়বিধ জাগৃতি আনিবার চেষ্টা করিতেছি—(১) নৈতিক জাগৃতি, তাহাতে হৃদয়-পরিবর্তন সাধিত হইবে এবং (২) জনমানসে চেতনার সঞ্চার। যদি কেবলমাত্র জনগণের মধ্যে চেতনা আসে এবং নৈতিক জাগৃতি না আসে তবে তাহা হিংসা-শক্তিকে জাগ্রত করিতে পারে। অন্যদিকে যদি কেবল নৈতিক জাগৃতি হয় তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বহুদিন লাগিবে। যেমন উড়িবার জন্য পক্ষীর উভয় পক্ষেরই প্রয়োজন হয় তেমনি কোন সৎ সংকল্পের সিদ্ধির জন্য অন্তর্জাগৃতি ও বাহ্য-পরিবর্তন উভয়ই আবশ্যক।"

**বুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা**

বুদ্ধি দিক প্রদর্শন করে এবং হৃদয় কর্মে প্রেরণা দান করে। নৌকার হাল (কর্ণ) নৌকা কোন্ দিকে যাইবে তাহা দেখাইয়া দেয় আর দাঁড় (ক্ষেপণী) তাহার শক্তির দ্বারা নৌকাকে চালনা করে। বুদ্ধি হইতেছে হাল আর হৃদয় বা শ্রদ্ধা হইতেছে দাঁড়। শ্রদ্ধা motor force এবং বুদ্ধি steering জীবনের কোন মৌলিক সিদ্ধান্ত যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সেই বিচার বুঝিয়া লয়। তখন সেই সিদ্ধান্ত যে কোন্ দিকে লইয়া যাইবে তাহা সে হৃদয়ংগম করিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও যদি সেই বিচার তাহার হৃদয়কে স্পর্শ না করে, তবে সে কর্ম-প্রেরণা লাভ করে

না। অন্যদিকে এমনও হইতে পারে, অন্য একজনের বুদ্ধি তেমন প্রখর নয়, বুদ্ধির দ্বারা বিচার ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হইল না কিন্তু সিদ্ধান্ত তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্তের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তখন ঐ ব্যক্তি ঐ সিদ্ধান্তের বিচারধারা ভালভাবে না বুঝিলেও শ্রদ্ধার বলে আন্তরিকভাবে কাজ করিয়া যাইবে। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এক জিনিষ। শ্রদ্ধা থাকিলে বিশ্বাস আসিবেই। অহিংসার ব্যাপারে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের সব চাইতে প্রয়োজন। ভূদানযজ্ঞের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের সব চাইতে প্রয়োজন। যদি বিনোবাজী তেলেঙ্গনার পচমপল্লী গ্রাম হইতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর না হইতেন তবে কি আজ এই অবস্থায় আসিয়া পোঁছান সম্ভব হইত? অহিংসামূলক সিদ্ধান্তের বিচারধারা ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে। তাই উহার সাধনের জন্য প্রথমে শ্রদ্ধা লইয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের আজ আর সেই অবস্থা নাই। ভূদান-যজ্ঞের বিচারধারা আজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে গভীরভাবে এই বিচার বুঝিবার পক্ষে পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে। অতএব যেখানে শিথিলতা ও নিষ্ক্রিয়তা দেখিতে পাওয়া যাইবে সেখানে বুঝিতে হইবে যে, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব রহিয়াছে। বিনোবাজী বলেন—"পৃথিবীতে কোন কোন কাজ বুদ্ধির দ্বারা করিতে হয়, আবার কোন কোন কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা করিতে হয়। দুই পরস্পরের পূরক। দুইএরই আবশ্যকতা আছে। বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে আমি এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি—বুদ্ধি হইতেছে তাহা, যাহা প্রমাণ ব্যতীত কোন বিষয়কে স্বীকার করে না। আর শ্রদ্ধা হইতেছে তাহা, যাহা কোন বিশিষ্ট বিষয় মানিবার জন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।" যেমন শিশু মাতার স্তন্য পান করিবার পূর্বে তাহার ইহা প্রমাণ করাইয়া লইবার প্রয়োজন হয় না যে, স্তন্যে সার পদার্থ আছে ও উহাতে তাহার পোষণ হইবে। শ্রদ্ধাবশতঃ বিনা প্রমাণে সে স্তন্য পান করে। তাই বিনোবাজী বলেন—"এইজন্য কোন কোন বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা থাকা চাই।"

শ্রদ্ধার সহিত কর্ম সম্পাদন করিতে থাকিলে যতই ফলোদয় হইতে থাকে ততই নিষ্ঠা জন্মিতে থাকে। কাজে যতই অভিজ্ঞতা হয় ততই নিষ্ঠা দৃঢ় হইতে থাকে। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী

বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা এক দৃঢ় দেওয়ালের মত। হয় ইহা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, নচেৎ ইহা ভূ-শায়িত হইয়া থাকিবে। হয় ইহা পরিপূর্ণ, নচেৎ ইহা একেবারে নাই। যেমন কোন মানুষ, হয় সম্পূর্ণ জীবিত আছে না হয় সম্পূর্ণ মৃত, যেমন কেহ শতকরা ৪০, ৫০ বা ৬০ ভাগ জীবিত হইতে পারে না কিংবা শতকরা ৬০, ৫০ বা ৪০ ভাগ মৃত হইতে পারে না, সেরূপ শ্রদ্ধা কখন আংশিক হইতে পারে না। শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য কখন সাধিত হয় না। কর্ম শ্রদ্ধাকে অনুসরণ করে এবং কর্মের পশ্চাতে নিষ্ঠা আসিয়া থাকে। নিষ্ঠা জন্মিবার পূর্বে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করিয়া যায়। অভিজ্ঞতায় সফলতা প্রাপ্ত হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। মানুষ কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে উহাতে তাহার শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। আমরা নৈতিক শক্তির দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিতে চাই। সুতরাং সাধনোপায়ে আমাদের দৃঢ় শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন।"

**জ্ঞান ও বিজ্ঞান**

বিজ্ঞান শক্তি ও গতি দান করে, আর জ্ঞান পথ প্রদর্শন করে। যেখানে আত্মজ্ঞান সেখানে ভূমার দিকে পথ প্রদর্শিত হয়। যেখানে অহিংসা, সেখানে পরম কল্যাণের দিকে পথ দেখায়। যেমন আত্মজ্ঞান ও অহিংসা পথ দেখায় তেমনি হিংসা ও অজ্ঞানও পথ দেখায়। তবে অজ্ঞান বা হিংসা যে পথ দেখায় তাহা হইতেছে বিনষ্টির পথ, অকল্যাণের পথ। বিজ্ঞান motor force এবং আত্মজ্ঞান, অহিংসা, অজ্ঞান ও হিংসা steering বিজ্ঞান নৌকার ক্ষেপনী (দাঁড়) এবং আত্মজ্ঞান বা অহিংসা অথবা অজ্ঞান বা হিংসা নৌকার কর্ণধার। তাই বিজ্ঞান হিংসার সাহায্য করিলে অশেষ অনিষ্ট সাধন করে। পুরাকালে বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই। তাই যুদ্ধ বাধিলে হাতাহাতি যুদ্ধ হইত। যাহারা যুদ্ধে যোগদান করিত, ক্ষতি-বৃদ্ধি কেবলমাত্র তাহাদেরই হইত। আজকাল বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় যুদ্ধ বাধিলে সারা পৃথিবী তাহার কবলস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার অনিষ্ট সাধনের অবধি থাকে না। হিংসার সহিত বিজ্ঞান যুক্ত হইয়া 'এটম-বোম' সৃষ্টি করিয়াছে। সেরূপ অহিংসা বা আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানের সহায়তায় দেশ-বিদেশে প্রসারিত ও

প্রচারিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। বিজ্ঞানকে যদি কল্যাণদায়িনী শক্তিরূপে পাইতে হয় তবে বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান বা অহিংসার মিলন সাধন করিতে হইবে এবং অজ্ঞান বা হিংসার সঙ্গে তাহার চির বিচ্ছেদ সংঘটন করাইতে হইবে। নচেৎ জগৎ দ্রুততর গতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইবে।

**দান, যজ্ঞ ও তপঃ**

ভূদানযজ্ঞের 'দান' শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে—'দানং সংবিভাগঃ' অর্থাৎ দান সম্যক বিভাজন, সমবণ্টন। ভূমি ভগবানের দান। যাহা ভগবানের দান তাহা সমভাগে পাইবার অধিকার সকলের আছে। তাই যাহার ভূমি নাই বা অত্যন্ত কম আছে তাহার অধিকারের ভিত্তিতে জমি চাওয়া হয়। যাঁহার নিকট বেশী আছে তিনি দিবেন—ভিক্ষা স্বরূপ নহে, দরিদ্রের অধিকারের দাবি স্বীকার করিয়া। দানের এই অর্থ। এই আন্দোলনের পক্ষে ইহা কি যথেষ্ট নয়? তবে 'দানে'র সহিত 'যজ্ঞ' শব্দ যুক্ত করা হইয়াছে কেন? যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়। যজ্ঞাগ্নি ঘৃতকে ভস্মীভূত করে। যজ্ঞের অর্থ আহুতি দেওয়া। 'দানযজ্ঞের' দ্বারা মানুষ ভূমি ও সম্পত্তিতে তাহার স্বামিত্বকে ও তাহার স্বামিত্ববোধকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দান করিবে। মানুষ নিজেকে সমাজের জন্য উৎসর্গ করিবে। চরমে মানুষ তাহার অহংকে যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত করিবে। যজ্ঞ মানুষকে ক্ষুদ্রতম, দরিদ্রতম মানুষের সহিত একাত্ম-বোধ করিবার দীক্ষা দান করিবে। দান ভূমিব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিবে কিন্তু যজ্ঞ মানুষের জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করিবে। যজ্ঞ মানুষকে তিতিক্ষার পথে লইয়া যাইবে। ইহা এমন এক জিনিস যাহাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করিতে পারে—এই অর্থেও ইহা যজ্ঞ। যজ্ঞে সকলেই নিজ নিজ হবির্ভাগ অর্পণ করিবে।

যাঁহার অল্পতম জমি আছে তিনিও দান দিবেন কেন? কারণ তাহার দ্বারা তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। নিতান্ত অল্প জমি হইলেও তাহাতে তাঁহার মালিকত্ব-বোধ রহিয়াছে। যজ্ঞের দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার মালিকত্ব-বোধ বিসর্জনের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, দরিদ্রতম ব্যক্তির সহিত দারিদ্র্য বণ্টন

করিয়া ভোগ করিতে হইবে। ইহা হইবে তাঁহার যজ্ঞ। তাই বলা হয় ভূমি-দান হইতেছে গরীবের পক্ষে যজ্ঞ এবং ধনবানের পক্ষে দান। তপঃ হইতেছে —সৎ সংকল্পের সিদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায় সহকারে অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অশেষ কষ্টসহন। তপঃ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"প্রাচীন ঋষিগণ ও গীতা তিনটি জিনিসের ব্যবস্থা করিয়াছেন—যজ্ঞ, দান ও তপঃ। ভূদানযজ্ঞের দ্বারা আমি যজ্ঞ ও দানের জন্য আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু যদি আমরা তপশ্চর্যা না করি তবে দান ও যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে না। এই ত্রয়ী এক সম্পূর্ণ বস্তু। উহা অবিভাজ্য। কর্মিগণ তপঃ করিবেন। দান ও যজ্ঞ জনগণ করিবেন। তাই আমাদিগকে তপঃ-এর পরাকাষ্ঠা সাধন করিতে হইবে।"

### সূতাঞ্জলি

মহাত্মা গান্ধীর প্রথম শ্রাদ্ধ দিবস ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী দেশের সর্বত্র প্রতিপালন করা হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর দেহাবসানের পর তাঁহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে চালাইয়া যাইবার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায় সে সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সেবাগ্রামে গঠনমূলক কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গান্ধীজীর বিচার-ধারা যাঁহারা মান্য করেন তাঁহাদের এক ভ্রাতৃ-সমাজ (brotherhood) প্রতিষ্ঠা করা হয়। উহার নাম সর্বোদয় সমাজ। সর্বোদয় সমাজের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বোদয় কল্পনার ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রতি বৎসর ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেশের স্থানে স্থানে মেলা হইয়া আসিতেছে। সূতাঞ্জলি সমর্পণ করা উক্ত মেলার এক প্রধান কার্যক্রম। গান্ধীজীর পুণ্য স্মৃতিকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন এবং যাঁহারা শরীর শ্রমের আদর্শ মান্য করেন তাঁহাদের প্রত্যেককে নিজেদের হাতে কাজা সূতা একগুণ্ডী (৬৪০ তার) সর্ব-সেবা-সঙ্ঘের জন্য সমর্পণ করিতে হইবে।

সূতাঞ্জলির কার্যক্রম স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামরাজ রচনা তথা শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য কার্যক্রম। কারণ (১) সূতাঞ্জলি প্রচলিত হইলে সারা দেশে এক কর্মময় উপাসনা চলিতে থাকিবে। তাহাতে জনগণ এক প্রকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ করিবেন। (২) সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে

শরীর শ্রমের আদর্শ অনুসরণ করা অপরিহার্য। সুতাকাটা দ্রোহরহিত উৎপাদক শ্রমের প্রতীক। তাই উহা শ্রম-যজ্ঞের যোগ্য আহুতি। (৩) নিজের হাতে কাটা সুতা সমর্পণ করার অর্থ হইতেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামরাজ তথা সর্বোদয়ের পক্ষে ভোট দেওয়া। একগুণ্ডীই দিতে হইবে, উহার অধিক নহে। কারণ তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, যতগুণ্ডী পাওয়া গিয়াছে সর্বোদয়ের পক্ষে তত লোকের সমর্থন বা ভোট পাওয়া গিয়াছে। সুতাঞ্জলি-রূপে যদি অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে থাকিত তবে একজনের একাধিক গুণ্ডী দেওয়াতে কোন নিষেধ থাকিত না। (৪) সুতাঞ্জলি সমর্পণের মধ্যে যে কি বিরাট শক্তি নিহিত আছে সে সম্পর্কে এখনও লোকে সচেতন হয় নাই। প্রতি মেলায় পর্বতপ্রমাণ সুতা জমা হইয়াছে কল্পনা করা যাউক। তাহা হইলে কি চিত্র মনে আসে? বিনোবাজী বলেন ইহাতে মনে হইবে যে হনুমান যেন 'চিত্রকুট' পর্বত লইয়া আসিয়াছেন।

সর্বোদয়ের রূপ হইবে পল্লী-শিল্পপ্রধান। খাদি পল্লী-শিল্পের কেন্দ্রস্বরূপ। মহাত্মা গান্ধী খাদিকে পল্লী-শিল্পরূপ সৌরজগতের সূর্য আখ্যা দিয়াছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় খাদিকে স্বাধীনতার পরিচ্ছদ livery of freedom বলা হইত। বিনোবাজী বলেন—এখন খাদি 'সাম্যযোগের সংকেত চিহ্ন' হইতে পারে। তাই সুতাঞ্জলি সর্বোদয় সাধনার কার্যক্রমে ক্রমশঃ প্রধান স্থান গ্রহণ করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই। যে সব ভূমিহীন দরিদ্রগণকে ভূমি বিতরণ করা হইতেছে ও হইবে তাঁহারা যখন বিচার বুঝিয়া শ্রদ্ধার সহিত নিয়মিতভাবে সুতাঞ্জলি অর্পণ করিতে থাকিবেন তখনই ভূমি বিতরণের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে॥

**সমন্বয়**

বুদ্ধগয়া সর্বোদয় সম্মেলনের এক বড় অবদান—বিনোবাজী কর্তৃক বুদ্ধগয়ায় 'সমন্বয় আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠা। বিনোবাজী বুদ্ধগয়ায় 'সমন্বয় আশ্রম' নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। ইহার লক্ষ্য হইবে—বেদান্তের সত্য এবং বৌদ্ধের অহিংসার সমন্বয়। তাই বিনোবাজী ইচ্ছা করিলেন যে বুদ্ধগয়ার জগদ্বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরের কাছাকাছি আশ্রমের জন্য

একটু জমি পাইলে ভাল হয়। ঐখানে সহজে কোন জমি পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের এমন লীলা যে তিনি তাঁহার অভিপ্রেত স্থানেই ৫/০ বিঘা জমি পাইলেন এবং জমিটি স্থানীয় শংকর সম্প্রদায়ের মঠের পক্ষ হইতে খুবই আনন্দের সহিত ঐ আশ্রম নির্মাণের জন্য তাঁহাকে দান করা হইল। জমিটি বুদ্ধগয়া মন্দিরের নিকটে; উপরন্তু ওখান হইতে শংকর মঠের সহিত যোগাযোগ করাও সহজ। সম্মেলনের প্রারম্ভে কাকা কালেলকার সমন্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়া এক সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। বিনোবাজীর অনুরোধক্রমে সম্মেলনে যোগদানকারী সদস্য ও কর্মিগণ ২০শে এপ্রিল (১৯৫৪) দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ঐ জমিতে একটি কুয়া খনন করিয়া দেওয়ায় উক্ত আশ্রমের ভিত্তি পত্তন করা হইল। সম্মেলনের গৃহাদি ভাঙ্গিয়া উহার বাঁশ, খড় ইত্যাদি সরঞ্জাম লইয়া গিয়া ২২শে এপ্রিল রাত্রির মধ্যে ঐ জমির উপর বিনোবাজীর জন্য একটি কুটীর নির্মাণ করা হইল। ২৩শে এপ্রিল প্রত্যূষে বিনোবাজী সম্মেলনের স্থান হইতে সেখানে যান এবং উক্ত কুটীরে তিন দিন বাস করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠার শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। ইহা তো হইল? কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি? কেনই বা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হইল? ইহার মূল কোথায়? উপরন্তু বিনোবাজীর বর্তমান কার্যক্রমের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি? ৯ বৎসর পূর্বে বিনোবাজী যখন সিওনী জেলে ছিলেন তখন তথায় তিনি গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞ' সম্পর্কীয় শ্লোকগুলির উপর ব্যাখ্যান দেন এবং উহা 'স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন' নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধের নির্বাণ এবং বেদান্তের 'ব্রহ্ম-নির্বাণ' শব্দের সমন্বয় করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং ঐ ব্যাখ্যাতে তিনি ঐ সমন্বয়ও করেন। ঐ সমন্বয় সম্পর্কে 'স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন' পুস্তিকায় এরূপ লিখিত আছে—"ঐ দুই বস্তুতঃ এক। বৌদ্ধধর্মের 'নির্বাণ' নিষেধক শব্দ (negative) এবং গীতার 'ব্রহ্ম নির্বাণ' বিধায়ক ভাষা (positive i যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় তবে 'ব্রহ্ম নির্বাণ' শব্দ কেবল বিধায়ক হনে' উভয় অর্থেরই সংগ্রাহকরূপে গীতা ঐ শব্দের অবতারণা করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম নির্বাণ' বলিলে 'আমি' চলিয়া যায়। কিন্তু 'ব্রহ্ম' থাকিয়া যায়। ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। যেখানে 'শব্দ' সমাপ্ত হইয়া গেল সেখানে শব্দ

লইয়া ঝগড়া কেন? গীতার ভাষায় আমি বলিব "একং ব্রহ্ম চ শূন্যং চ, যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" যিনি ব্রহ্ম ও শূন্যকে এক দেখেন তিনি সত্যই দেখেন। এইজন্য ব্রহ্মনির্বাণ শব্দের দ্বারা সারা বাদ মিটিয়া যায়।"

বিহারে ভূদানযজ্ঞের সাফল্যের মূলে বহুলোকের শ্রদ্ধা, তপশ্চর্যা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বিনোবাজী মনে করেন যে সকলের মূলে রহিয়াছে ভগবান বুদ্ধের পুণ্য স্মৃতির প্রেরণা। সেই কারণেই তিনি বুদ্ধগয়ায় "সমন্বয় আশ্রম" স্থাপনের প্রেরণা পান বলিয়া মনে হয়। সর্বোপরি ভূদানযজ্ঞের কার্যক্রম যে পরম লক্ষ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে তাহা হইতে এক সমন্বয় আশ্রম স্থাপন করিবার প্রেরণা তিনি পান। উহা নিম্নের আলোচনা হইতে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে।

বেদান্ত এই পরম সত্য প্রতিপাদন করেন যে, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; আর কিছুই নাই। সবই ঈশ্বরময়। এই সত্য উপলব্ধি করিলে জীবনে অহিংসা প্রতিষ্ঠা না হইয়া পারে না। কারণ যদি হিংসা করা হয় তবে সে হিংসা তো নিজেকেই নাশ করিবে। কারণ সবই তোএকই আত্মা ও একই ঈশ্বর। সমন্বয়ের কথা বুঝাইতে গিয়া বিনোবাজী ইহা অনুপমভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "বেদান্ত ও অহিংসা এই দুই জিনিষ পরস্পর অবিরুদ্ধ। ইহারা পরস্পরের কার্যকারণ। বেদান্ত হইতে সরাসরি অহিংসা প্রতিফলিত হইয়া থাকে এবং অহিংসা গ্রহণ করা ব্যতীত বেদান্তের কোন পাকা মজবুত বুনিয়াদ থাকে না। অন্যদিকে বেদান্তের আধার ছাড়া অহিংসা দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারে না। এই সমগ্র প্রক্রিয়া গীতার একটি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে— 'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্

ন হিনস্ত্যাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥'

যে মনুষ্য সর্বত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সমানরূপে দেখিয়া থাকেন—ইহা হইল বেদান্ত। আর উহার পরিণাম স্বরূপ তিনি কোনরূপ হিংসাই করিতে পারেন না। কারণ হিংসার কার্য করিবার জন্য যিনি তরবারি উঠাইবেন তিনি নিজেকেই আঘাত করিবার জন্য উহা উঠাইতেছেন এরূপ মনে করিবেন। এইজন্য যিনি ঐরূপ আত্মহিংসা করেন না তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন। মূল বুনিয়াদ হইতেছে—সমান পরমেশ্বরের দর্শন অর্থাৎ বেদান্ত। উহা হইতে

জীবননিষ্ঠাস্বরূপ অহিংসা এবং উহার অন্তিম পরিণাম পরমগতি। এইরূপে গীতার এক অদ্ভুত শ্লোকে সমগ্র বিশ্বের পক্ষে জরুরী সমন্বয়, আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত, বুনিয়াদ হইতে শিখরদেশ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।" এই সমন্বয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী আরও বলেন—"সর্বাঙ্গীন সমগ্র সত্য দর্শন এবং উহার সঙ্গে অহিংসা, ইহাকে বেদান্ত বলে। আমাদের জীবনে ও দর্শনে আমাদিগকে এই দুই তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। এযাবৎ সমন্বয়ের জন্য যে প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহার দ্বারা এক দিক মাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে পরিপূর্ণতা আসে নাই। পরিপূর্ণতায় হয়তো কখন পৌঁছান যাইবে না। যাহা হউক, ভগবান আজ আমাদের জন্য এক বিরাট কার্যক্রম রচনা করিয়াছেন। ভূদানযজ্ঞ যে আমাদিগকে কোন্ সুদূরে লইয়া যাইবে তাহার অনুমান আজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদিগকে একের পর এক পদ অগ্রসর হইতে হইবে। এই সম্পর্কে এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কল্পনা আমার মনে আসে। তাহার নাম 'সমন্বয় আশ্রম' বা 'সমন্বয় মন্দির' যাহাই দেওয়া হয় হউক।"

"এক ঈশ্বরই আছেন আর সবই শূন্য—আমরা সবই শূন্য। তাঁহারই অভ্যন্তরে তাঁহার লীলায় আমরা এইসব রূপ পাইয়াছি। শূন্যেরও একটি রূপ থাকে। উহারও এক আকার দেখা যায়। উহা নিরাকার নহে। ঐরূপে আমাদেরও আকার মিলিয়াছে। এইজন্য আমাদিগকে শূন্য হইয়া যাইতে হইবে।"

আমাদিগকে 'সর্বোদয়' রচনার মাধ্যমে সামুদায়িক অহিংসা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সামুদায়িক অহিংসার মূল হইতেছে—আত্মার একত্ব দর্শন। সর্ব-ভূতে একই আত্মা বিরাজমান—এই অনুভূতি। উহাই সামুদায়িক অহিংসার উৎস। উহাই বেদান্ত। ইহাই আত্মজ্ঞানের পরম বিকাশ। এই অনুভূতি থাকিলে তবেই সামুদায়িক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা আসে। তাই সত্য বা বেদান্তের সহিত অহিংসার সমন্বয়ের প্রয়োজন আজ অত্যন্ত জরুরী। উপরন্তু বেদান্ত বা আত্মজ্ঞান দিক নির্দেশ করে। কিন্তু কর্মে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা ও শক্তিদান করে—অহিংসা। তাই সামুদায়িক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সত্য বা আত্মজ্ঞান এবং অহিংসা পরস্পরের পূরক। এই কারণে

আজ এই সমন্বয়ের এত প্রয়োজন। সমন্বয় আশ্রম স্থাপনের উহাই মূল কথা। যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তবে আমরা বুঝিতে পারিব যে আজ সর্বক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে, বিভিন্ন আদর্শবাদের মধ্যে, জগতের বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধন আজ জরুরী হইয়া দাঁড়াইতেছে। সর্বপ্রকার সমন্বয়ের উৎস —সত্য ও অহিংসার সমন্বয়। তাই বিনোবাজী প্রতিষ্ঠিত "সমন্বয় আশ্রমের" ভবিষ্যৎ অপরিমেয় সম্ভাবনায় পূর্ণ। উহা এই যুগের আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে পরিণত ও পরিগণিত হইবে—এই আশা পোষণ করা দুরাশা নহে।

**বিনোবাজী মৌলিক**

ভূদানযজ্ঞের মূল গান্ধীজীর বিচার-ধারায়—একথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বিনোবাজী উহা যেভাবে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা মৌলিক। তাঁহার অনুপম প্রকাশভঙ্গী—তাঁহার নিজস্ব। যে গভীরতম আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে ভূদানযজ্ঞের বিভিন্ন দিকের বিচার তিনি করেন, বিশেষতঃ তাহাই তাঁহার নিজস্ব। তাই বিনোবাজী গান্ধীজীর অসমাপ্ত কার্য সম্পাদন করিতেছেন বটে; কিন্তু উহার প্রতি পর্দায়, প্রতি রন্ধ্রে বিনোবাজীর মৌলিক ছাপ রহিয়াছে। তিনি গান্ধীজীর অনুকরণ নহেন—তিনি মৌলিক। তিনি গান্ধী-বিচারকে এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের চক্ষের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিনোবাজীকে বুঝিতে হইলে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা তিনি তাঁহার নিজের করিয়া লইয়াছেন। উহা যখন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় তখন মনে হয় কোন এক অভিনব জিনিস শুনিতেছি। ইহাই বিনোবাজীর বৈশিষ্ট্য। বিনোবাজী গান্ধীজীর নিকট হইতে কতটা পাইয়াছেন আর অন্যের নিকট হইতে কতটা পাইয়াছেন—এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ১৯৪৮ সালে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিনোবাজীর উক্ত মৌলিকত্বের কথা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন— "গান্ধীজীর নিকট হইতে আমি তো পরিপূর্ণভাবে পাইয়াছি। কিন্তু তিনি

ব্যতীত অন্যের নিকট হইতেও পাইয়াছি। যাঁহার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি তাহা আমি নিজের করিয়া লইয়াছি। এখন ঐ সমগ্র পুঁজি আমারই হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে গান্ধীজীর দেওয়া কত আর অন্যের দেওয়া কত তাহার পৃথক হিসাব আমার কাছে নাই। যে বিচার আমি শুনিয়াছি যদি তাহা আমার কাছে উচিত বলিয়া মনে হইয়া থাকে এবং আমি উহা হজম করিয়া থাকি, তবে তাহা আমারই হইয়া গিয়াছে। উহা আর পৃথক কেমন করিয়া থাকিবে? আমি কলা খাইয়াছি ও তাহা হজম করিয়া ফেলিয়াছি; উহার মাংস আমার শরীরের উপর বসিয়া গিয়াছে। এখন ঐ কলা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? উহা তো আমার শরীরের রক্ত-মাংসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকারে যে বিচার আমি গ্রহণ করিয়াছি উহা তো আমারই হইয়া গিয়াছে।"

**উপসংহার**

প্রেমের শক্তি নীরবে ও অদৃশ্যভাবে তাহার ক্রিয়া করিতে থাকে। তারপর একদিন কোন শুভ অবকাশে তাহা বিরাট্ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। তখন লোকে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী ভারতের মাটীতে সাম্প্রদায়িক প্রেমের বীজ বপন করিয়াছিলেন। উহা অঙ্কুরিত হইবার জন্য মাটীর নীচে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এবং কবে লোকচক্ষুর অন্তরালে উহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। আজ আর একজন সাধু-সন্তের শীতল শান্তি বারি সিঞ্চনে তাহা তরুণ পাদপরূপে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। লোকে ইহার বর্ধনশীলতার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছে। এই কাজ মহাত্মা গান্ধীর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আজ যে কাজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করিয়াছি তাহা আপনারা অন্তরের সহিত মানিয়া লইয়াছেন এবং আমি দেখিয়াছি যে, উহা বুঝাইতে আমার বিশেষ কিছু কষ্ট করিতে হয় নাই। ইহার অর্থ কি? মহাপুরুষের শক্তি যখন তাঁহার দেহে আবদ্ধ থাকে তখন তাহা সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান তখন উহা অধিক তেজের সহিত নিজের কাজ করিতে থাকে। যদি আমাদের মনের ভূমিকা

ঠিকমত গঠিত হইয়া থাকে তবে আমরা অন্তর হইতে অনুভব করিতে পারিব যে, গান্ধীজী বিদ্যমান আছেন, তাঁহার তিরোভাব হয় নাই। আর আজ যাহা বহুলোককে প্রেরণাদান করিতেছে ইহা তাঁহারই শক্তি। পরমেশ্বর তাঁহার কার্য অনেক প্রকারে সাধন করাইয়া ল'ন। সমুদ্রে অনেক লহরী উত্থিত হয়। পরমেশ্বররূপী সমুদ্রে সৎপুরুষরূপী লহরী উত্থিত হইয়া থাকে। আর আমরা যদি সেই লহরী স্পর্শ করি তবে আমাদের তাহা হইতে প্রেরণা ও নবজীবন লাভ হয়। যে কার্যক্রম আজ আমি দেশের সম্মুখে রাখিয়াছি উহা গান্ধীজীরই আদর্শ কার্যক্রম। আপনাদের এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমরা এক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এখন এই কাজ ঈশ্বরের প্রেরণায় ও ইঙ্গিতে সাধিত হইতেছে। নচেৎ কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির পরিচালনায় এতটা সম্ভব হইত না। এই আন্দোলনের আশাতীত অগ্রগতি লক্ষ্য করিলে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। ইহার কারণ কি? কারণ ভূদানযজ্ঞ কোন এক সাধারণ আন্দোলন নহে। ভূমি লইয়া ইহার আরম্ভ বটে কিন্তু ইহার মূল গভীরতম প্রদেশে। ইহা এক ধর্ম আন্দোলন। ইহা যুগের দাবি। ইহা যুগধর্ম। ধর্ম-প্রবাহের আরম্ভ হয় অত্যন্ত সংকীর্ণ আকারে। ক্রমশঃ উহার বিস্তার হইতে থাকে এবং অবশেষে উহা সমগ্র ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে। উহা প্রথমে বৃক্ষের ক্ষুদ্রতম বীজের আকারে আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া মহান মহীরুহে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"সাধারণতঃ বটবৃক্ষের সহিত ধর্মের তুলনা করা হয়। যাহা চৈতন্যময় জীবন্তধর্ম তাহা বটবৃক্ষের মত বিস্তারলাভ করে। উহা হইতে যে সব শাখা নির্গত হয় তাহা হইতে শিকড় বহির্গত হয়, ক্রমে তাহা মূলে পরিণত হয় এবং নূতন নূতন বৃক্ষ জন্মিতে থাকে। ধর্ম বিচারের ক্ষেত্রেও এইরূপ হয়। বটবৃক্ষের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এইজন্য বটবৃক্ষের উপমা দেওয়া হইয়াছে। আম গাছ বড় বটে কিন্তু উহার আঁটি ছোট নহে। কিন্তু বটের বীজ খুবই ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রতম বীজের ভিতর সমগ্র শক্তি নিহিত থাকে। সেইরূপ ভূদানযজ্ঞের নামে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে উহার বীজও এত সূক্ষ্ম ছিল যে, উহা যিনি বপন করিয়াছিলেন তিনিও ভাবিতে পারেন-নাই যে উহা এরূপ ব্যাপক হইবে এবং উহার

শাখাদি হইতেও নূতন নূতন বৃক্ষের উদ্ভব হইবে।" ইহার মধ্যে নব সমাজ রচনার বীজ নিহিত রহিয়াছে। শুধু তাহা নহে। বিশ্বের আজ সব চাইতে যে জরুরী সমস্যা তাহার সমাধানের বীজও ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যদি ভারত এই আন্দোলনকে পরিপূর্ণ সফলতায় লইয়া যাইতে পারে তবে কেবলমাত্র সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠায় উহার পরিণতি হইবে না; উহা সমগ্র বিশ্বকে শান্তির পথ দেখাইবে। উহা সমগ্র বিশ্বকে অভয় মন্ত্র দান করিতে সক্ষম হইবে।

মহাকবি সেক্সপীয়রের কথায় বলা যায়, "There is a tide in the affairs of man" মনুষ্যের জীবনে এক উন্নতির শুভক্ষণ আসিয়া থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতি ও দেশের জীবনেও তেমন। যদি আমরা সেই শুভক্ষণ চিনিয়া লইতে পারি এবং সময় থাকিতে অনন্যকর্মা হইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তবে অবিলম্বে ও অনায়াসে দেশ অভীষ্টলাভ করিবে। আমাদের দেশ ও জাতির পক্ষে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত।

এই গম্ভীর প্রসঙ্গে গীতার শেষ শ্লোকের কথা স্মৃতি পথে উদয় হয়।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

"যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্ধারী পার্থ আছেন সেইখানেই শ্রী আছে, বিজয় আছে, বৈভব আছে ও অবিচল নীতি আছে—ইহাই আমার মত।"

মহাত্মা গান্ধী ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—"এখানে শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। তাই উহার অর্থ হইতেছে অনুভব-সিদ্ধ শুদ্ধ জ্ঞান। 'ধনুর্ধারী পার্থ' বলায় অনুভব-সিদ্ধ জ্ঞানের অনুসারিণী ক্রিয়া সূচিত করা হইয়াছে।" যেখানে অনুভব-সিদ্ধ জ্ঞান এবং তদনুসারিণী ক্রিয়া—এই দুই-এর সংযোগ, সেখানে শ্রী, বিজয়, বৈভব ইত্যাদি সবই মিলিবে।

আজ ভারতে পূর্ণবিকশিত আত্মজ্ঞান ও তদনুসারিণী ক্রিয়া—এই উভয়ের প্রয়োজন। যদি এই উভয়ই একযোগে আমরা লাভ করিতে পারি তবে আমাদের শ্রী, বিজয়, বৈভব ইত্যাদি সবই মিলিবে। ভগবান আমাদিগকে সেই শক্তি দান করুন।

---

# কর্মীদের প্রতি বিনোবাজীর বাণী

**ভূদানযজ্ঞের কাজ প্রভুর সেবা**

"যে ব্যক্তি এই কাজে লাগিবেন তাঁহাকে প্রভুর সেবা মনে করিয়া এই কার্যে লাগিতে হইবে। কাহারও হৃদয়ে যেন ব্যথা দেওয়া না হয়। মুখে ও হৃদয়ে নম্রতা রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেককে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যিনি জমি দিবেন তাঁহাকে তো সমাদর করিতে হইবে; কিন্তু যিনি জমি দিবেন না তাঁহাকে অনাদর করা চলিবে না। এরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, যিনি আজ দিলেন না তিনি কাল দিতে পারেন।"

**ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে**

"বহু সংখ্যক গঠনমূলক কর্মী ছোটখাট কাজে ব্যাপৃত আছেন এবং তাঁহাদের শক্তি অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছেন। ভূদানযজ্ঞ একটি নূতন কাজ আসিল এবং তাঁহাদের রচনাত্মক কাজে একটি কাজ বৃদ্ধি পাইল—কর্মীরা প্রায় এইরূপই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এখন এই কথা স্পষ্ট হইয়াছে যে আমাদের চালু কাজের মধ্য হইতে যতখানি সম্ভব কাজ কমাইয়া দিয়া ভূদানযজ্ঞের কাজে লাফাইয়া পড়িতে হইবে। অনেক কাজে একটি কাজ যোগ হয় নাই বরং বহু কাজকে নিজের মধ্যে লইয়া পোষণ করিবে—এরূপ এক কাজ উপস্থিত হইয়াছে।"

**কি কি কাজ করিতে হইবে?**

"এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি সংগ্রহ করার কাজ ভূদানযজ্ঞের কাজের মধ্যে সব চাইতে ক্ষুদ্র অংশ। প্রাপ্ত ভূমির বণ্টন করিতে হইবে। যাহাদিগকে জমি দেওয়া হইবে তাহাদের চাষ-আবাদ করিবার জন্য সরঞ্জামাদি দেওয়াইতে হইবে। উহাদিগকে জমিতে স্থায়ীভাবে বসাইতে হইবে। যে গ্রামে জমি পাওয়া গেল সেই গ্রামে খাদি, গ্রাম্যশিল্প, বুনিয়াদী শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামস্বরাজ্য স্থাপনা করিতে হইবে। ভূদানযজ্ঞের কাজের প্রধান অংশ তো পরে করিবারই কাজ। যেখানে আবাদযোগ্য পতিত জমির বড় চক

পাওয়া গিয়াছে বা পাওয়া যাইবে সেখানে নূতনভাবে গ্রাম বসাইতে ও গ্রাম রচনা করিতে হইবে। এই কাজের জন্য সকলের সহযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, জনশক্তি জাগ্রত করিতে হইবে এবং সরকারের নিকট যে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

**নিরন্তর কার্যের আবশ্যকতা**

"ভূদানযজ্ঞের ন্যায় এরূপ উৎসাহদানকারী কার্যক্রম আজ দেশের সম্মুখে উপস্থিত। তথাপি কেহ বলে আমি চারদিন এই কাজে সময় দিব, আবার কেহ বলে পাঁচদিন দিব। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত সংসারের জন্য তো তাঁহারা তিনশত পঁয়ষট্টি দিন অবসর পান। আমি জিজ্ঞাসা করি—শিবাজী মহারাজ নিজ জীবনের দশ-পাঁচ দিন সময় ব্যয় করিয়া কি ক্রান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তিনি তো প্রতি মুহূর্তে ঐ কাজে নিমগ্ন থাকিতেন। শঙ্করাচার্য ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে তিন-চার বার সারা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন, বিশ-বিশিষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরম্পরা দৃঢ় করিয়াছিলেন। এইসব তিনি মাত্র পাঁচদিন করিয়া সময় দিয়া করিতে পারেন নাই। তিনি নিরন্তর কাজ করিতেন। যখন এরূপ নিরন্তর কার্যরত কর্মীদল তৈয়ারী হইয়া এই ভূদানযজ্ঞের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে তখনই এই ক্রান্তিকারী কার্য পূর্ণতালাভ করিতে পারিবে।"

**এখন ভোগের সময় আসিয়াছে কি?**

"কেহ কেহ এরূপ ভাবিয়াছেন যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এখন আমাদের কিছু ভোগ করা দরকার। কিন্তু ভোগের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যক্ষয় হইয়া থাকে। কালিদাস লিখিয়াছেন যে, তপস্বী এক তপ সমাপ্ত হইলেই অন্য তপ আরম্ভ করিয়া দিবেন। ত্যাগ এবং তপ ব্যতীত কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। আজ তো আমরা ভোগের পিছনে পড়িয়া আছি এবং ভোগী লোক রাজগদির উপর উপবিষ্ট হইলে কি কাজ আর হইতে পারে?"

**কর্মীদের দান**

"আমার বিচারধারা গ্রামে গ্রামে জনে জনে প্রচার করিবার দায়িত্ব আপনাদিগকে (কর্মীদিগকে) লইতে হইবে; কিন্তু এই কাজ কেবলমাত্র

তখনই আপনাদের দ্বারা করিতে পারা সম্ভব হইবে যখনই আপনারা নিজ হইতে নিজেদের হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া দিবেন। গরীবের জন্য আপনারা আপনাদের এক-ষষ্ঠাংশ দান করুন। আমাদের উপদেশের প্রভাব তখনই জনগণের উপর পড়িবে যখনই আমরা নিজেরা তদনুসারে আচরণ করিব। অতএব কংগ্রেসী, প্রজা-সমাজবাদী প্রভৃতি সকল রাজনৈতিক দলের লোক যাঁহারা আমার কাজে সহায়তা দান করিবার কথা বলিতেছেন, সদ্‌ভাবনা ও প্রেমের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ অংশ শীঘ্র দান করিয়া দেওয়া উচিত; এ বিষয়ে কোন রকমের কৃপণতা চলিবে না। তাঁহারা যদি এরূপ না করেন তবে তাঁহাদের নিন্দা হইবে। কিন্তু আমার কাহারও নিন্দা সহ্য হয় না। এজন্য আমি কর্মীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।"

**সময়মত ও একযোগে কাজ**

"কোথাও কোন বড় পাথর উঠাইতে হইলে সকল লোক একসঙ্গে জোর দেয়। 'এক', 'দুই', 'তিন' বলে ও এক মুহূর্তেই সকলে একসঙ্গে জোর লাগায়। যদি এরূপ না করে তবে পাথরকে নড়ান যায় না। এই কার্যও (ভূদানযজ্ঞকার্য) এরূপ যে, ইহাতে আমাদিগকে একসাথে ও এক সময়ে নিজেদের শক্তি-প্রয়োগ করিতে হইবে। আমি আমার নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতেছি। দুই মাসে আপনারা লাগিবেন, চার মাস পরে আর কেহ কেহ লাগিবে; এইভাবে নিজের নিজের অবসরমত লাগিলে কাজ হইবে না। এই প্রকারের কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। সামরিক ভাষায় তাহাকে 'Zero hour' (শূন্যক্ষণ) বলে। কিন্তু যদি ঐ সময় আমাদের অবসর আছে কিনা বা আমাদের সুবিধা আছে কিনা ইহা দেখা হয়, তবে তাহাতে কাজ চলে না। নেপোলিয়ন আট হাজার সৈন্য লইয়া অষ্ট্রিয়ায় গিয়া হাজির হন ও এক নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দেন এবং তাহাতে জয়লাভ করেন। ইতিহাস পাঠ করিবার সময় যুদ্ধ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার সখ আমার ছিল। বক্‌সর যুদ্ধে জিনিসপত্র ও সাহায্য সময়মত না পৌঁছিবার কারণে পরাজয় হইয়াছিল। আমাদের এক বড় দোষ—ব্যবস্থিততার অভাব।"

## পরিশিষ্ট—(খ)

# সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কে আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য

[বুদ্ধগয়া সম্মেলনের সময়ে সর্বসেবা সংঘের কয়েকজন মুখ্য ব্যক্তি বিনোবাজীর সহিত সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঐ আলোচনার সারাংশ যাহা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস জাজুজী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল]

**সম্পত্তিদানের স্বরূপ ঃ**—সম্পত্তিদানযজ্ঞের বিচারধারা জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য নিম্ন কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। দাতা স্বীয় আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ সমাজ সেবায় অর্পণ করিবেন। ইহা সম্ভব পব না হইলে স্বীয় সংসার খরচের এক অংশ দিবেন। আয়ের কিম্বা ব্যয়ের কত অংশ দিবেন তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উহা ক্রমশ বাড়তি অংকের দিকে যাওয়া চাই। দরিদ্র-নারায়ণকে নিজ পরিবারের ষষ্ঠ ব্যক্তি মনে করিয়া প্রকৃত আয়ের ষষ্ঠাংশ অথবা ব্যয়ের পঞ্চমাংশ দিবেন। এইরূপ এক সাধারণ নিয়ম ধরা হইয়াছে। সাংসারিক খরচের মধ্যে বিবাহ ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যয়ও ধরিতে হইবে। ষষ্ঠাংশ দাবি করা হয় সত্য কিন্তু ইহা কোনও ট্যাক্স নয় সুতরাং দাতা তাহার ইচ্ছানুসারে কম কিম্বা বেশী দিতে পারেন। কিন্তু যাহাদের আয় যথেষ্ট বেশী তাহারা যেন এই নির্দিষ্ট পরিমাণের (ষষ্ঠাংশ) কম দিতে না চান। যাঁহাদের আয় নিতান্ত সাধারণ জীবন-নির্বাহের উপযোগী—অথবা যাহাদের আয় নির্বাহের চাইতেও কম তাহাদেরও সম্পত্তিদান-যজ্ঞে যোগদান করা উচিত। তাঁহাদের দেয় অংশ এই আন্দোলনের প্রতীকরূপে থাকিবে।

**সংকল্পের সীমা ঃ**—সম্পত্তিদান-যজ্ঞের সংকল্প আজীবন হওয়া উচিত। ইহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এক আধ্যাত্মিক অনুশাসন। সম্পত্তিদানের দ্বারা, সমাজহিতকর কাজের সংগে সংগে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক

প্রগতিও হইবে। ইহার সকলের তীব্র চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদি আরম্ভেই কেহ আজীবন সংকল্প গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তিনি প্রথম কিস্তি হিসাবে কমপক্ষে পাঁচ বৎসরের জন্য সংকল্প অবশ্যই করিবেন। এবং ইহারও লক্ষ্য এই হওয়া চাই যে এই পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যও সংকল্প গ্রহণ করা হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে যদি আয় বাড়ে তবে সম্পত্তিদানের অংশও বাড়িবে। আয় কমিলে দানের অংশও কমিবে।

**দানের অর্থ কিভাবে খরচ হইবে :**—সম্পত্তিদানের অর্থ কাহাকেও দিতে হইবে না। দাতা নিজেই খরচ করিবেন। বৎসরে একবার উহার হিসাব সর্ব-সেবা-সংঘের কার্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। সম্পত্তিদানের অর্থ খরচ করিবার জন্য বিনোবাজী নিম্নলিখিত কার্যসূচী দিয়াছেন।

(অ) যে সব ভূমিহীন চাষীকে জমি দেওয়া হইবে তাহাদের জন্য বীজ, বলদ, কুঁয়া প্রভৃতি সাহায্য করা।

(আ) ত্যাগী সেবকদিগকে অল্পতম ভাতা দেওয়া।

(ই) সৎ সাহিত্য প্রচার।

বিনোবাজী কিম্বা সর্ব-সেবা-সংঘ ইহার সহিত অন্য কোন বিষয় সংযোজন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন। এই সকল কাজেব কোন্‌টিতে কত খরচ করিতে হইবে তাহা দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর থাকিবে।

কোন কোন দাতা এইরূপও বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের কতকগুলি সামাজিক কাজের জন্য সর্বদাই কিছু কিছু খরচ করিতে হয়। সেইজন্য স্থির হইয়াছে যে দাতা ইচ্ছা করিলে সম্পত্তিদানের টাকা হইতে এক-তৃতীয়াংশ তাহার ইচ্ছামত সার্বজনিক সমাজহিতকর কাজে খরচ করিতে পারিবেন; এবং কমপক্ষে ⅔ অংশ সম্পত্তিদান যজ্ঞের উদ্দেশ্যে খরচ করিতে হইবে।

**ইহা চাঁদা করা না হয় :**—অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন দাতা ভূদানযজ্ঞের কাজে আর্থিক সহায়তা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু সম্পত্তিদান-যজ্ঞের মত দীর্ঘ সময়ের সংকল্প গ্রহণ করিতে সাহস করেন না। সম্পত্তিদান ব্যতীত কেবল আর্থিক সহায়তা দেওয়া এক প্রকারের চাঁদাই ধরিতে হইবে। এই ধরনের চাঁদা দেওয়ার কাজে আমরা উৎসাহ

দিতে চাই না। আমাদের সমস্ত শক্তি সম্পত্তিদান-যজ্ঞের কাজেই সংগঠিত করা উচিত। তবে এইটুকু ব্যতিক্রম রাখা চলিতে পারে যে, যাঁহারা এককালীন দান করিতে চাহেন তাঁহারা ভূমিহীনদের জন্য কৃষির সাজ-সরঞ্জাম দান করিতে পারেন যেমন—হালের বলদ, লাঙ্গল, কূপ ইত্যাদি। এই কাজেও দাতার নিকট হইতে কোন টাকা না লইলেই ভাল হয়। দাতা নিজেই ভূমিহীনদের জন্য উহা পোঁছাইয়া দিবেন। যদি কোন ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব না হয় তবে ভূদানযজ্ঞ সমিতি দাতাকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে এবং সহযোগিতা করিতে পারে। যদি এই কাজে কোথাও পয়সা জমা রাখিবার আবশ্যক হয় তবে তাহা সর্বসেবা সংঘের নিকট রাখাই ঠিক হইবে।

**কর্মীর ভাতা ঃ**—গ্রাম সেবার কাজে অথবা ভূদানযজ্ঞ প্রভৃতির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এমন সেবক কর্মীর জন্য ভাতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থা হইবে যে, দানকৃত অর্থ সর্ব-সেবা-সংঘের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং অতঃপর উহা কর্মীকে দেওয়া হইবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা সর্ব-সেবা-সংঘ স্থির করিবেন।

**সাহিত্য প্রচার ঃ**—সৎ সাহিত্য প্রচারের ব্যাপারেও কোন সাহিত্যই বিনামূল্যে দেওয়া হইবে না। অল্পমূল্যে সাহিত্য বিক্রয় করা যাইতে পারে। কোন বিশেষ শ্রেণীর পাঠক যেমন বিদ্যার্থী, কর্মী প্রভৃতিকে অধিক সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। সার্বজনিক পুস্তকালয়ে কিম্বা পাঠচক্রে বিনামূল্যেও পুস্তক দেওয়া যাইতে পারে। সৎ সাহিত্যের তালিকায় কোন্ কোন্ পুস্তক থাকিবে তাহা পূজ্য বিনোবাজী স্থির করিবেন। এই প্রকার সাহিত্যের একটি তালিকা প্রস্তুত হইলে ভাল হয়।

উপরে সম্পত্তিদান-যজ্ঞের যে তিন উদ্দেশ্যের কথা লেখা হইল তাহা সফল করিবার জন্য কি কি করা উচিত তাহা দাতা প্রাদেশিক ভূদান সমিতির নিকট হইতে জানিয়া লইতে পারেন। এবং এই কাজে প্রাদেশিক ভূদান সমিতি সহযোগিতা করিবেন।

**সম্পত্তিদানে দানকৃত অর্থের কিছু বিশেষ বিনিয়োগ :—**(১) যদি কোন বর্ণহিন্দু কোন হরিজন বালককে নিজের গৃহে রাখিয়া তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে তাহার জন্য যে খরচ হইবে তাহা সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(২) কোন সংস্থায় কর্মী ও শিক্ষকগণ একত্র থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে বেতন-আদি পাইয়া থাকেন তাহার মধ্যে অনেক পার্থক্য। এ ক্ষেত্রে যদি তাঁহারা তাঁহাদের আয় একত্র করিয়া তাঁহাদের পরিবারের সংখ্যানুপাতে উহা সমানভাবে ভাগ করিয়া লয়েন তবে উহা উত্তম সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) গরীবদের নিকট হইতে সম্পত্তিদান চাওয়া হয়। সুতরাং তাঁহাদের দানের পরিমাণ যৎসামান্যই হওয়া স্বাভাবিক। ঐ সামান্য অর্থ উপরোক্ত উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিজেদের ব্যয় করা সম্ভব হইবে না। তাই যেখানে দানের বার্ষিক পরিমাণ অনধিক ২৫৲ টাকা, সেই ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে :—(ক) যিনি খাদি পরিধানকারী নহেন, তিনি সম্পত্তিদান দেওয়ার পর বার্ষিক ৫০৲ পর্যন্ত মূল্যের খাদি খরিদ করিলে তাঁহার অর্ধেক সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য করা হইবে। (খ) পল্লী শিল্পজাত তৈল, চাউল, চিনি, গব্যঘৃত খরিদ করিলে তাহার এক-চতুর্থাংশ সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য করা হইবে। (গ) হাত-চাকিতে গম ভাঙ্গাইয়া যদি আটা ব্যবহার করা হয়, তবে সেরপ্রতি প্রদত্ত মজুরীর মধ্যে এক আনা সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য হইবে। (ঘ) বিচার-প্রচার আমাদের সকল কাজের ভিত্তি-স্বরূপ। সেই দৃষ্টিতে 'সর্বোদয়" মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হইলে তাহার পুরা বার্ষিক চাঁদা ৮৲ টাকা সম্পত্তিদানে ধরা হইবে।

**বিবিধ :—**বহুক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাগণের নিকট হইতে 'ঈশ্বর-বৃত্তি' আদায় করিয়া থাকেন। কোন ব্যবসায়ীর নিকট 'ঈশ্বর-বৃত্তির' অর্থ সঞ্চিত থাকিলে তাহা সম্পত্তিদান-যজ্ঞে গ্রহণ করা চলিবে না।

যাঁহার প্রচুর জমি আছে তিনি ভূদানযজ্ঞে ভূমিদান না করিয়া কেবলমাত্র সম্পত্তিদান-যজ্ঞে দান দিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ করা যাইবে না।

**পরিশিষ্ট—**

## পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারী

(১৯৫১ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে

**সংখ্যা—**

| জেলা | মোট ভৌগোলিক আয়তন সেটেলমেণ্ট জরিপ অনুসারে | জল আয়তন | ভূমি আয়তন | আবাদের অনুপযোগী (জল আয়তন সমেত) |
|---|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| বীরভূম | ১১১৫৩০০ | ১১২৪০০ | ১০০২৯০০ | ১৯৬৮০০ |
| বর্ধমান | ১৭৩১৪০০ | ১৫৩৪০০ | ১৫৭৮০০০ | ৩৪৬২০০ |
| বাঁকুড়া | ১৬৯৪০০০ | ১৫০৬০০ | ১৫৪৩৪০০ | ৩০০০০০ |
| হুগলী | ৭৭৩৪০০ | ৭৩৯০০ | ৬৯৯৫০০ | ১৩৮০০০ |
| হাওড়া | ৩৫৮১০০ | ৩৫৮০০ | ৩২২৩০০ | ৭৮০০০ |
| মেদিনীপুর | ৩৩৬১৮০০ | ২০৪৩০০ | ৩১৫৭৫০০ | ৬৭৩৫০০ |
| ২৪ পরগণা | ৩৩৬৬৬০০ | ২১৭১০০ | ৩১৪৯৫০০ | ৫০৬২০০ |
| নদীয়া | ৯৬৫৭০০ | ৪৯৮০০ | ৯১৫৯০০ | ৮৮৪০০ |
| মুর্শিদাবাদ | ১৩২১৩০০ | ৯৪১০০ | ১২২৭২০০ | ১৭২৯০০ |
| মালদহ | ৮৯০৯০০ | ৫৬৫০০ | ৮৩৪৪০০ | ৮৫৫০০ |
| পঃ দিনাজপুর | ৯৩১৫০০ | ৫২৪০০ | ৮৭৯১০০ | ১৫৪০০০ |
| জলপাইগুড়ি | ১৫১৯৬০০ | ৬৫৫০০ | ১৪৫৪১০০ | ২১০১০০ |
| দার্জিলিং | ৭৬৭৮০০ | ৬৪০০ | ৭৬১৪০০ | ১৭৭২০০ |
| কোচবিহার | ৮৪৩৭০০* | পাওয়া যায় নাই | পাওয়া যায় নাই | ৮৬৯০০ |
| পঃ বঙ্গ মোট | ১৯৬৪১১০০ | | — | ৩২১৩৭০০ |

*ইহার মধ্যে ২৩,১০০ একর পাকিস্থান পরিবেষ্টিত অংশ। ঐ অংশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমির কোন অংক প্রস্তুত করান যায় নাই।

'গ'

## ভূমির বিবরণ

সেই বৎসর। সরকারী হিসাব অনুযায়ী)

**একরে।**

| আবাদযোগ্য পতিত (হাল পতিত বাদে) | হাল পতিত | নীট আবাদী জমি | যে জমিতে একাধিক ফসল হয় | ৩ আবাদ-যোগ্য জমি |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ৮৬৮০০ | ২৫০০০ | ৮০৬৭০০ | ৬০৯০০ | ৯১৮৫০০ |
| ১৬২৬০০ | ৬০০০০ | ১১৬২৬০০ | ৪২২০০ | ১৩৮৫২০০ |
| ২৪৮০০০ | ২২১৪০০ | ৯২৪৬০০ | ৪১৫০০ | ১৩৯৪০০০ |
| ২৯৮০০ | ৮৮০০ | ৫৯৬৮০০ | ৪৮৭০০ | ৬৩৫৪০০ |
| ১৫৬০০ | ১১১০০ | ২৫৩৪০০ | ৩৩৩০০ | ২৮০১০০ |
| ২৪৭৭০০ | ১০২৯০০ | ২৩৩৭৭০০ | ১০৮৭০০ | ২৬৮৮৩০০ |
| ৩০৯৬০০ | ৮৮৬০০ | ১৪১৯৪০০ | ১৮৫০০০ | ১৮১৭৬০০ |
| ৯৩৩০০ | ২০৫৫০০ | ৫৭৮৫০০ | ২২৮০০০ | ৮৭৭৩০০ |
| ১০৯১০০ | ৩০৬০০ | ১০০৮৭০০ | ৪০২১০০ | ১১৪৮৪০০ |
| ৫৯৬০০ | ৮৩৪০০ | ৬৬২৪০০ | ১৩৭৮০০ | ৮০৫৪০০ |
| ৬৩০০০ | ৬৮৪০০ | ৬৪৬১০০ | ৮৫৩০০ | ৭৭৭৫০০ |
| ২০০০০০ | ১০১৩০০ | ৬১৪২০০ | ৩৬৯০০ | ৯৪৫৫০০ |
| ৪৯৮০০ | ৩২৯০০ | ২১৮২০০ | ২১৮০০ | ৩০০১০০ |
| ১২৪৯০০ | ৯২৯০০ | ৫০০৭০০ | ৭২০০০ | ৭১৮৫০০ |
| ১৮২৯৮০০ | ১১৩২৮০০ | ১১৭৩০০০০ | ১৫০৪২০০ | ১৪৬৯২৬০০ |

পরিশিষ্ট—

## পশ্চিমবঙ্গে জীবিকা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ ও (১৯৫১

| জেলা | মোট জনসংখ্যা | Agricultural livelihood categories কৃষির উপর নির্ভরশীল মোট জনসংখ্যা | Non-agricultural livelihood categories কৃষির উপর নির্ভরশীল নহে এমন মোট জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ |
| বীরভূম | ১০.৬৬.৮৮৯ | ৮.৬৮,২৮২ | ১.৯৮.৬০৭ |
| বর্ধমান | ২১.৯১.৬৬৭ | ১৩.৭২.৩৩৫ | ৮,১৯.৩০২ |
| বাঁকুড়া | ১৩ ১৯.২৫৯ | ১০.৭৮.৩৭৫ | ২.৪০,৮৮৪ |
| হুগলী | ১৫.৫৪.৩২০ | ৯.১০.৯২১ | ৬.৪৩.৩৯৯ |
| হাওড়া | ১৬.১১.৩৭৩ | ৫,০৫.৮৯৪ | ১১ ০৫.৪৭৯ |
| মেদিনীপুর | ৩৩.৫৯.০২২ | ২৭.৪৬.২০৩ | ৬ ১২.৮১৯ |
| ২৪ পরগণা | ৪৬.০৯.৩০৯ | ২৪.৬১ ৭৮৫ | ২১.৪৭,৫২৪ |
| কলিকাতা | ২৫.৪৮.৬৭৭ | ২২.৬৯৬ | ২৫.২৫.৯৮১ |
| নদীয়া | ১১ ৪৪.৯২৪ | ৬.১১.৭৮৮ | ৫.৩৩.১৩৬ |
| মুর্শিদাবাদ | ১৭.১৫.৭৫৯ | ১১.৮৬ ৪৭৩ | ৫,২৯.২৮৬ |
| মালদহ | ৯.৩৭.৫৮০ | ৬.৬৭.৮৫৭ | ২.৬৯.৭২৩ |
| পঃ দিনাজপুর | ৭.২০.৫৭৩ | ৬,১৩.৭৪৬ | ১,০৬.৮২৭ |
| জলপাইগুড়ি | ৯ ১৪.৫৩৮ | ৪.৪৫ ৪৯৪. | ৪.৬৯.০৪৪ |
| দার্জিলিং | ৪.৪৫.২৬০ | ১.৪২,৮৩৬ | ৩ ০২ ৪২৪ |
| কোচবিহার | ৬.৭১ ১৫৮ | ৫.৬০.৪৭৬ | ১.১০.৬৮২ |
| পঃ বঙ্গ মোট | ২.৪৮.১০.৩০৮ | ১ ৪১.৯৫.১৬১ | ১,০৬ ১৫.১৪০ |

'ঘ'

## কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ।

লোকগণনা)

কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগণের শ্রেণীবিভাগ

| কৃষিজীবী যাঁহাদের নিজের জমি (প্রধানতঃ বা সম্পূর্ণভাবে) পোষ্যবর্গ সমেত | কৃষিজীবী যাঁহাদের নিজের জমি নাই পোষ্যবর্গ সমেত | কৃষি শ্রমিক পোষ্যবর্গ সমেত | কৃষির উপর নির্ভরশীল নহেন এমন জমির মালিক ভূমির খাজনা প্রাপক ও তাঁহাদের পোষ্যবর্গ |
|---|---|---|---|
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪,৫১,৫৬৫ | ১,৩২,২২০ | ২,৭৮,১০৯ | ৬,৩৮৮ |
| ৬,৮৮,৫১০ | ৩,২৩,৩৬৫ | ৩,৪৩,৪০১ | ১৭,০৫৯ |
| ৬,৮১,৩৩০ | ১,৩২,১৫৯ | ২,৫৬,৮৭১ | ৮,০১৫ |
| ৪,৯৭,০৮৯ | ১,৮৯,৪০৭ | ২,১২,৩৩৩ | ১২,০৯২ |
| ২,৩৮,৫২৫ | ৯০,৯৩৬ | ১,৬৭,৩৩৫ | ৯,০৯৮ |
| ১৭,২০,২২৩ | ৫,৫১,১৩৫ | ৪,৫৪,১৭৩ | ২০,৬৭২ |
| ১২,৯৯,২৭৮ | ৪,৭৩,৫৯৮ | ৬,৬২,৩৫৭ | ২৬,৫৫২ |
| ৪,৬৯৭ | ৩০৯ | ২৮৫ | ১৭,৪০৫ |
| ৩,৬৭,০০৮ | ১,০৮,৬০১ | ১,২৭,৮৯৫ | ৮,২৮৪ |
| ৭,১১,৪৫৯ | ১,৮২,৩৪০ | ২,৮৩,৩৪৯ | ৯,৩২৫ |
| ৩,৯৫,৪২১ | ১,৫৪,১৬৭ | ১,১৫,৬৮৭ | ২,৫৮২ |
| ৩,৪৫,৫৯৫ | ১,৯০,৭১৩ | ৭৪,২৯৮ | ৩,১৪০ |
| ১,৯০,৯৫২ | ২,৩৮,৯৩৫ | ১১,০০২ | ৪,৬০৫ |
| ৯৪,০৭৯ | ৪০,২৩০ | ৭,৯২৯ | ৫৯৮ |
| ৩,৩৮,০২৬ | ১,৭২,২৮৭ | ৪৬,৮৫৭ | ৩,৩০৬ |
| ৮০,২৩,৭৫৭ | ২৯,৮০,৪০২ | ৩০,৪১,৮৮১ | ১,৪৯,১২১ |

### পরিশিষ্ট—(ঙ)

## ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ

(বর্তমান লোকগণনার রিপোর্ট হইতে গৃহীত) সংখ্যা—একরে।

| জেলা | ভাদোই ফসল | হৈমন্তিক ফসল | রবি ফসল | অন্যান্য যথা— আম, চা, পান, কলা ইত্যাদি | আউস ধান |
|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| বীরভূম | ১২,৩২১ | ৫,৩৯,৯৬১ | ৪৬,৯২৪ | ৭,৮২২ | ১৫,৭৫৩ |
| বর্ধমান | ৫৩,৮১৫ | ৭,৯৭,৬০৪ | ৯২,৬৩০ | ১,৩৮,৭৩৬ | ১৪,৪০০ |
| বাঁকুড়া | ১৭,৯০০ | ৬,৪৬,২০০ | ৩০,২০০ | ২,৭৭,৩৫২ | ১,৭১,১০০ |
| হুগলী | ৯,১০০ | ৩,৯৪,৯০০ | ১১,২০০ | ৩১,৮৮৬ | ২৫,৬০০ |
| হাওড়া | ৭,৮০০ | ২,২০,০০০ | ১৭,৫৫০ | ৬,২৩০ | ১,৬০০ |
| মেদিনীপুর | ২,২৪,১০০ | ১৮,৯৯,৩০০ | ২,২৩,২০০ | ১৬,০০০ | ১,৪২,৭০০ |
| ২৪ পরগণা | ১,৬৬,২৮৮ | ১০,১৫,১৩১ | ১,৪৩,৪০১ | ৮০,৩৮৮ | ৪৪,০১৬ |
| নদীয়া | ৩,৪০,৮১৬ | ২,১০,৭৬৫ | ২,৬৫,৩৫৬ | ৪৩,২৮৯ | ১,৯৩,৯৭৬ |
| মুর্শিদাবাদ | ৩,৬৫,৮৩৯ | ৩,৬৩,০৩২ | ৪,৯৩,১৯৩ | ৪৯,১২৫ | ১,৯১,৩৬৫ |
| মালদহ | ১,৯০,১০০ | ২,৮৫,৬০০ | ২,৯৮,৫০০ | ২৯,৬০০ | ১,১০,৩৩৬ |
| পঃ দিনাজপুর | ১,১০,৫৯৯ | ৪,৮৭,৩১৮ | ১,০১,২৪০ | ১৫,৮৮৯ | ৬৭,৭৪০ |
| জলপাইগুড়ি | ৯৭০০০ | ৪,০৭,৫০০ | ১২,৯৪৭ | ২,০৭,১৩৪ | ৩৫,৪০০ |
| দার্জিলিং | ৮৪,১২১ | ৮৩,১১৪ | ১৫,৭৭১ | ১,৮২,৪৭৫ | ৩৪১ |
| কোচবিহার | ৬৬,৪৯৮ | ২,২০,৭০৪ | ৪৪,৮৩৯ | ৩৬৬ | ৬৩,২১১ |
| পঃ বঙ্গ মোট | ১৭,৪৬,২৯৭ | ৭৫,৭১,৩২৯ | ১৮,০৪,৯৪১ | ১০,৮৬,২৯২ | ১০,৭৭,৫৪৬ |

# পরিশিষ্ট—(ঙ)

## ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ

(বর্তমান লোকগণনার রিপোর্ট হইতে গৃহীত) সংখ্যা—একরে।

| জেলা | আমন ধান | বোরো ধান | গম | যব | ছোলা ইত্যাদি | অন্যান্য খাদ্যশস্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| বীরভূম | ৫০৭১৬৯ | ৩৮ | ৮৮৫৮ | ২২২ | ৮২২১ | ২২৯৫৭ |
| বর্ধমান | ৭৫০০০০ | × | ৬১০০ | ২০০০ | ৩৩৬০০ | ৬২০০ |
| বাঁকুড়া | ৬৪৬২০০ | ২০০ | ১০৪০০ | ১৪০০ | ৫৪০০ | ২৫৩০০ |
| হুগলী | ৩৯৪৯০০ | ৪৫০০ | ২০০০ | ২৫০ | ৬২০০ | ৩৫৭০০ |
| হাওড়া | ২২০৩০০ | ৩০০০ | × | ২০০ | ১৬০০ | ২১৩০০ |
| মেদিনীপুর | ১৮৯৯৩০০ | ৬৯৩৯ | ৩৭৫০ | ৩০০ | ৭১০০ | ১৭৮০০ |
| ২৪ পরগণা | ১০১৫১৩১ | ২১৯ | ১৪০৮ | ১০০ | ৯৩০০ | ১১৬৫৪২ |
| নদীয়া | ২১০৭৬৫ | ৮৫১ | ২৪৮০০ | ৬১০০ | ৮৬৫০০ | ১০২৫৯৪ |
| মুর্শিদাবাদ | ৩৬৩০০২ | ২০৯৬ | ৪৬৫১৫ | ২৭০৪৪ | ১৪০৬৯৮ | ২০২২১৮ |
| মালদহ | ১৩৫০৫৭ | ১১৯৪০ | ১২০১০ | ২৬৯১৭ | ২৫৪৭২ | ৯৯৫৭২ |
| পঃ দিনাজপুর | ৪৪৭৫৪৩ | ৮৬ | ৩৭২১ | ৫৯৭৭ | ৬৫৫৪ | ৮৭৩৮ |
| জলপাইগুড়ি | ৪০৭৫০০ | ৫ | ১৬০ | ৩৯০ | ১ | ৯২২১৩ |
| দার্জিলিং | ৬১৭৮৯ | × | ৫৬৫ | ৪০০ | ২ | ২৪২৩৯ |
| কোচবিহার | ২২০৭০৪ | × | ৩২৬৬ | ১০৫ | ৪০০ | ৯৮৫০ |
| পঃ বংগ মোট | ৭২৭৯৩৯০ | ৩৭৮৭৪ | ১২৩৫৫৩ | ৭১৭০৫ | ৩৩১০৪৮ | ৭৮৫২২৩ |

পরিশিষ্ট—(ঙ)

## ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ

(বর্তমান লোকগণনার রিপোর্ট হইতে গৃহীত) সংখ্যা—একরে।

| জেলা | তিসি | তিল | সরিষা | আখ | জোয়ার ইত্যাদি | গোলআলু | ফলের বাগান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| বীরভূম | ৪১৯ | ৬১১ | ৬৪৬ | ৪৫৪২ | ১৮১ | ৫৯১১ | ১৪৩৯০ |
| বর্ধমান | ৪০০ | ৩০০ | ৩৭০০ | ৯০০০ | × | ১৮৪০০ | ৩২৫৩৪ |
| বাঁকুড়া | ২২০০ | ৬৫০০ | ৩৫০০ | ৩১০০ | ৩০০ | ৪১০০ | ২৭৭৩৫২ |
| হুগলী | ১০০ | ৩০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ১৩০০০ | ২১৪০০ | ৩৩৭৯৯ |
| হাওড়া | ৪৫০ | × | ৭০০ | ২৫০০ | ২০০০ | ২১০০ | ১২৩১১ |
| মেদিনীপুর | ৩০০ | ৩১০০ | ৭৫০০ | ৪৪০০ | ৪০০ | ১২৯৫০ | ১৫৮৫০ |
| ২৪ পরগণা | × | × | ৪৯০০ | ২৪৯৩ | ১০০ | ৬০৪৬ | ৭৩৮১২ |
| নদীয়া | ১৫০০০ | ৬০৫ | ৮০০০ | ৫৭৩৯ | ১৬৭০ | ১৬৫০ | ৪৩২৯২ |
| মুর্শিদাবাদ | ২৫০০০ | ১৪৭৭ | ১৫০০০ | ১১৭৭৫ | ৩৮০ | ৭৩৩৩ | ৪৯১২৫ |
| মালদহ | ৫৯৮ | ৪৩০ | ১৮০০০ | ৩০০০ | ১৪৫৮০০ | ২৪০০ | ২৯৬০০ |
| পঃ দিনাজপুর | ১৬২ | ৪২৩ | ২৬৪৪৯ | ১৫৫৫ | ১৫৭৯ | ৩২১৮ | ১১০৩৩ |
| জলপাইগুড়ি | ৪৩ | ৫ | ২৯২৬৩ | ৪০০ | ২৫৬২ | ৫৫১৬ | ৪১০১২ |
| দার্জিলিং | × | × | ২৫৭৬ | ২২৬ | ১৫৬৩ | ৪৪৩৪ | ৪৯৪৮ |
| কোচবিহার | × | × | ১৪৪৯৪ | ১০০ | × | ৫৭০২ | × |
| পঃ বঙ্গ মোট | ৪৪৬৭২ | ১৩৭৫৩ | ১৩৬৭২৮ | ৫১৮২৪ | ১৬৯৫৩৫ | ১০১১৬০ | ৬৩৯০৫৮ |

## পরিশিষ্ট—(চ)

# পশ্চিমবঙ্গের বন

বন-সম্পদ এক বৃহৎ জাতীয় সম্পদ। জ্বালানী কাষ্ঠ ও টিম্বার কাষ্ঠ ছাড়া কাগজ, দেশলাই-এর বাক্স প্রভৃতি ছোট-বড় বহুবিধ শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় কাঁচা মাল বন হইতে উৎপন্ন হয়। বনে বহুবিধ ঔষধের গাছ-গাছড়া উৎপন্ন হয়। বন গবাদি পশুর চারণভূমি। বহুবিধ খাদ্যসামগ্রী বন হইতে উৎপন্ন হয়। বন কেবল সম্পদ নহে, উহা দেশের পক্ষে এক অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। কারণ বন আবহাওয়ার আর্দ্রতা রক্ষণ ও বৃদ্ধি করে এবং বারিপাতের প্রাচুর্য রক্ষা করিয়া কৃষির সৌকর্য বিধান করে। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে উপরের মাটির স্তর খুব পাত্‌লা সেখানে বৃষ্টির জল সবেগে গড়াইতে গড়াইতে মাটি ক্ষয় হইয়া গিয়া উহা উষর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। একমাত্র বনই উহা নিবারণ করিতে পারে। সমতল অঞ্চলে বাতাসের বেগে ধূলো উড়িয়া মাটি ক্ষয় হয়। বনের দ্বারা তাহা নিবারিত হয়।

তাই বৈজ্ঞানিক মতে ভারতবর্ষের ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ বনাবৃত রাখা একান্ত প্রয়োজন বিবেচিত হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ এবং সমতল অঞ্চলে শতকরা ২০ ভাগ বনাবৃত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৪৯-'৫০ সালের হিসাবানুসারে ভারতবর্ষের ভূভাগের পরিমাণ ৮১,০৮,০৯,০০০ একর এবং বনের পরিমাণ ১৪,৭৭,০৫,০০০ একর (অর্থাৎ ২,৩০,৭৮৯ বর্গমাইল) অর্থাৎ শতকরা ১৮·২২ ভাগ। এই হিসাবের মধ্যে বাগান ও রাস্তার ধারে যেসব গাছ আছে তাহার হিসাব ধরা হয় নাই। উহা ধরিলে বন মোট ভূভাগের শতকরা ২০ ভাগ দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গে ঐ সালের হিসাবানুসারে ভূভাগের পরিমাণ ১,৯৬,৯৬,০০০ একর এবং বনের পরিমাণ ২৫,৬৯,২৬১ একর (অর্থাৎ ৪০১৪ বর্গমাইল) অর্থাৎ শতকরা ১৮ ভাগ ছিল। কিন্তু ঐ বন দেশের সর্বত্র সুসমভাবে অবস্থিত নহে। এমন কোন কোন জেলা আছে যেখানে এক বিঘাও বন নাই। সম্প্রতি সরকারের দৃষ্টি এই দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন বন সৃষ্টির জন্য জমি অধিকার করিয়া নূতন বন সৃষ্টির

(afforestation) প্রয়াস করা হইতেছে। এবং বেসরকারী বনসম্পর্কীয় আইনের বলে বন সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইতেছে। পতিত ভূমি আবাদোপযোগী করিয়া ভূমিহীনের জন্য ভূমিব্যবস্থা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া দেশের হিতের পক্ষে যতটা নূতন বন এখনও সৃষ্টি করা প্রয়োজন তাহার জন্য আবশ্যকীয় ভূমি অভাব না হয়—সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাই পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারী বনের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহার মধ্যে প্রথম হিসাব ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে পশ্চিম বাংলা সরকারের Conservator General -এর প্রদত্ত এবং দ্বিতীয় হিসাব ১৯৫৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত। পার্থক্যের কারণ খুব সম্ভব এই যে, একটির মধ্যে নূতন বনসৃষ্টির জন্য অধিকৃত ভূমি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং অন্যটির মধ্যে তাহা নাই।

**প্রথম হিসাব—১৯৫১ [সংখ্যা—একরে] দ্বিতীয় হিসাব—১৯৫৪**

| জেলা | সরকারী বন | বেসরকারী বন | মোট বন। | মোট বন |
|---|---|---|---|---|
| বীরভূম | × | ৩২০৭০ | ৩২০৭০ | ৩২৩৭৬ |
| বর্ধমান | × | ৭৪৬২৪ | ৭৪৬২৪ | ৬৭১৫০ |
| বাঁকুড়া | × | ২৮৬৬১১ | ২৮৬৬১১ | ৩২৩০৩৯ |
| হুগলী | × | ২৫৬০ | ২৫৬০ | × |
| মেদিনীপুর | ৩৫২০ | ৩২১৯৭৭ | ৩২৫৪৯৭ | ৩৫০৮৯৪ |
| ২৪ পরগণা | ১৮১৬৬৪০ | ৭০৪০ | ১৮২৩৬৮০ | ১০৪২৮১৫ |
| নদীয়া | ৬৪০ | ১৬৬ | ৮০৬ | ১৯৩৪ |
| মুর্শিদাবাদ | × | ৬৫৩ | ৬৫৩ | ৩৫৭ |
| মালদহ | × | ১২১৯২ | ১২১৯২ | ১০৬২৪ |
| পঃ দিনাজপুর | × | ১২৮০ | ১২৮০ | ১২৬৫ |
| জলপাইগুড়ি | ৩৬৯২৮০ | ৫৪৪০০ | ৪২৩৬৮০ | ৪৪২১৩১ |
| দার্জিলিং | ২৮৯২৮০ | ২২৪০০ | ৩১১৬৮০ | ২৮১৩১৫ |
| কোচবিহার | ১৫৩৬০ | × | ১৫৩৬০ | ১৫৩৬০ |
| পঃ বঙ্গ মোট | ২৪৯৪৭২০ | ৮১৫৯৭৩ | ৩৩১০৬৯৩ | ২৫৬৯২৬১ |